বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা

"যৎ সানোঃ সানুমারুহত"

চারুচন্দ্র দত্ত

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীসুবোধরঞ্জন মৈত্র
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
ফোন নং ৩৪-২৩৭৬

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৭২

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার নাগ
'ইম্প্রেশন্'
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

মূল্য : ৩·৫০ টাকা

যৎ সানোঃ সানুমারুহদ্‌ভূর্য্যস্পষ্ট কর্ত্বং।

*   *   *

ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর ক্ষেত্রে মানুষ যতই
আরোহণ করিতেছে ততই সম্মুখে প্রকট
হইতেছে আরও বহুতর করণীয় কর্ম।

*   *   *

As he mounts from peak to peak····

প্রকাশকের নিবেদন

আর্য পত্রিকাতে "Psychology of Social Developement" শিরোনামে ধারাবাহিক ভাবে শ্রীঅরবিন্দ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধাবলী পরবর্তীকালে "Human Cycle" নামে একটি ইংরাজী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে মানবজাতির প্রগতির পথে এই প্রবন্ধাবলী গভীর আলোক সম্পাত করে। এই গ্রন্থটি "Human Cycle"র সহজ এবং সরল মর্মানুবাদ।

আশা করা যায় এই প্রকাশনী বিশেষ কালোপযোগী হইবে।

পরিচয়

বর্তমান গ্রন্থ শ্রীঅরবিন্দের Psycholgy of Social Development-এর ভাবানুবাদ। ইহার ভিত্তি শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের পাঠচক্রে মূল পুস্তকের বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিক আলোচনা—অনুভূতির সাহায্যে যথাসাধ্য সহজ ভাবে সরল ভাষায় নিজের কাছে জিনিষটিকে পরিষ্কার করিয়া ধরিবার প্রয়োজন বশে।

মূল গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা শ্রীঅরবিন্দের Arya পত্রিকায় ১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী রচনাবলীর মধ্যে Psychology of Social Development-এর মূল কথা কি ও স্থান কোথায়, তাঁহার নিজ ভাষা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল।

"Our idea was the thinking out of synthetic philosophy which might be a contribution to the thought of the new age that is coming upon us. We start from the idea that humanity is moving to a great change of its life which will even lead to a new life of the race, * * * and our aim has been to search for the Spiritual, religious and other truth which can enlighten and guide the race in this movement and endeavour.

* * * We have tried in the *Synthesis of Yoga* to arrive at a synthetical view of the principles and methods of the various lines of spiritual self-discipline and the way in

which they can lead to an integral divine life in the human existence. But this is an individual self-development, and therefore it was necessary to show too how our ideal can work out in the social life of mankind. In the *Psychology of Social Development* we have indicated how these truths affect the evolution of human society. In the *Ideal of Human Unity* we have taken the present trend of mankind towards a closer unification and tried to appreciate its tendencies and show what is wanting to them in order that real human unity may be achieved."

বিষয় সূচী

বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা

প্রথম

সামাজিক অভিব্যক্তির স্তর

উনিশ শতকে মানুষ পদার্থবিদ্যাবলে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে একে-একে আপন আয়ত্তে আনিতে পারিয়া এমনই অন্ধ গর্বে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, জড়বস্তু ও জড়শক্তি ব্যতিরেকে আর কিছু সে মানিতেই চাহিত না। আত্মা ত দূরের কথা, মনের ক্রিয়াকেও সে সর্বদা জড়দেহের, শারীরবিদ্যার বিধান অনুসারী বলিয়া ধরিয়া লইত। যেন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র বুঝিলেই মানবমনের ভাব চিন্তা কল্পনাদি সব বোঝা যাইবে!

এই নজর লইয়া মানুষের ইতিহাস, তাহার সামাজিক অভিব্যক্তি বুঝাইতে গিয়া জড়বাদী পণ্ডিত নানা বিপর্যয় ঘটাইলেন। ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে যে Renascence বা স্বাধীন চিন্তার পুনর্জন্ম ঘটিয়াছিল, অথবা লুথার প্রবর্তিত Reformation ধর্মরাজ্যে যে সোজা ব্যক্তিগত বিশ্বাস-ভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, অথবা অষ্টাদশ শতকে ফরাসী প্রজারা যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহা কি শুধু জড়বিজ্ঞান ও অর্থনীতি লইয়া বোঝা যায়? অর্থনীতিই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য নীতি নয়। মানুষের জীবনধারার প্রধান উৎস মানসিক, কেন না সে মূলত বুদ্ধিজীবী প্রাণী, চিন্তাধারা ভাবধারা কল্পনা ও আদর্শ তাহার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। দেহের খোরাক সে যতটা চায়, তার চেয়ে ঢের বেশী সে চায় মনের খোরাক। অন্যত্র শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, মনের নিম্নতম প্রকাশ, physical mind, মানুষেরও আছে পশুরও আছে—life-mind ও thought-mindই

মানুষের বিশেষত্ব। এই দুই উচ্চতর বৃত্তির উপরেই মানুষের জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত।

অনেক একদেশদর্শী সেকালের ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল অন্নবস্ত্রের অভাবে। ভাত-কাপড়ের অভাব ত মানবের ইতিহাসে বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু বিপ্লব হইয়াছে কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাবুক ও দার্শনিকেরা লোকের মনকে যে জাগাইয়াছিলেন, life-mind ও thought-mindকে যে নাড়া দিয়াছিলেন, সেইটাই ছিল বিপ্লবের বড় কারণ। ছোটখাটো বিস্তর লোক এই মন-জাগানোর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা নাম শুনি, প্রধানত রুসো এবং বল্‌তেয়ারের। রাণী মারী আন্তোয়ানেৎ ভীষণ ভয় করিতেন এই লোকগুলিকে ও তাহাদের প্রকাশিত ছোট-ছোট পত্রিকা-পুস্তিকাবলীকে। সেই লেখাগুলিতে কেবলই বলা হইত মানুষের ব্যক্তিগত হকের কথা, রাজপুরুষের অত্যাচার অনাচারের কথা, তাহার প্রতিবিধানের কথা। লোকে পড়িত, আর ভাবিত। রুসো বলিতেন, প্রজার অনুমতি ব্যতিরেকে রাজার কোন অধিকার নাই। বল্‌তেয়ার বলিতেন, রাজা আবার কে! প্রথম রাজা ত ছিলেন একজন ভাগ্যবান সিপাহীমাত্র! এ সব যে বড় সাংঘাতিক কথা সেই জন্মগত অধিকারের যুগে! লোকের মনে যে চিন্তার বীজ বোনা হইতেছিল, তাহাই ডাকিয়া আনিল বিপ্লবকে। ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল উপলক্ষমাত্র—বড় জোর গৌণ কারণ। অতএব সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্রমোত্তরণ মানসিক ব্যাপার, অর্থনীতিক নয়।

বিশ শতকে পণ্ডিতমণ্ডলীর চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। আজ আর সকল জিনিসকেই জড়ের দৃষ্টিতে বোঝানোর চেষ্টা হয় না। অর্থনীতিক অভাবকেই আর সব চেয়ে বড় অভাব বলিয়া মানুষ দেখে না। ইতিহাসও একটা নূতন পন্থা ধরিয়াছে। ঘটনাবলীর পশ্চাতে যে নিত্যচঞ্চল

মানবমন রহিয়াছে, তাহার সবিশেষ খবর লইতে চাহিতেছেন আজিকার ঐতিহাসিক। গত শতাব্দীতে ভাল মন্দ দুই রকম অভিনব চিন্তাধারারই প্রবর্তক ছিল জার্মানী। সেই দেশের ভাবুক, Lamprecht এই নূতন পন্থার একরকম প্রথম ঐতিহাসিক। তবে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রধানত তাঁহার আপন দেশের ইতিহাসের উপর, ব্যাপকভাবে বিষয়টা তিনি দেখিতে পান নাই। অনেক সময়ে তিনি বুঝিয়াছেন কেমন করিয়া একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিল, কিন্তু বোঝেন নাই কেন ঘটিল, কি কারণে। সভ্যতার চরম লক্ষ্যও তাঁহার ঠিক দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তথাপি তিনি এটা ধরিয়াছিলেন যে মানবের সমাজ ও রাষ্ট্র কতকগুলি বিশিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছিলেন। এই স্তরসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রতীকবাদ, আদর্শবাদ, আচারবাদ এবং বুদ্ধিবাদ। তবে মানুষের চিন্তা ও তাহার জীবনধারা এমন জটিল ও বহুমুখী যে, এইরূপ স্তরবিভাগ লইয়া খুব কড়াকড়ি করা চলে না।

স্তরগুলিকে মোটামুটি মানিয়া লইয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন ভারতের সামাজিক অভিব্যক্তির বিচার করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার যুক্তিগুলিকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। আদিম মানবসমাজে, তা সে মানব সভ্য বা অসভ্য হোক, অর্থনৈতিক পরিণতি তাহার হইয়া থাকুক বা না থাকুক, আমরা একটা ব্যাপার সর্বত্র দেখিতে পাই, যাহাকে গুরুবর বলিতেছেন Symbolic Mentality, অর্থাৎ মনে প্রতীকবাদের পূর্ণ প্রভাব। কিন্তু কিসের প্রতীক? এই প্রতীকবাদের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা যায় মনে একটা গভীর ধর্মভাব এবং বোধির উপর একান্ত নির্ভর। ক্রমশ যেমন যেমন এই বিশ্বাসের স্থানে জাগে অবিশ্বাস ও সংশয়, তেমন-তেমন বোধির স্থান অধিকার করে বুদ্ধি, অবশেষে মানবসমাজ প্রতীক ও আচারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ

করে। তাহা হইলে প্রতীক এমন একটা কিছুর, যাহার অস্তিত্ব মানুষ সর্বদা অনুভব করিতেছে তাহার নিজের অন্তরতম প্রদেশে, নিজের সমগ্র জীবনযাত্রার পশ্চাতে। দেবতা, দিব্যশক্তি, অনামা একটা বিরাট বিশাল তত্ত্ব, একটা অতি গূঢ় রহস্য। প্রাচীন মানব তাই তাহার ধর্মকৃত্য, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবনধারা, বস্তুত তাহার জীবনের প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক মুহূর্তটিতে সেই অনামা নিগূঢ় তত্ত্বটিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত।

প্রাচীন বৈদিক সমাজের দিকে দেখিলে সর্বত্র আমাদের নজরে পড়ে এই মনোভাব, মনের উপর প্রতীকের প্রভাব। আমরা আজ সেই সুদূর অতীত যুগের চিন্তার গতি ঠিক বুঝিতে পারি না, আমরা বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, তাহাদের চিত্তরূপ সিন্দুকের চাবিকাঠিটি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তথাপি এটা দেখিতে পাই যে ঋষিদের সমস্ত ধর্মকর্ম, তাহাদের জীবনের প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত, নিয়ন্ত্রিত হইত যজ্ঞের দ্বারা। এই ক্রতুই ছিল তাঁহাদের সর্বস্ব। কেহ-কেহ বলেন, এই সমস্ত বৈদিক যাগ-যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল দেবরূপী প্রাকৃতিক শক্তিগুলির তুষ্টিসাধন, ঐহিক ও পারত্রিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের কামনায়। কিন্তু এরূপ মতবাদ সেই চাবিকাঠি হারানোর ফল। আমরা ঋষিদের মনে প্রবেশ করিতে পারি না, এই ত গণ্ডগোল ! অর্থনীতি, আচার, যুক্তি ইত্যাদির গোলকধাঁধাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুরিয়া আমরা সহজ বোধির পথ হারাইয়াছি, শ্রুতি বলিয়া জিনিসটিকে আর চিনিতে পারি না। ধর্মে পর্যন্ত আমরা কাজের লোক হইয়াছি।

বৈদিক ধারা ছিল গূঢ় গভীর প্রতীকবাদ। ইহা বৈদিক সমাজের সমুদয় ব্যাপারের মধ্যে অনুস্যূত ছিল। ঋগ্বেদে সূর্য্যার বিবাহ বিষয়ে যে ঋক্‌টি আছে সেইটি লওয়া যাক্। লোকে ভাবে এটি মানবমানবীর বিবাহের মন্ত্র। সেই ভাবেই পরবর্তীকালে এই মন্ত্র বিবাহের সময়ে উচ্চারিত হইত। কিন্তু

একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে এই ঋকের মুখ্য বিষয় সূর্যদুহিতার পর-পর দেবতাগণের সহিত পরিণয়, এবং মানুষের বিবাহ তাহার একটা গৌণ উপলক্ষ মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, overshadowed and governed entirely by the divine and mystic figure. এই যে বেদবর্ণিত দিব্য বিবাহ, এটা একটা কবিকল্পিত উপমা বা অলঙ্কার নয়। পৌরাণিক যুগে এরূপ আলঙ্কারিক কবিতা রচিত হইতে পারিত, কিন্তু বৈদিক প্রতীকবাদের যুগে মানববিবাহ দিব্যবিবাহেরই একটা নিম্নতর প্রকাশ বলিয়া বিবেচিত হইত। বিবাহ-সংস্কারের এই Symbolic রূপ বহুকাল পর্যন্ত হিন্দুর অন্তরে জাগ্রত ছিল, আজও আচার হিসাবে ইহার মূল রহিয়াছে তাহার মনে।

তেমনই নরনারীর পরস্পর সম্বন্ধ হিন্দু বরাবর বুঝিয়াছে পুরুষ ও প্রকৃতির, অথবা বৈদিক নৃ ও জ্ঞার প্রতীকের মধ্য দিয়া। অতি প্রাচীনকালে যখন নৃ এবং জ্ঞা সমান-সমান তত্ত্ব ছিল, তখন স্ত্রীজাতির স্থানও অপেক্ষাকৃত উচ্চে ছিল। যখন প্রকৃতির স্থান পুরুষের নীচে নামিয়া আসিল, তখন স্ত্রীজাতিও সমাজের চক্ষে খাটো হইতে আরম্ভ করিল।

তার পর, চতুর্বর্ণের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। চতুর্বর্ণকে চার জাতি বলিলে ভুল হয়। কেন না জাতি আচারবাদের ভাষা, জন্মগত। বর্ণ প্রতীকবাদ বা আদর্শবাদের ভাষা, বিশিষ্ট গুণের প্রতীক বা আদর্শ। সামাজিক জীবনের ব্যবস্থার জন্য, সুশৃঙ্খলার জন্য, চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল, এই কথা অনেকে বলেন। হইলেও হইতে পারে। তবে আসল কথা এই যে তৎকালীন লোকে এরূপ মনে করিত না। তাহারা ত আমাদের মত কোন ব্যাপারের বাহ্য রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইত না, তাহারা খুঁজিত অন্তর্নিহিত অর্থ। জিজ্ঞাসা করিত—কিসের প্রতীক এই জাতি, ধর্মের দিক দিয়া, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, ইহার তাৎপর্য কি?

পুরুষসূক্তে আমরা পাই যে চতুর্বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছিল ব্রহ্মার মস্তক, বাহু, জঘন ও পদ হইতে। আমরা ভাবি ইহা কবিজনোচিত অলঙ্কার, ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্রাহ্মণ বিদ্যা-ব্যবসায়ী, ক্ষত্রিয় শক্তিসাধক, বৈশ্য ভোগী বণিক ও শূদ্র সেবক। কিন্তু সেকালের লোক আমাদের মত শুধু অলঙ্কার উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িত না। শুধু অলঙ্কারকে ভিত্তি করিয়া তাহারা নানা যজ্ঞবিধি ও ক্রিয়াকলাপের জটিল ধারা প্রবর্তিত করিত না, ব্যক্তির বা সমাজের কর্তব্যাদির নির্ধারণও করিত না। আমরা আমাদের বুদ্ধি লইয়া ঋগ্বেদের ঋষিদের বিচার করিতে বসিয়াই ত যত গোলযোগ বাধাই, তাঁহাদিগকে ভাবপ্রবণ বর্বর বলিয়া বর্ণনা করি। আমাদের কাছে কাব্য বা কবিকল্পনা একটা চিত্তবিনোদনের উপায় মাত্র, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, মনের দরবারে নর্তকী। কিন্তু প্রাচীনদের চক্ষে কবি ছিলেন দ্রষ্টা, তাঁহার মানসী ছিল দেবমন্দিরের পূজারিণী। ঋষিদের কল্পনা মিথ্যার তাঁত বুনিত না, নিগূঢ় রহস্য প্রকট করিত। অলঙ্কার উপমা ছিল গূঢ় সত্যকে দেখিবার দর্পণ। দৃশ্যমান মূর্তি তাঁহাদের কাছে ছিল অব্যক্ত অবর্ণনীয় তত্ত্বের প্রতীক। এই দিক দিয়া বুঝিতে হইবে পুরুষসূক্তে বর্ণিত ব্রহ্মদেবের অঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণের উদ্ভব।

ঋষিগণের প্রতীকবাদ সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন, ইহাদের কাছে একই অখণ্ড পুরুষ, যিনি ভৌতিক ও অতিভৌতিক জগতে আপনাকে বিভিন্নভাবে প্রকট করিয়াছেন, মানবসমাজ তাঁহার স্বরূপকেই ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে ; ব্যক্তি ও বিশ্ব দুইই সেই একই সত্যের প্রতীক ও প্রকাশ। এই মনোবৃত্তি হইতেই আসিল প্রত্যেক সামাজিক ব্যাপারকে একটা সংস্কাররূপে, যজ্ঞরূপে দেখার ইচ্ছা। তথাপি বৈদিক ঋষিদের মনে কোন রকমের সঙ্কীর্ণতা বা আচারবাদের জড়তা দেখা দেয় নাই। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে তাঁহারা খর্ব করেন নাই। আদিম বর্বর জাতিদের মধ্যে, দেখা

গিয়াছে, এই স্বাতন্ত্র্য সহজেই লোপ পাইয়াছে। কেন না তাহাদের প্রতীক-বাদ হইতে আচারবাদে প্রবেশ ঘটিয়াছে অবতরণের পথে, উত্তরণের পথে নয়। যাঁহারা নৃতত্ত্বের Totem এবং Taboo-র বিষয় পড়িয়াছেন, তাঁহারা এটা সহজেই বুঝিবেন। এই আদিম জাতিসমূহের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইত, আজও পৃথিবীর অনেক স্থানে হয়, জুজুর বিভীষিকা ও অকারণ বিধিনিষেধের দ্বারা।

বৈদিক কালের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ এই বলেন যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যজ্ঞাদি ধর্মকৃত্যের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হইলেও সামাজিক জীবনধারার মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল, সমাজবন্ধন মোটেই কঠোর ছিল না। চতুর্বর্ণ প্রথমে ছিল শুদ্ধ প্রতীক, দেবের প্রতীক, অর্থাৎ মানবের মধ্যে জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে, কৃষি-শিল্পচর্চাদিরূপে, আজ্ঞানুবর্তিতারূপে দেবের প্রকাশ। বিশ্বগত চার তত্ত্বের সহিত এই চার দিব্যপ্রকাশের যোগ রহিয়াছে—স্রষ্টা ও জ্ঞান, অনুমন্তা ও শক্তি, সৌষ্ঠবসাধক ও সঙ্গতি, আজ্ঞাবহ ও কর্ম। এই প্রেরণা হইতে উদ্ভূত হইল একটা জাতিগত সামাজিক ব্যবস্থা, যাহার ভিত্তি হইল মুখ্যত, ethical, ভালমন্দের নীতি। অর্থনীতিক স্বার্থ রহিল নৈতিকের পিছনে, গৌণভাবে মাত্র। গুণ মুখ্য, কর্ম গৌণ।

সমাজ সংগঠনের প্রথম রূপ symbolic, প্রতীকবাদী, প্রধানত আধ্যাত্মিক। আর্থিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক, সব তখনও পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন। দ্বিতীয় রূপ Typal, আদর্শবাদী, প্রধানত মানসিক ও নৈতিক। আধ্যাত্মিক তখন লুকাইয়াছে পিছনে। ধর্ম তখন দাঁড়াইয়াছে নৈতিক আদর্শের একটা গুহ্য কারণস্বরূপ। দ্বিতীয় স্তরে ধর্মের কাজ এইটুকু। মানব যে দেবেরই প্রকাশ, এ মূল কল্পনা আর সম্মুখে নাই। ক্রমশ ধীরে ধীরে এ কল্পনা একেবারে লোপ পাইল—কার্যেও রহিল না, কার্যের কারণরূপেও রহিল না।

এই আদর্শবাদের যুগেই বড়বড় সামাজিক লক্ষ্য ও ধ্যেয় বস্তুগুলির জন্ম। এই স্তর ছাড়িয়া গেলে পর সমাজের ধ্যেয় দাঁড়াইল মান-ইজ্জৎ। ব্রাহ্মণের ইজ্জৎ কিসে? না, ধর্ম, শুচিতা, অকিঞ্চনত্ব, বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানার্জনে। তেমনই ক্ষত্রিয়ের ইজ্জৎ সাহস, বীর্য, আর্তত্রাণ, আত্মকর্তৃত্ব ও উদারতাতে। বৈশ্যের ইজ্জৎ ন্যায়-ব্যবহার, বাণিজ্যে সাধুতা, শিল্পোদ্যম, দয়াদাক্ষিণ্যে। শূদ্রের ইজ্জৎ আজ্ঞাপালন, প্রভুপরায়ণতা, স্বার্থহীন ভক্তিতে। কিন্তু এই সমস্ত গুণাবলীও আর বেশীদিন অন্তরের প্রেরণাধীন রহিল না। ক্রমশ সমস্ত ব্যবহার হইয়া দাঁড়াইল আচারগত, যদিচ সে আচারবাদ তখনও একটা বড় জিনিস, ক্ষুদ্র নগণ্য হইয়া পড়ে নাই।

সমাজ আচারগত হইয়া পড়ে তখনই, যখন প্রেরণা অপেক্ষা প্রেরণার বাহ্যপ্রকাশ বড় হইয়া দাঁড়ায়। বর্ণের ক্রমপরিণতিতে জন্ম, ক্রিয়াকলাপ, পারিবারিক আচার, আর্থিক অবস্থা এইসব মুখ্য বলিয়া গণিত হইতে থাকে। প্রারম্ভে গুণকর্মই ছিল বর্ণভেদের প্রধান স্তম্ভ, জন্ম ছিল অতি ক্ষুদ্র বস্তু। কিন্তু বর্ণ যত আদর্শগত হইতে লাগিল, শিক্ষা ও ঐতিহ্য তত বড় হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। আদর্শ ব্রাহ্মণের শিক্ষা ও ঐতিহ্য ব্রাহ্মণের ঘরেই সহজলভ্য হইবে, আদর্শ ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা ও ঐতিহ্য ক্ষত্রিয়ের ঘরেই অনায়াসে মিলিবে, এই হইয়া দাঁড়াইল ধারণা। ফলে বর্ণ হইয়া গেল জন্মগত। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। আচারবাদ চতুর্বর্ণকে নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। যাহা ছিল বর্ণ, তাহা হইয়া দাঁড়াইল জাতি। একবার যখন সমাজের এই কাঠামো খাড়া হইয়া গেল, তখন আগেকার নৈতিক আদর্শের আর স্থান রহিল না সমাজে, তাহা কার্যত লোপ পাইল। ধর্মশাস্ত্রে বা ভাবুকের ভাবনায় মাত্র বাঁচিয়া রহিল। সর্বশেষে বর্ণভেদের অর্থনীতিক ভিত্তিও ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। রহিল শুধু জাতি-কুল, নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠান, প্রাচীন গভীর প্রতীকবাদের বিকৃতি ও ভগ্নাবশেষ।

যতদিন অর্থনীতিক ভিত্তি সাবুত ছিল, ততদিন প্রাচীন ব্রাহ্মণ না থাকিলেও পুরোহিত ও শাস্ত্রী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতেছিল, অভিজাত রাজা জমিদার ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত হইতেছিল, কৃষক বণিক শিল্পী বৈশ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, আর শূদ্র বলিলে বোঝাইতেছিল যে কোন উচ্ছিষ্টভোজী শ্রমজীবি। কিন্তু যখন অর্থনীতির ভিত্তিও গেল, তখন বর্ণাশ্রম নামেমাত্র পর্যবসিত হইল, সমাজ আবর্জনায় ভরিয়া গেল। বর্ণ তখন হইল, গুরুবরের জলন্ত ভাষায়, a name, a shell, a sham—একটা অর্থহীন নাম, খোসা, একটা ঝুটো জিনিস। আজ আমরা সুষুপ্তিতে মগ্ন না থাকিলে এ কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে পারিতাম।

ব্যক্তিবাদের যুগের বিষয় পরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন আচারবাদের লক্ষণাবলী। আচারবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িলে তখন আসে ব্যক্তিবাদ। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে আচারবাদেরও একটা স্বর্ণযুগ হইয়া গিয়াছে। সে যুগ অনেক বিষয়ে বড় সুন্দর ছিল। তাই মানুষ তাহাকে আজও ভুলিতে পারে নাই। ভুলিয়া গিয়াছে তাহার অজ্ঞান অনাচার দৈন্য, শুধু মনে রাখিয়াছে তাহার ঐশ্বর্য ও গরিমা।

এই যুগের একটা প্রধান লক্ষণই এই যে জীবনধারা একেবারে বিধিবদ্ধ হইয়া যায়—সমাজলক্ষন হয় দৃঢ় অটল, ধর্ম-কর্মে কোন নমনীয়তা থাকে না, শিক্ষা-দীক্ষা হইয়া পড়ে সম্পূর্ণ ঐতিহ্য অনুযায়ী। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, যেন অভিব্যক্তির এই-ই শেষ কথা!

আধুনিক ঘোর ব্যক্তিবাদী ইউরোপেও অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ মধ্যযুগের ভাবপ্রবণতা, তার নাইটদের ক্ষাত্রধর্ম, তার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির অসীম ত্যাগ ইত্যাদির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। তাহারা ভুলিয়া যায় সে-যুগের ভণ্ড স্বার্থসর্বস্ব সন্ন্যাসীদের কথা, চরিত্রহীন অর্থলোলুপ নিষ্ঠুর

জমিদারদের কথা, নির্যাতিত নিপীড়িত দরিদ্র কৃষকের কথা। তেমনই আজিকার ধর্মাভিমানী হিন্দু ভাবুক ভারতের অতীত সুবর্ণযুগের কথা ভাবেন—তার সুন্দর সমাজবন্ধন, সুনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক জীবন, শাস্ত্রের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, গোব্রাহ্মণে ভক্তি ইত্যাদি। ভুলিয়া যান যে সেই আচারবাদের যুগ সত্যযুগ ছিল না—খাঁটি সোনা ছিল না, স্বর্ণবর্ণ হইলেও খাদ মিশ্রিত। অবশ্য ইউরোপীয় মধ্যযুগ অপেক্ষা ভাল, কেন না সে ত ছিল গিল্টি করা তামা মাত্র! মোট কথা, যদিচ আচারবাদের যুগ অনেকরকমে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিল, তবু সেটা তাম্রযুগ, সুবর্ণযুগ নয়। কেন না তার সত্যের উপলব্ধি ছিল না, সত্যের অনুকৃতিমাত্র ছিল। সে অনুকৃতি সুন্দর হইলেও অনুকৃতি, কৃতি নয়। যে যুগে উপলব্ধ সত্য জীবনে প্রকাশ পায় সে যুগের প্রাচীন নাম কৃতযুগ।

সামাজিক অভিব্যক্তির ধারাই এই, সত্য লুকাইয়া যায় বিধিনিষেধের স্তূপের মধ্যে। কাঠামোখানা দাঁড়াইয়া থাকে কিন্তু তাহার প্রাণ নাই। তব, মনে রাখিতে হইবে যে মানব ইতিহাসের মূলনীতি ক্রমোত্তরণ। প্রতীক, আদর্শ, আচার, সবের মধ্য দিয়া মানুষ অগ্রসর হইয়াছে তাহার গম্য পথে। ভুল করিতেছে, ভুলের সংশোধন হইতেছে, আবার ভুল করিতেছে, আবার তাহার সংশোধন হইতেছে, কিন্তু সমানে চলিয়াছে আগে। প্রকৃতির অভিব্যক্তিও অতীতে ঘটিয়াছে এই ভাবে। ভূগর্ভে কি বালুকারাশির অভ্যন্তরে সংরক্ষিত কত অতিকায় পশুপক্ষী জলচর উভচরের শিলীভূত পঞ্জর প্রকৃতিদেবীর ভুলের সাক্ষ্য দিতেছে! এই অভিব্যক্তির ধারা। তাই মানবের অতীত জীবনপথে আমরা মাঝে-মাঝে দেখিতে পাই, অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক আলোকরশ্মি পথভোলা পথিককে পথ দেখাইতেছে। ভক্ত আসিতেছেন, সাধু আসিতেছেন, সমাজ-সংস্কারক আসিতেছেন, কিছুদিন মানুষ সোজা পথ ধরিতেছে, আবার অন্ধকার। প্রাচ্যেও এইরূপ হইয়া

গিয়াছে, প্রতীচ্যেও হইয়াছে। নহিলে কবীর, নানক, চৈতন্যের পৃথিবীতে, St. Francis, St. Anthony-র পৃথিবীতে, এই সব অঘটন আজ ঘটিতেছে কিরূপে!

অবশেষে আসে এক অবস্থা যখন আচার ও সত্যের মধ্যস্থ সীমাপ্রাচীর অসহ্য হইয়া উঠে। বুদ্ধিবীর মানব জাগিয়া উঠিয়া তাহার অসত্য কারাগারের দেওয়াল চরণপ্রহারে ভূমিসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন ব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, মানুষ পুনরায় অগ্রসর হয় পথ ধরিয়া তাহার চরম কাম্যের দিকে। কিন্তু তাহাকে আবার ঠোকর খাইতেই হইবে, কেন না তাহার দৃষ্টি তখনও বাহিরের রূপটার পানে; সেখানে সত্যের সন্ধান কিরূপে মিলিবে? তথাপি এ যুগও আগের যুগগুলির মত, তাহার চরম আত্ম-উপলব্ধির পথে সহায়। সে তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে একদিন উপলব্ধি করিবেই, ইহা নিয়তি-নির্দিষ্ট।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার এই মূলমন্ত্র। কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি এই পরম আশার বাণী মানুষকে শুনাইয়াছেন।

দ্বিতীয়

ব্যক্তিবাদের স্বরূপ

আচারবাদ যখন আর মানুষকে কোন প্রেরণা দিতে পারে না, দিতে চায় না, তখনই ব্যক্তিবাদের ও যুক্তিবাদের পথ খুলিয়া যায়। যখন পুরাতন সত্যগুলি মানুষের ভাবনাকে ও তাহার কাজকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছে, যখন জরাজীর্ণ আচারসমূহ অর্থহীন ও যন্ত্রবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন মানুষ তাহার ভালমন্দ সমস্ত সংস্কার ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিপ্লবের ধ্বজা তুলিতে প্রস্তুত হয়। তাহার বুদ্ধি তাহাকে ডাক দেয়—মিথ্যার খেলা ঢের খেলেছ, এস, এখন দেখা যাক্ ধ্রুব সত্য কোথায় লুকিয়ে রয়েছে! তখন মানুষ তাহার জীবনের পুরানো কষ্টিপাথর পুরানো মাপকাঠি হারাইয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধি, বোধি ও কল্পনার সাহায্যে নূতন করিয়া বিশ্বতত্ত্ব ও ব্যক্তিতত্ত্ব নির্ধারণ করা বই তাহার গতি নাই। বিশ্বের গূঢ় বিধানের সন্ধান পাইলে তবে সে সেই বিধান অনুযায়ী নূতন ধারায় ধর্ম নীতি সমাজ রাষ্ট্রাদি গড়িয়া তুলিবে। ঐতিহ্যের উপর, গতানুগতিকের উপর, আর তাহার আস্থা নাই।

ব্যক্তিবাদের জন্মস্থান ইউরোপ, এবং প্রধানত সেই মহাদেশেই ইহার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। এই যে সত্যানুসন্ধানের দুর্দম স্পৃহা, এই যে সত্যের আলোকে নূতন করিয়া জীবন গঠন, ইহা হইতেই পাশ্চাত্য পাইয়াছে তাহার বীর্য, তাহার প্রগতি, তাহার আত্মপ্রসারের অদম্য উৎসাহ। আমাদের প্রাচ্য সংস্কৃতিরও মূল ভিত্তি সত্য বই মিথ্যা ছিল না। কিন্তু প্রাচ্য আজ সেই সত্যরূপ দিব্যজ্যোতির সংস্পর্শ হারাইয়াছে, সুদীর্ঘকাল অর্থহীন প্রাণহীন আচারবাদের অন্ধকার কক্ষে বাস করিয়া দৃষ্টিহীন হইয়াছে, বাহিরের মুক্ত আলোকে আসিতে ভয় পাইতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে যদি ইউরোপের নবজাগ্রত রাজসিক শক্তিকে গভীরতর বলবত্তর কোন সত্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইত, তাহা হইলে মানবের ইতিহাস অন্য পথে যাইত। কিন্তু ঋষিদৃষ্ট সত্যের আলো ত তখন নিভিয়া গিয়াছে, পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ শুধু হতবল, হীনবীর্য, অন্ধ গতানুগতিকের দাস, প্রাচ্য জনসমাজ। নব উদ্যমে, নব বুদ্ধিবলে প্রবুদ্ধ ইউরোপের জয়যাত্রা রোধ করে তাহার কি সাধ্য!

ব্যক্তিবাদের মূল ভিত্তি ছিল জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তির বিদ্রোহ, কিন্তু ক্রমশ তাহা হইয়া দাঁড়াইল শুধু জড়বিজ্ঞানের জয়-জয়কার। ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। ব্যক্তিবাদের সূত্রপাত ত জিজ্ঞাসাতে, অস্বীকৃতিতে। মানুষের যখন অসহ্য হইয়া উঠে পুরোহিত ও পুঁথির দাসত্ব, তখন সে জানিতে চায় চরম সত্যকে, সেই সত্যকে যাহা সর্বদা যাচাই করিয়া লওয়া যায়, যাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও বুদ্ধিগম্য। পুরোহিত, তা তিনি সম্প্রদায়ের মাথা পোপই হোন, বা সাধারণ পাদরি হোন, যাহা আদেশ করিতেন তাহার ত কোন যাচাই চলিত না, তাহা অন্ধভাবে মানিয়া লইতে হইত। জাগ্রত বুদ্ধি তাহা লইতে চাহিবে কেন, অতীতযুগের পণ্ডিতের দল ত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, বরং সকল অনুসন্ধিৎসা, সকল প্রশ্ন বলপূর্বক বন্ধ করিতে সদাই চেষ্টিত ছিলেন। সত্য সন্ধান নিষিদ্ধ ছিল। সত্য বলিতে গিয়া গালিলিওর কি দশা হইয়াছিল, তাহা সবাই জানেন। তাই, মধ্যযুগে শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা চলিয়া গিয়াছিল আরব ও ইহুদী পণ্ডিতগণের পাঠাগারে। গালেন-এর মত দুই একজন অসামান্য ইউরোপীয়কে বাদ দিলে বলা যায় যে গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, ভেষজ, দর্শন, সবই সে যুগে ছিল অখৃষ্টীয়দের হস্তে। যে কোন পুস্তক স্বাধীন চিন্তাকে প্রশ্রয় দিত, পোপ তাহা অবিলম্বে নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলীর তালিকাভুক্ত করিতেন।

খৃষ্টীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে তখন অবস্থা এই ছিল যে প্রাচীন

গ্রন্থে নিহিত তথ্যসমূহ অকেজো হইয়া পড়িয়াছে; তাহার যথার্থ মর্ম অল্প লোকেই বোঝে, যে বোঝে সেও তাহার দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করে না। জীবনের নিয়মন—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক—ছিল পূর্ণভাবে ধর্মযাজকদের হস্তে। শাস্ত্রের টীকা তাঁহারা যাহা করিতেন তাহা ভ্রান্তই হোক অভ্রান্তই হোক, ছিল দেবতার প্রত্যাদেশের সমতুল।

রাষ্ট্র ও সমাজেও ঐ একই ব্যাপার। রাষ্ট্রময় সর্বত্র বিশিষ্ট লোকের বিশিষ্ট অধিকার—রাজার, সামন্তের, রাজপুরুষের ও পুরোহিতের। অনেক ক্ষেত্রে এই অধিকার জন্মগত ও বিধিদত্ত, মানুষের সাধ্য নাই খর্ব করে। এই সমস্ত অতি প্রাচীন হকের অধিকারীবর্গ সাধারণকে পায়ে দলিতেছে, কাহারও কিছু বলিবার জো নাই। মাঝে-মাঝে এই বিশিষ্ট হকদারদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বাধিত বই কি! ইংলণ্ডে দ্বিতীয় হেনরী প্রধান পুরোহিতকে হত্যা করাইলেন। সমস্ত জমিদারবর্গ জন্ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার কাছ হইতে মাগ্না কার্টা আদায় করিলেন। এগুলিকে নিয়মের ব্যতিক্রমও বলা যায়, আবার মানুষের স্বার্থান্বেষণের নিদর্শনও বলা যায়। সাধারণ নিয়ম ছিল গতানুগতিকের অনুসরণ, গড্ডলিকা প্রবাহ। সামাজিক ব্যাপারেও সর্বত্র আচারের শৃঙ্খল। কতকগুলি লোক মামুলী হক-অধিকার অবাধে ভোগ করিতেছে, আর কতকগুলি লোক বিধিনিষেধের ডোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। যে বড় সে চিরদিনই বড়, যে ছোট সে চিরদিনই ছোট। রাষ্ট্রের ও সমাজের পুরানো কাঠামোখানা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রাণ বহুদিন বাহির হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় সুপ্তোত্থিত মানুষ করিবে কি? বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। তাহাকে বলিতেই হইবে, "পুরানো দাবি-দাওয়া আমি মানব না।" যদি কেহ বলে "ঈশ্বরের আদেশ, শাস্ত্রের অমোঘ বিধান," তাহাকে উত্তর দিতে হইবে, "তাই না কি! সত্যি ঈশ্বর এই রকম বলেছিলেন? কবে, কার কাছে বলেছিলেন? তাঁর হুকুম যে তুমি ঠিক বুঝেছ, তার

প্রমাণ কি? তোমরা আমাকে ঠকাচ্ছ না, কি করে বুঝব? এই যে-সব বিধিবিধানের দোহাই দিচ্ছ, এগুলো সাময়িক না সনাতন, কি করে জানব? তারপর আমার শেষ কথা, আমার নিজের সত্যাসত্যের ধারণার সঙ্গে তোমাদের বিধান মেলে কি না, আমি যাচিয়ে নেব।" যদি দেখে যে মিলিল না, তাহা হইলে সেই যুক্তিবাদী বিদ্রোহী তাহার স্কন্ধের জোয়াল দূরে ফেলিয়া দেয়, এবং তাহার আপন অনুভূত সত্য জোর গলায় জাহির করিয়া ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলে নির্মম ভাবে কুঠার মারে। এমন মারে যে সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক বিধান, নৈতিক বন্ধন পর্যন্ত চুরমার হইয়া যায়। অন্ধ আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সুনীতিকেও আর সে আমল দিবে না। পুরানো দলের লোক তাহাকে সমাজের শত্রু, বিপ্লবী ইত্যাদি বলিয়া পিষিয়া মারিতে হয়ত চাহিবেন, কিন্তু সে তার কি পরোয়া করে! কেন না, সত্যই ত সে পুরাতনকে বিধ্বস্ত করিয়া নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছে।

কিন্তু এই যে নূতনের প্রতিষ্ঠা মানুষ করিবে, ইহার মূলতন্ত্র কি, ইহার মাপকাঠি সে কোথায় পাইবে? সেটা, গুরুবর বলিতেছেন, নির্ভর করিবে ঠিক সেই সময়ে তাহার জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহার উপর। প্রথম মাপকাঠিটি হয় এইরূপ। ধর্মে তাহার দিক্‌নির্ণয় করে ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও যুক্তিতর্ক, সমাজ ও রাষ্ট্রে করে ব্যক্তিগত অধিকার, দাবিদাওয়া ও ন্যায় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা। অত্যাচার সহিয়া-সহিয়া তাহার একটা সাধারণ অনুভূতি জন্মিয়াছে যে জুলুম জবরদস্তী অত্যাচার করার কাহারও অধিকার নাই, নীরবে জুলুম বরদাস্ত করা কাহারও কর্তব্য হইতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে প্রেরণা আসিল ধর্মের দিক হইতে। আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের আস্থাই মানুষের জড়তাকে প্রথম টলাইল। তার পর যখন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেরণাও কাজ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার বেগ হইল ঝঞ্চার মত উদ্দাম ও সর্বগ্রাসী। পরে সেই প্রথম উন্মাদ ভাব

কতকটা প্রশমিত হইলে সে আশ্রয় লইল ধর্মসংস্কারের পশ্চাতে এবং তাহারই সহায় ও মিত্র-শক্তিরূপে কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন এই ধর্মসংস্কারের বেগ খানিকটা কমিয়া আসিল, তখন রাষ্ট্রবিপ্লব আবার নিজমূর্তি ধারণ করিয়া জগৎ সমক্ষে প্রকট হইল।

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিত্তি হইল ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত বুদ্ধিবৃত্তি। মানুষ দাবি করিল যে সে তাহার বুদ্ধি ও অনুভূতির দ্বারা শাস্ত্রবচনের এবং শাস্ত্রীর ক্রিয়া-কর্মের অর্থ নিজে স্থির করিয়া লইবে। এ দাবির অর্থ ত পোপের শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ। মধ্যযুগে খণ্ডখণ্ড ভাবে এইরূপ ঘটিয়াছিল। পাঠক উইক্লিফ্ ও তাঁহার ললার্ডদের কথা, বোহেমিয়ার জন হুস্-এর কথা নিশ্চয়ই জানেন। তবে তখনও সাধারণ ইউরোপীয় বুদ্ধি গতানুগতিকের ধারা ছাড়ে নাই। তাই উইক্লিফ্ ও হুস্-এর প্রচেষ্টা অল্পবিস্তর নিষ্ফল হইল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক জাগরণের পরিণাম হইল অন্যরূপ; তখন আবেষ্টন অনুকূল। ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরী আপন মতলব সিদ্ধির জন্য লুথারের পন্থা অনুসরণ করিলেন। জার্মানীর সামন্তরাজারা অনেকে ধর্মসংস্কারের ধ্বজা তুলিলেন বাদশাহকে জব্দ করিবার জন্য। স্পেন ছিল গোঁড়ামির কেন্দ্রস্থল, তাই তাহার ওলন্দাজ প্রজাবর্গ সংস্কারক বনিয়া বসিল। ফ্রান্সে স্পেনপক্ষীয় সামন্তবর্গ হইলেন গোঁড়াদল, দেশাভিমানী জমিদার সামন্তেরা প্রোটেস্টাণ্ট হেনরীর চারিদিকে দাঁড়াইলেন। বেশ জোরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিল এক শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের নানাস্থানে, স্পেন ও ইতালী ছাড়া। বিশেষ করিয়া জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজের দেশে। কিন্তু ধর্মের যথার্থ প্রেরণা ত রহিল না, লড়াই হইতে লাগিল বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে। অবশেষে দুই পক্ষই অশান্তি অরাজকতায় এবং রক্তারক্তিতে হয়রান হইয়া সন্ধিস্থাপন করিল। ফলে ধর্ম বিষয়ে নানাপ্রকার জোড়াতালি

মিটমাট আসিয়া পড়িল। সত্যনির্ধারণ মুলতবী রহিল। ফ্রান্সে ত বিদ্রোহী পক্ষের নেতা স্বধর্ম ত্যাগ করিলেন, এবং পোপকে মানিয়া লইয়া সিংহাসনে বসিলেন। জার্মানীর ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টাণ্ট সামন্ত রাজারা আপন আপন স্বার্থ অনুযায়ী সন্ধিবিগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের ত কথাই নাই! সেখানে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া পোপের দল, পিউরিটান, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইত্যাদি সম্প্রদায় রীতিমত তাণ্ডব করিতে লাগিল ধর্মের নামে, মোট কথা ধর্ম বস্তুটাই পিছনের আসন পরিগ্রহ করিল। ধর্ম হইল রাষ্ট্রীয় কর্মীর মুখোশ মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে প্রাচ্যে এরূপ অধঃপতনের অবস্থায় ধর্মভাব লোপ পায় না, বরং একজনের পর একজন সাধু সন্ত উত্থিত হন আপন-আপন সাধন-পন্থা ও পুজাবিধি লইয়া। ভক্তি অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্যে ইহার ফল দাঁড়াইল অবিশ্বাস ও নিরীশ্বরবাদ। ফরাসী বিপ্লব হইল এই নিরীশ্বরবাদেরই চরম বিকাশ। পোপের ও তাঁহার অনুচরবর্গের অধিকার খর্ব করিতে যাইয়া শেষ পর্যন্ত লোকে মূল শাস্ত্রগ্রন্থকেই অস্বীকার করিয়া বসিল। অতিপ্রকৃতি ও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য সব কিছুকেই বাতিল করিয়া দিতে বসিল।

কেন না শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতির অভিব্যক্তি ঘটিল মুখ্যত Renascence-এর প্রেরণাবশে। লুথারের ধর্মসংস্কারকে তাহার গৌণ কারণের বেশী বলা চলে না। জীবন বিকশিত হইল প্রধানত প্রাচীন গ্রীসীয়-রোমক মনোভাবের পুনরাবির্ভাবের ফলে। ইহুদী-খৃষ্টীয় ধর্মভাব তাহার সহায়তা করিল মাত্র। এখন, এই যে গ্রীসীয়-রোমক ভাবধারা, ইহা মানুষকে ঠিক কি দিয়াছিল তাহা আমাদের বোঝা চাই। প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বাধীন চিন্তার পথ যে খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত। সে চিন্তার ফলে গ্রীস বা রোমের মানব আপন জীবন সার্থক করিবার নানা পন্থার সহিত পরিচিত হইয়াছিল। নানা

পন্থা তাহারা ধরিয়াছিলও। খৃস্টধর্ম যখন রোমে পৌছিল তখন তাহার প্রতিপক্ষ দাঁড়াইল ভোগবাদী ও দুঃখবাদী দর্শনের অনুগামী উচ্চবর্ণের রোমকগণ। ইঁহারা আপন সাবেক ধর্মে, পুরাতন দেবদেবীতে, বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। রোমে উৎসবাদি যাহা সম্পন্ন হইত তাহা নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের জন্য। বস্তুত নবীন খৃস্টধর্ম যে জোর পাইল তাহা অধঃপতনোন্মুখ দার্শনিক রোমকদের মধ্যে নয়, বরং রোম-বিধ্বংসী বলদৃপ্ত বর্বরদের মধ্যে। গ্রীসীয়-রোমকেরা ইহজীবন ও পরজীবন সম্বন্ধে নানা সমস্যার সমাধান করিতে গিয়াছিল স্বাধীন চিন্তার বলে। এক রকম করিয়াও ছিল। কিন্তু সে ভাবধারা ত এক হাজার বৎসরের বেশী গ্রীস ও রোমে আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। অথচ সেই ধারাই আবার দীর্ঘকাল পরে ষোড়শ শতকের ইউরোপকে পুনর্জীবন দান করিল! কেন, তাহা জানা প্রয়োজন। নবযুগ যথার্থ ধর্মের উদ্দীপনা আনে নাই সত্য, কিন্তু মধ্যযুগের হাজার বৎসর কড়া খৃষ্টীয় শাসনে না থাকিলে ইউরোপ গ্রীস-রোমের বাণী গ্রহণ করিতে পারিত না, অন্তত তাহা জীবন ক্ষেত্রে ফলাইতে পারিত না। সুশৃঙ্খল জীবন-ক্ষেত্রে বীজ পড়িল বলিয়াই এমন আশ্চর্য ফসল ফলিল।

মানবসমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু শৃঙ্খলা ও নিয়মন। প্রাচীন জগতে মিশর অসুর সমাজ-শাসন করিয়াছিল বিশাল দেবতান্ত্রিক সংঘটনের দ্বারা—ভারত করিয়াছিল আধ্যাত্মিক মন্ত্রের প্রভাবে—চীন করিয়াছিল কংফুচী ও লাওৎসের সামাজিক মৈত্রীমূ আদর্শের ভিত্তির উপর—গ্রীক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও সুসঙ্গত সমবেত জীবনের দ্বারা—রোম করিয়াছিল বিশাল সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্য স্থাপন দ্বারা। তবু, মানবের জীবন সদাই বহুমুখী। সুতরাং একথা মনে করিবার কারণ নাই যে মিসর অসুরে আদৌ স্বাধীন চিন্তা বা জ্ঞানস্পৃহা ছিল না,—বা ভারত

শুধু পারত্রিকের ভাবনাতেই নিমগ্ন ছিল, ঐহিক উন্নতির দিকে তাহার কোন লক্ষ্য ছিল না,—বা চীন পিতৃপুরুষের পূজা ও মৈত্রীচর্চা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ কখন করে নাই, ইহজীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জানিত না—গ্রীস কেবল ভাস্কর্য স্থাপত্য ও সাহিত্যচর্চা লইয়াই থাকিত, পররাজ্য অপহরণের চিন্তা তাহার ছিল না—রোম কেবল আইনকানুন প্রবর্তন বা সামরিক কুচকাওয়াজ লইয়াই দিন কাটাইত, সাহিত্য ও ললিতকলা তাহার কল্পনার বাহিরে ছিল! সকলেই সব করিত। তবে এক-একটা যুগের এক-একটা বিশেষত্ব ছিল। সেই বিশেষত্বের ভিতর দিয়া মানবজাতি শনৈঃ-শনৈঃ অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল। শুধু যুগধর্মের কথা বলি কেন? মানুষ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিবেশে, জীবনের বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতেছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ প্রতীকবাদ, আদর্শবাদ, আচারবাদ আদি সংস্কৃতির ভিন্ন-ভিন্ন স্তরের বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর জাগরণের ফলে ইউরোপীয় মানব অন্ধ আচারবাদের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিল। অমোঘ শাস্ত্রীয় বিধানের নিগড় সে বুদ্ধির বলে চূর্ণ করিল।

নূতন জীবন, নূতন সমাজ, স্থাপিত হইল যুক্তি-বুদ্ধির ভিত্তির উপর। যুক্তি-বুদ্ধির খোরাক সংগ্রহ হইতে লাগিল প্রায়-বিস্মৃত গ্রীসীয়-রোমক বিদ্যা হইতে। দেশে-দেশে নবীন শিক্ষার ধারা প্রবর্তিত হইল। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হইত না, যদি না ইউরোপ এক সহস্র বৎসর পোপের অধীনে কড়া খৃষ্টীয় শাসনে অভ্যস্ত হইত। সেই হাজার বৎসরের সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের দরুনই ইউরোপ গ্রীসীয় চিন্তার বীজ বপন করিয়া এমন আশ্চর্য ফসল ফলাইতে পারিল। এই খৃষ্টীয় শাসনের মূলে আবার ছিল প্রাচীন ইহুদী জাতির প্রবল নিষ্ঠা, প্রবল ধার্মিক ও নৈতিক ভাব। সে ভাবের মর্ম আমরা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি মহাপুরুষ মূসার অনুশাসনের সহিত হামুরাব্বি বা ড্রাকো-সোলন বা কংফুচী বা প্রিয়দর্শীর অনুশাসনের তুলনা

করিলে। ইউরোপে নবজাগরণ তখনকার মত সার্থক হইল, Back to Aristotle মন্ত্রের সহিত Back to the Bible-এর মিলন ঘটিল বলিয়া।

ষোড়শ শতক জীবনে ও ধর্মে যুক্তিবাদের সূত্রপাত করিল বটে। কিন্তু যেখানে মানুষ স্বভাবত অপূর্ণ, যেখানে তাহার মূলসত্যের অনুভূতি নাই, সেখানে আবার অবাধ যুক্তিবাদ নানা অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে ত আপন হইতে চরম সত্যের বিকাশ ঘটে না! বরং আসিয়া পড়ে অবিরাম নূতন-নূতন মতবাদের সংঘর্ষ। ন্যায়া-ন্যায়-জ্ঞানের পশ্চাতে যেখানে সত্যের উপলব্ধি নাই, সেখানে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, জাতিতে-জাতিতে অধিকার লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি লাগিয়া যায়। হয়ত তাহার চরম পরিণাম দাঁড়ায় ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে ব্যক্তিবাদের জাগৃতির সঙ্গে-সঙ্গে দুটি বস্তুর সন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রথম—একটা সত্যের মাপকাঠি। দ্বিতীয়—সমাজবন্ধনের একটা মূলনীতি। সত্যের মাপকাঠি হইবে স্বপ্রকাশ জ্যোতি, সবাই তাহাকে মানিয়া লইবে বিনা জোর জবরদস্তিতে, বিনা বাধ্যবাধকতার তাড়নাতে। আর সমাজের মূলনীতি হইবে এমন সর্বজনগ্রাহ্য সত্য, যাহা ব্যক্তিগত কামনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিবে। ইউরোপীয় যে নূতন পন্থা ধরিল, তাহার সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন, গবেষণা ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তাহার প্রণালী, সমাজে ন্যায়বিধান ও কার্যক্ষেত্রে সাফল্য তাহার লক্ষ্য। এইভাবে নবীন ইউরোপ তাহার প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করিল। উনিশ শতকে জড়বিজ্ঞানের পূর্ণ জয়জয়কার ইউরোপের মানবকে তাহার অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রেরণা জোগাইল। শাস্ত্রের বচন ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের স্থান অধিকার করিয়া বসিল জড়জগতের বিধানসমূহ। সেইখানে মানুষ পাইল তাহার সত্যের খোরাক। সে বিস্ময়ে দেখিল যে প্রকৃতিদেবী তাঁহার সমস্ত রহস্য খুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার সম্মুখে। সব

কিছু প্রত্যক্ষ দেখা যায়, শোনা যায়, বোঝা যায়, যাচাইয়া লওয়া যায়। অন্ধবিশ্বাসের আর কোন প্রয়োজন রহিল না। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল এই প্রত্যক্ষদর্শনের ভিত্তির উপর নূতন ইমারৎ তুলিতে।

এই হইল ব্যক্তিবাদী যুগের চরম সার্থকতা। কিন্তু ইহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহার ধ্বংসের বীজ। কেন, তাহাও গুরুবর স্পষ্ট বুঝাইয়া বলিয়াছেন। মানবজীবনের যাহা চরম কাম্য, তাহা নিয়তিনির্দিষ্ট। সেই দিকেই মানুষ চলিয়াছে প্রথমাবধি, ক্রমোত্তরণের নানা ধাপের উপর দিয়া। প্রত্যেক ধাপই তাহাকে খানিকটা উঠাইয়া দিয়াছে চরম লক্ষ্যের পানে। ইউরোপের প্রথম আদর্শ ছিল যবন জাতির—পরিপূর্ণ সুসঙ্গত জীবন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক। তারপর আসিল রোমকদের বিরাট সাম্রাজ্য সংঘটন। কিন্তু সে হইল সম্পূর্ণ মানুষী ব্যাপার, তাহার পশ্চাতে সেকালের মিসর অসুরের দেবতান্ত্রিক প্রেরণা ছিল না। প্রাচীন গ্রীসীয় আদর্শও ধীরে-ধীরে লুপ্ত হইল। বাহিনী এবং বিধান হইল রোমক জাতির লক্ষ্য। যখন তাহাদের সাম্রাজ্য ধ্বংসপথে গেল তখন নূতন খৃষ্টীয় আদর্শ হইল ইউরোপের পথপ্রদর্শক। রাজতক্তে বসিলেন প্রধান পুরোহিত। আরম্ভে এই খৃষ্টীয় সংঘটন জীবন্ত ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু ধীরে-ধীরে তাহা পরিণত হইল পোপের হুকুম-বরদারিতে ও অন্ধ গতানুগতিকে। রাজায়-রাজায় যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে, পোপ অম্লানবদনে তাহাতে তরফদারী করিতে লাগিলেন। এরূপ ব্যাপার ত বেশিদিন টিকিতে পারে না! টিকিলও না। ষোড়শ শতকে ইউরোপ পোপের কবল হইতে মুক্ত হইয়া যুক্তিপন্থাকে আশ্রয় করত সোজা ব্যক্তিবাদের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার প্রধান সহায় হইল জড়বিজ্ঞান। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি ত সর্বশক্তিমান নয়! মানুষের সূক্ষ্মতর উচ্চতর মহত্তর বৃত্তির সন্ধান জড়বিদ্যা দিতে পারিল না। বিশ্ববিধানের অনুধাবন করিতে

করিতে মানুষ ধীরে-ধীরে ভুলিয়া যাইতে বসিল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে। শ্রেণী-সম্প্রদায়-রাষ্ট্রাদি জনসমবায় তাহার চক্ষে বড় বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কড়া সমাজতন্ত্র। মানুষ জনসমষ্টিকে ভাবিল কার্যকর যন্ত্র, ব্যক্তিকে ভাবিল তাহার স্ক্রু-পেরেক মাত্র। সমষ্টিকে ভাবিল দেহ, ব্যক্তিকে ভাবিল সেই দেহের কোষ মাত্র। ভুলিয়া গেল মানুষ যে, ব্যক্তিই ক্রমোত্তরণের দ্বারের চাবিকাঠি, তাহার স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়া, তাহাকে খর্ব করিয়া, জাতির অগ্রগতি অভাবনীয়।

ফলে আবার সেই সাবেক গতানুগতিক যুগের এক রকম পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইল। মানুষের জন্ম হইতে মরণাবধি তাহার সমগ্র জীবনধারা কর্মধারার নিয়মন আবার তাহার আপন হাত হইতে খসিয়া পড়িল। আগে পড়িয়াছিল শাস্ত্রও শাস্ত্রীর হস্তে, এখন পড়িল রাষ্ট্রযন্ত্রের কবলে। আগে শাসনের মূলে ছিল ধর্মনীতি, এখন আসিল জড়বিজ্ঞানের নির্দেশ। ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণের স্থান জুড়িয়া বসিল বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ। রাজার স্থান লইল রাষ্ট্রযন্ত্র। শিক্ষালাভে সকলের সমান অধিকার আসিল বটে, কিন্তু শিক্ষার পর কে কি করিবে তাহার নির্দেশ চলিয়া গেল বিশেষজ্ঞের হস্তে। বিবাহ, প্রজনন, সন্তান-পালন সবই হইল সরকারী বিজ্ঞানবিৎ-এর কাজ। বর্ণাশ্রম গেল, কিন্তু ব্যক্তির মুক্তি আসিল না। শাস্ত্রবিধান গেল, আসিল রাষ্ট্রবিধান। এই যে আধুনিক পূর্ণ-পরিণত রাষ্ট্রের দাসত্ব, ইহা আশিয়া খণ্ডের বর্ণাশ্রমের দাসত্ব অপেক্ষা বেশি কঠোর। কেন না, আমরা জানি যে অন্তত ভারতবর্ষে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা চিরদিন বজায় ছিল। ব্যক্তি নিজেই তাহার ইষ্টদেবতা ও ইষ্টগুরু বরণ করিত, অপর কাহারও নির্দেশ তাহাকে মানিতে হইত না। তার উপর সে যে-কোনদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বর্ণাশ্রমের দড়ি ছিঁড়িতে পারিত, এবং তাহা করিতও, কোন বাধা ছিল না। এই আশ্চর্য

নমনীয়তা অবশ্য হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। তথাপি এ জিনিস অল্পবিস্তর দেখা যাইত সর্বত্র আশিয়া মহাদেশে। প্রাচীন ইউরোপেও নমনীয়তার অভাব ছিল না। কেননা গ্রীস-রোমের ধর্মে বা সমাজ-শাসনে কখনই তেমন কড়াকড়ি আসে নাই। কতকগুলি পুরাতন দেশাচার বাহ্যত মানিয়া চলিলে কেহ খোঁজ করিত না যে কোন জন অন্তরে কোন মতাবলম্বী। রোমের সম্রাট ত ছিলেন দেবতা বিশেষ! সাধারণ শিক্ষিত রোমক কেউ বা ছিলেন দুঃখবাদী, কেউ বা ভোগবাদী, কেউ বা অপর কোন দার্শনিক মতের অনুগামী।

ইহুদী, খৃস্টান, তথা ইসলামের ধারা কিন্তু চিরদিনই অন্যরূপ ছিল। সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বড় একটা স্থান ছিল না। রীতিমত বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ধর্ম বা সমাজের কড়া অনুশাসন এড়ান কঠিন ছিল। বর্তমান নমুনার ইউরোপীয় রাষ্ট্রেও ক্রমশ এই ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। সামাজিক নীতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে অটল অনুশাসন, যাহা সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে ইহার ফলে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর এক নূতন আদর্শ ও ধারা যাহা অচিরে প্রাণহীন আচারবাদে পরিণত হইবে।

কিন্তু ইহার চরম পরিণতি কি হওয়া সম্ভব? হয়ত আবার আসিবে ব্যক্তির বিদ্রোহ—কিন্তু এবার চূড়ান্ত নমুনার নৈরাজ্যবাদের রূপ ধরিয়া। তবে তাহা অনিবার্য নয়, গুরুবর বলিতেছেন। কেননা দুই প্রকারের শক্তি কাজ করিতেছে মানবকে এই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্য। প্রথম—কেবল বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত জড়-বিজ্ঞানের দিন প্রায় ফুরাইয়াছে, অনতিবিলম্বে বোধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সম্মুখে তাহাকে মাথা হেঁট করিতে হইবে। তখন লোকে মানব ও মানব-সমাজকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিবে। যুক্তিবাদের যুগও অস্তমিত প্রায়। মানুষের মনে নিট্‌শে

ও বের্গসঁ-র মত নূতন-নূতন মতবাদ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। জার্মান দার্শনিক মণ্ডলী আজ বুদ্ধির অতীত সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ মানিয়া লইতেছেন। ইহ হইতে এরূপ মনে হইতেছে যেন ভবিষ্যৎ মানবজীবন হইবে, typal order-এর নয়, বরং এক নবীন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যের উদ্দাম বিজয়নিনাদে আজ সুষুপ্ত প্রাচী'র নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। সমগ্র পূর্বদেশে প্রাচীন আচারবাদের সহিত পশ্চিম হইতে নূতন আমদানি ব্যক্তিবাদের সংঘর্ষ লাগিয়া গিয়াছে। ঘাত-প্রতিঘাতে পুরানো ইমারৎ এখানে ওখানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু তাহার স্থানে আনকোরা যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। কেহ-কেহ বলেন বটে যে একদিন আজিকার পাশ্চাত্য মানব অন্য পথ ধরিবে, কিন্তু বৃদ্ধ প্রাচ্য তাহারই পরিত্যক্ত জড়বাদ ও ধর্মবিচ্যুত ব্যক্তিবাদকে মাথায় তুলিয়া লইয়া জীবন সার্থক করিবে। তবে গুরুবরের মতে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্পই, অর্থাৎ লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে প্রাচ্যে ব্যক্তিবাদ আসিলেও টিকিবে না। আর, সে ব্যক্তিবাদ নিছক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিচ্যুত ব্যাপারও হইবে না। অতএব আশা করা যায় যে অভিব্যক্তির পথে প্রাচী যদি আপন স্বভাবানুযায়ী নূতন ধারাতে সমাজ ও সংস্কৃতির উদ্ভব করে, ত তাহার প্রভাব ক্রমশ জগতের সর্বত্র অনুভূত হইবে। ইতিমধ্যেই আমরা জড়বাদী ইউরোপ আমেরিকার উপর প্রাচীন আশিয়ার ভাবধারার প্রভাব দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশিয়া জাগিয়া উঠিলে সেই ধারাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না, প্রচণ্ডবেগে তাহা জগৎময় ব্যাপ্ত হইবে। তাহার এই ফল হইবে যে আধ্যাত্মিকতা দৈনন্দিন জীবনে, সংসারের কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিবে, মানুষ তাহার অন্তর্দৃষ্টি দিয়া জীবন ব্যাপারকে দেখিতে আরম্ভ করিবে।

এখন, দেখিতে হইবে যে আধুনিক বুদ্ধিবাদ কি মানবকে তবে স্থায়ী কিছু দান করিল না? তাহা কেন? ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিতে গিয়া ইউরোপ

দুইটি প্রবল শক্তি জগতে আনিয়াছে, যাহা কখনও একেবারে মুছিয়া যাইতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক আদর্শ। ব্যক্তিগত মানবকে তাহার জীবন পূর্ণ ও সার্থক করিতে দিতেই হইবে। ভবিষ্যতে কোন শ্রেণীর স্বার্থ, জাতির স্বার্থ, আর রাষ্ট্রকে অভিভূত করিতে পারিবে না। আধুনিক সমাজতন্ত্রের মূলেও রহিয়াছে এই ভাব। জগতের সব অগ্রগামী জাতিই এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি গভীর সত্য ব্যক্তিবাদ আবিষ্কার করিয়াছে—মানুষ শুধু সমাজের unit নয়, সমাজরূপ সৌধের উপকরণ নয়, তাহার সামাজিক সত্তা ছাড়িয়া দিলেও আর একটা তাহার আপন ব্যক্তিগত সত্তা আছে,—সে স্থান চায়, সুযোগ চায়, স্বাতন্ত্র্য চায়, তাহার আপন চিন্তা, আপন স্বভাব, আপন আত্মার বিকাশের জন্য। যদি একদিন সে এই ব্যক্তিগত দাবি ছাড়িয়া দেয় ত তাহা শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রের খাতিরে করিবে না। সে ব্যক্তিত্বকে ডুবাইবে সমাজ ও রাষ্ট্রের অতীত এমন একটা কিছুর মধ্যে, যেখানে কেহ কাহাকেও খর্ব করিবে না, সবাই সমান সুযোগ পাইবে আত্মার পূর্ণ বিকাশের।

তৃতীয়

ব্যক্তিবাদের পরিণাম

ব্যক্তিবাদের ভবিষ্যৎ আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক।

এই ব্যক্তিবাদের লক্ষ্য কি, সার্থকতা কি, কার্যধারা কি, এবিষয়ে সম্যকরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহার অন্তর্নিহিত প্রেরণা জীবনের সত্যানুসন্ধান, সেই মূল-সত্যের অন্বেষণ, যাহা আচারবাদের পুঞ্জীভূত মিথ্যার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছিল। সেখানে ছিল শুধু অর্থহীন পূজাপার্বণ, ক্রিয়াকর্ম, যাহার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না, যাহাতে লোকে আর সত্যের কোন ইঙ্গিত পাইতেছিল না। এ অবস্থায় মানুষ সোজাসুজি ফিরিয়া যাইতে পারিত তাহার আদিমতম প্রচেষ্টার যুগে, ঋতের শুভ্র আলোকে সমুজ্জল প্রতীক সমূহের মাঝে। কিন্তু দুই কারণে তাহা সে করিতে পারে নাই। প্রথম বাধা কার্যত। অন্ধ আচারবাদ যে মানুষের আদিম আকৃতি ও আদিম কল্পনার বিকৃতি ঘটাইয়াছে তাহা সে দেখিতেছিল, কিন্তু তথাপি তাহার পক্ষে সরাসরি পুরাতনে ফিরিয়া যাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। কেন না, কার্যত সত্যান্বেষণের আগ্রহ একটু ঢিলা পড়িলেই আবার আরও জটিল মিথ্যার রাশি আসিয়া সেই সত্যকে ঢাকিয়া ফেলে। এই ত গেল কার্যত বাধা। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় কথা রহিয়াছে। ক্রমবিকাশের একটা স্থির বিধান আছে যে মানব-সমাজের অভিব্যক্তি সম্মুখের দিকে চলে, পিছু হটে না—ক্রমশ বৃহত্তর সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়। সে সার্থকতাতে পুরাতনের স্থান যে আদৌ নাই এমন নয়, কিন্তু পুরাতনকে নূতন রূপ দিতেই হইবে। অন্তর্নিহিত সত্য পূর্বানুগামী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বহিরাকৃতির আবেষ্টনানুমত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

তাই মানবের ইতিহাসে একটা ব্যক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদের যুগ, যতই অল্পকাল হোক না কেন, আসিবেই। বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া অন্ধ বিশ্বাসকে ধ্বংস করিবে ইহার একান্ত আবশ্যক আছে। ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে বহুবার হিন্দুজাতি অন্ধ আচারের পশ্চাতে গিয়া জীবন সম্বন্ধে সত্যের সন্ধান করিয়াছে। সন্ধান পাইয়াছেও, কিন্তু টিকে নাই। সে সন্ধান বুদ্ধিপ্রণোদিত ছিল না, তাহার প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক। ব্যক্তিগত ভাবে সত্যের উপলব্ধি আসিয়াছিল, ব্যক্তিগত জীবন ভগবৎপ্রেমে ও ভূতদয়াতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জন-সমাজে সত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মহাপুরুষ-উপলব্ধ দিব্য আলোক অচিরে ঘোরতর ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের শিক্ষার যে দশা হইয়াছিল, নানক কবীর চৈতন্যের শিক্ষারও সেই পরিণাম ঘটিল। ইঁহারা সকলেই মানবের একত্ব ও অভেদ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ণাশ্রমের জগদ্দল পাথর ত টলিল না! এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিব না, আধুনিক অনেকের সংস্কারে হয়ত ঘা পড়িবে। তবে মোট কথা, যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে কষিয়া লইতে না শিখিলে আচারবাদকে হটান বড় কঠিন কাজ। তার পর দেখা যায় যে, ইতু ঘেঁটু মাকাল ইত্যাদি লৌকিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে পরম সত্যের নাগাল না পাইয়া মানুষ বৈদিক যজ্ঞাদিতে ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু আজিকার আবেষ্টনে অশ্বমেধ নরমেধাদির মাহাত্ম্য কে বুঝিবে! প্রতীক-যুগের সহিত যাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সে পুরাতন প্রতীকের মধ্যে ঋতের উপলব্ধি কেমন করিয়া করিবে! তাই গুরুবর বলিতেছেন যে মানবের অভিব্যক্তিকে পুরাতন অতিক্রম করিয়া নবতর বৃহত্তর সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই পথে আপাতত তাহার সহায় থাকিবে যুক্তিবুদ্ধি। মানুষ নির্ভীক চিত্তে বলিবে —নূতন পুরাতন জানি না, সব কিছু আমি যাচিয়ে নেব। সে নিঃসঙ্কোচে অন্ধবিশ্বাসের সৌধ ভাঙিবে, তবে না নূতন সৌধ গড়িয়া তুলিতে পারিবে?

আজ ইউরোপীয় চিন্তার সংস্পর্শে ও প্রভাবে আসিয়া প্রাচী অনুকূল আবেষ্টন পাইয়াছে নূতনকে আবাহন করিবার জন্য। বুদ্ধিবাদ আজ মানুষকে বাধ্য করিয়াছে সব জিনিসকে যাচাইয়া দেখিতে। যাহারা প্রাচীনকে ডাকিয়া আনিতে চায়, বর্তমানকে সংরক্ষণ করিতে চায়, তাহারাও যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইতেছে, অন্ধ বিশ্বাসের উপর আর নির্ভর নাই। এটা সর্বথা পাশ্চাত্যের প্রভাব নয়, অনেকাংশে নূতন আবেষ্টনের পরিণাম। বুদ্ধ চৈতন্য নানক কবীর যাহা ভিতর হইতে করিতে পারেন নাই, তাহা আজ আসিয়াছে বাহির হইতে। তাহা হইলে সমাজ এই যে নাড়া পাইয়াছে ব্যক্তিবাদী যুগের আবির্ভাবে, ইহার সঠিক মর্ম কি ? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, ইহার মর্ম ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবনের গূঢ় বিধান ও মূল সত্য নির্ধারণের চেষ্টা। এই চেষ্টা আরম্ভ হইতে পারে ধর্মের ব্যাপার লইয়া। ইউরোপে লুথারের যুগে তাহা ঘটিয়াছিল। কিন্তু মানুষ বাইবেলে ফিরিয়া চল বলিয়া থামিতে পারে না। তাহার মনে জীবনের সমগ্র ব্যাপার সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা জাগিতে বাধ্য। কেন না সব কিছুই সে ভাঙ্গিয়া গড়িবে—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব। ব্যক্তিগত বুদ্ধি লইয়া সে গবেষণার সূত্রপাত করিবে, দেখিবে ব্যক্তির কি বক্তব্য জীবনধারা সম্বন্ধে। কিন্তু তাহাকে সমগ্র বিশ্বের বিধান খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, নহিলে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে ? সে বিশ্বেরই অংশ, বিশ্বেরই প্রজা, বিশ্বের যে বিধান তাহারও তাহাই বিধান! আজ জগৎ সম্বন্ধে এই নূতন দৃষ্টি ও নূতন জ্ঞান লইয়া সে আপন পন্থা নির্ধারণ করিতে, আপন লক্ষ্য স্থির করিতে, দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমান ইউরোপ এই নবদৃষ্টি ও নবজ্ঞান লাভ করিয়াছে জড়বিজ্ঞান হইতে। তাহার অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে মানবের জড়দেহের অভাব আকাঙ্ক্ষার ভিত্তির উপর। পদার্থ-বিদ্যাবলে আবিষ্কৃত জড়জগতের গূঢ় বিধানাবলী তাহাকে জোগাইয়াছে কর্মের প্রেরণা। কিন্তু

এ ভুল ত বেশী দিন চলিতে পারে না! মানুষ প্রধানত মনোময় জীব। দেহ-প্রাণ তাহার আছে ও তাহার মনের উপর ইহারা কতকটা প্রভাব বিস্তার করে সত্য, কিন্তু মনের কাজ মূলত জড়দেহের দ্বারা বা জড়-আবেষ্টনের দ্বারা নির্ণীত হয় না। বরঞ্চ দেহের উপর, আবেষ্টনের উপর, মনোবুদ্ধির প্রতিক্রিয়াই প্রধানত মানুষের সামাজিক অভিব্যক্তির পথ নির্ধারণ করে। তাই, আপন সত্তার তথা আপন আবেষ্টনের সত্য বাহির করিতে হইলে মানবকে বাহ্য স্বরূপ অতিক্রম করিয়া অন্তরে ডুব দিতে হইবে, objectivity ও subjectivity, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, উভয়ই দেখিতে হইবে। অভিব্যক্তির এই গতি।

কিছুদিন এ কাজ মানুষ চালাইতে পারে বুদ্ধিবিচার যোগে। কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে-করিতে সে ক্রমশ আপন অন্তঃপুরুষ ও বিশ্বের অন্তঃপুরুষের সম্মুখীন হয় এবং দেখে যে এই পুরুষ এমনই এক গূঢ়, জটিল এবং গভীর তত্ত্ব, যে বুদ্ধি সেখান হইতে হার মানিয়া ফিরিয়া আসে। তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া নিজের মধ্যেই উচ্চতর জ্ঞান ও সূক্ষ্মতর শক্তির সন্ধান করিতে হয়। সন্ধান করিতে বাহির হইয়া সে বুঝিতে পারে যে উপরে ভাসিলে আর চলিবে না, তাহাকে অন্তরে বাস করিতে হইবে; শুধু বিশ্লেষণে চলিবে না, আত্মজ্ঞ হইতে হইবে। এই ভাবে মানুষ যুক্তিবুদ্ধিকেই একমাত্র সম্বল না করিয়া বোধি ও আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে শেখে, ফললাভকেই লক্ষ্য কাম্য না ধরিয়া আত্মোপলব্ধির মাহাত্ম্য বুঝিতে আরম্ভ করে। ব্যক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের ইহাই পরিণাম। তখন জীবনধারা আর জড়বিশ্বের বিধানের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে অবস্থিত নিগূঢ় বিধান, নিগূঢ় সংকল্প ও নিগূঢ় শক্তির উপর।

অভিব্যক্তি আজ এই পথ ধরিয়াছে—যদিচ এখনও অনিশ্চিত পদে।

দৃষ্টি খুলিয়াছে, নবজ্ঞানের উন্মেষও হইয়াছে—যদিচ এখনও তাহা অস্পষ্ট। কিন্তু গতি এরূপ মন্থর থাকিবে না। নবযুগে মানুষের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হইবে বাহিরের বৃত্তি দ্বারা নয়, আন্তরিক বৃত্তি দ্বারা, প্রয়োজনবাদের স্থান লইবে অন্তরের প্রেরণা। আজ চিন্তাস্রোত বহুল পরিমাণে পূর্বতন বুদ্ধিবাদের অববাহিকা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতেছে। উনিশ শতকের গোঁড়া জড়বাদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইতেছে নবতর গভীরতর নানা প্রকারের জীবনবাদ, নিট্শের সংকল্প ও শক্তিবাদ হইতে বহু-বাদ পর্যন্ত। এই বহুবাদের ভিত্তি প্রাণ-পরাক্রম ও তাহার প্রকাশক, শক্তি এবং কর্মে। তবে এই পণ্ডিতেরা আত্মাকে ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞান ও দিব্য জ্যোতির প্রকাশকেও ইঁহারা মানেন না। তাই দেখা যায় যে বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞানের খর্পর হইতে মুক্ত হইলেও এই আধুনিক মনীষীরা এখনও বোধিকে মনে স্থান দেন নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপ ইহাদের মতের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিল। তবে এই যে যুক্তিবুদ্ধির স্থানে জীবন ও শক্তির অভিষেক, ইহা শুধু প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। মানব-মন বিশ্বের অন্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিতে চাহিতেছিল, এবং সেই ইচ্ছা হইতেই আজ ধীরে-ধীরে উদ্ভূত হইতেছে এক নবীন সম্বোধিবাদ, যাহা একদিন মানবকে তাহার প্রাণের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মন্-কে দেখাইয়া দিবে।

ললিত-কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যের গতি দেখিয়া যুগের স্বরূপ অনেকটা বোঝা যায়। এই তিন দিকেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ বস্তুর বাহ্যরূপ ছাড়িয়া অন্তর বুঝিতে চাহিতেছে। প্রথমে মানুষ পড়িল শুদ্ধ মনস্তত্ত্ব লইয়া। তাহাতে মনের অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়ার বিশ্লেষণ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তাহা আবদ্ধ রহিল প্রাণ-মন-দেহের বাসনা-কামনার গণ্ডীর মধ্যে, অর্থাৎ মানবের জীবন-বিধান সম্বন্ধে কোন যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি ব্যতিরেকে, বৃহত্তর

গভীরতর জ্ঞানের আলোকসম্পাত ব্যতিরেকে। তাই এই যুগের শিল্পে ও সাহিত্যে কতকটা কৃত্রিমতা নজরে পড়ে। জীবনের সৌন্দর্য বিভূতি ও শক্তি গিয়াছে পিছনে সরিয়া, সম্মুখে আসিয়াছে দুঃখ দৈন্য নৈরাশ্য—যাহা কিছু অস্বাস্থ্যকর এবং অসুন্দর। তাহাতে উদ্দাম বাসনার বেগ আছে, নাই সংযম বা আত্মপ্রকাশ। রুশদেশে এই সৃজনী প্রতিভা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই স্রোত ফিরিল। আগে যেমন বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল জীবনবাদ, এখন তেমনই জীবনবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল সম্বোধিবাদ ও অধ্যাত্মবাদ।

আজ কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে একটা যথার্থ অন্তরের প্রভাব দেখা দিয়াছে। এই নূতন ধারা আসিয়াছে কেল্টিক প্রেরণা হইতে। ফরাসী দেশের ব্রিটানীতে, অথবা ইংরেজের দেশের কাম্বিয়ান বা কর্নিশ প্রদেশে এই কেল্ট জাতির একটা স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই ছিল। আবরণ ভেদ করিয়া পশ্চাতের সত্যকে দেখার শক্তি ইহাদের সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় নাই ঘোর জড়বাদের যুগেও। এই কেল্টদের সাহিত্য ও সঙ্গীত সভ্যজগতে আনিল বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি। এই চিন্তাধারা এখনও অস্পষ্ট, আবছায়া-মত, কিন্তু ইহা যে একটা নূতন যুগের আবাহন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মানবের মনতরী ঘাট ছাড়িয়া পাড়ি জমাইতেছে এক নূতনের সন্ধানে—নূতন যুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রথমে অন্তরে, তার পর বাহিরের জীবনে।

এই গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণা অনুযায়ী মানব-জীবন নানারূপে পুনর্গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। সূচনা মাত্র, এখনও যথার্থ কিছু সাধিত হয় নাই। তবে নূতন প্রেরণা এইবার রূপ লইবে মনে হইতেছে। এই মহাযুদ্ধ, ইহার প্রাক্কালে ইউরোপীয় নরের মনের গতি, বিশ্বের কার্যক্ষেত্রে নানারূপ ভাঙ্গাগড়া, পর্যালোচনা করিলেই বোঝা যায় যে প্রাচীন জড়বাদ ও বুদ্ধিবাদের সহিত নূতন জীবনবাদ ও অন্তর্দৃষ্টির বেশ সংঘর্ষ লাগিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই প্রচণ্ড জীবনবাদ বা এই সূক্ষ্মদৃষ্টি আধ্যাত্মিক আলোকে সমুজ্জ্বল হয় নাই। তাই সে অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তিকে ও জড়বিজ্ঞানকে আপনার আজ্ঞাবহ দাস করিয়া লইয়া আপন সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য বিরাট আসুরিক সংঘটনসমূহ আরম্ভ করিয়াছে। নিট্‌শের will-to-live ও will-to-power-কে মূলমন্ত্র করিয়া জার্মানী জগতে দানবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিরীশ্বর বুদ্ধি তাহার যন্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান তাহার আজ্ঞাকারী দৈত্য। ইউরোপ-ব্যাপী যুদ্ধ এই নবজাত রাক্ষসী শক্তির বিস্ফোরণ। জগৎ হয়ত ইহার ফলে বিধ্বস্ত হইবে, কিন্তু সে ধ্বংসের ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হইবে দিব্য নবজীবন। বাধা দূর হইবে, মানবসমাজ অগ্রসর হইবে উন্নতির লক্ষ্যের দিকে।

শ্রীঅরবিন্দ এই সব কথা লিখিয়াছিলেন বিগত মহাযুদ্ধকালে। আজিকার প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইত না যদি জগৎ সেদিন শুনিত তাঁহার বাণী। আজও শুনিবে কি না কে জানে! বিবর্তনের বিধান অমোঘ, নিয়তি-নির্দিষ্ট। প্রকৃতির এই অভিব্যক্তিকে যে রোধ করিয়া দাঁড়াইবে তাহাকে শাস্ত্রে বলিয়াছে আত্মঘাতী জন। অন্ধ-তমসাবৃত অসূর্য লোক তাহার গম্য স্থান।

ইতিমধ্যে সংস্কৃতির নব ধারা জীবনের ছোট-ছোট ব্যাপারে আপন প্রভাব বেশ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইখানেই আজ মানুষের আশা ভরসা। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে বিশেষ করিয়া সন্তানপালন ও সন্তানের শিক্ষার মধ্যে এই নূতন প্রেরণা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে দেখা যায়। আগে এই শিক্ষা ছিল ছাঁচে ঢালা, গুরুবরের কথায় arbitrary grooves of training. সন্তানের ব্যক্তিগত স্বভাবের কথা কেহ ভাবিত না। অর্থাৎ পূর্বতন আদর্শবাদ ও আচারবাদের যুগের শিক্ষার কাঠামোখানা তখনও খাড়া ছিল। জন্মগত শ্রেণীগত নমুনা ছিল তাহার লক্ষ্য, ছেলের নিজের আন্তর ভাবের দিকে পিতামাতার বা সমাজের নজর ছিল না। এ বিষয়ে আজ অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

তবু এখনও গলদ রহিয়াছে, কেন না শিক্ষক সন্তানকে গড়িয়া তুলিবেন এই ধারণা আজও ছাড়ে নাই। আসল কথা এই যে প্রত্যেক সন্তান এক একটি বিবর্তমান আত্মা, সে নিজেই নিজের শিক্ষা সাধন করিবে, শিক্ষক সেই আত্মোন্নতির সহায় হইবেন মাত্র। আত্মোন্নতি মানে ত আত্মোপলব্ধি। তাই শিক্ষা মানে প্রত্যেক সন্তানকে তাহার অন্তরতম সত্তাকে উপলব্ধি করিতে শেখান। আশার কথা যে শিক্ষা আজ এই পথ ধরিয়াছে। এই ধারাতে শিক্ষিত মানব ভবিষ্যতে তার জাগ্রত আধ্যাত্মিক সত্তাকে ভিত্তি করিয়া জনসমাজকে নূতন করিয়া গড়িবে। প্রাচীনেরা তাঁদের প্রতীকবাদ দ্বারা একদিন এই পরম সত্যকেই প্রকাশ করিতেন। তার পর মানুষ অভিব্যক্তির নানা স্তরে পরিভ্রমণ করিয়া এখন যেখানে পৌছিয়াছে, সেখানেও তাহাকে আবার অন্তর্দৃষ্টি ও আত্ম-জ্ঞানকে জীবনে মুখ্যস্থান দিতে হইবে। নহিলে এখনও তাহাকে বহুযুগ গোলকধাঁধায় ঘুরিতে হইবে।

মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ আজও অনেকাংশে যুক্তিবুদ্ধি ও জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। আধুনিক সমবেত জীবনে রাষ্ট্রীয় সংঘটন একটা মুখ্য ব্যাপার। সেখানে আধ্যাত্মিক প্রেরণা কোন স্থান পাইয়াছে কি না, পাইলে কতদূর পাইয়াছে, এসব আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। দেখিতে হইবে যে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মধ্যে ভাল মন্দ কি আছে, ভবিষ্যতে ইহাকে কি বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে।

চতুর্থ

জনসমাজ ও রাষ্ট্র

এই পরিচ্ছেদের আরম্ভে শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তি ও সমাজের স্বরূপের তুলনা করিয়াছেন। ব্যক্তি জীবকোষের সমষ্টি, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি। ইতিপূর্বে গুরুবর বলিয়াছেন যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া সমাজের ক্রমবিকাশ কিছুতেই বোঝা যাইতে পারে না। কেন না, ব্যক্তিই ক্রমোন্নতির তোরণের চাবিকাঠি। এখানে বোঝান হইতেছে যে কেবল ব্যক্তির ক্রমোত্তরণ বিবেচনা করিলেও একদেশদর্শিতা দোষ হয়। জনসমাজের অভিব্যক্তিও এক অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

ব্যক্তি ও সমাজ দুটিই এক শাশ্বত সত্যের জীবন্ত শক্তি। ব্যক্তি যেমন তাহার জীবনকে সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিতে অহরহ চেষ্টা করিতেছে, আপন স্বরূপ ও সেই স্বরূপের বিধানকে বুঝিতে চাহিতেছে, দেহ-প্রাণ-মনের পশ্চাতে অবস্থিত সত্যের উপলব্ধি করিতে চাহিতেছে, সমাজও সেইরূপ করিতেছে। সেও তাহার যথার্থ স্বরূপ জানিতে চাহিতেছে, তাহার সমবেত জীবনের গূঢ় বিধান খুঁজিতেছে, জীবনকে সার্থক করিতে চাহিতেছে। ব্যক্তির মত সমষ্টিরও দেহ আছে, প্রাণ আছে, স্বভাব আছে। সে তাহার আপন স্বভাবানুযায়ী নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চায়, সুন্দরের অনুভূতি চায়। বস্তুত সমাজও আত্মন্-এরই প্রকাশ। সমষ্টিগত আত্মারও আপন চেতনা আছে, আপন অভিব্যক্তি আছে। বাস্তবিক ব্যষ্টি ও সমষ্টি একই বস্তুর দুই প্রকাশ। দুইটির মধ্যে প্রভেদ মুখ্যত এই যে সমষ্টিগত আত্মার স্বরূপ ও ক্রিয়া ঢের বেশি জটিল। কারণও সুস্পষ্ট। জনসমাজ বা রাষ্ট্র বহুসংখ্যক পূর্ণচেতন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির দ্বারা গঠিত, আর ব্যক্তি যে জীবকোষসমূহ দিয়া নির্মিত তাহারা প্রাণবন্ত হইলেও অবচেতন

মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ, দেখুন, বর্তমান ভারতীয় জনসমাজ। তাহার অগ্রগতি কত রকমে ব্যাহত। তাহার অন্তর্বর্তী নানা শ্রেণী, নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়, প্রত্যেকের কত দাবি-দাওয়া আবদার, প্রত্যেকের কত খেয়াল, কত সংস্কার। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই অসমঞ্জস ও অসঙ্গত। ব্যক্তির দেহে হাত পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্তব্য থাকিলেও তাহারা পরস্পরকে বাধা দেয় না, ব্যক্তির দৈহিক পরিণতি ব্যাহত হয় না। তবে একথা শ্রীঅরবিন্দ বহুস্থানে বলিয়াছেন, পাঠকের মনে থাকিতে পারে, যে ব্যক্তির মধ্যেও তার দেহ-মন-প্রাণের পরস্পর দ্বন্দ্বের অভাব নাই। সে দ্বন্দ্বকে সে মিটায় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। ব্যক্তির কাছে এই দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। কিন্তু সমাজের কার্যে মুখ্যত বহির্দৃষ্টিই পথপ্রদর্শক। অন্তত প্রথম-প্রথম, বহুদিন ধরিয়া। তারপর যখন তাহার দৃষ্টি বাহ্য হইতে আন্তরে উন্নীত হয়, চেতনা বাহির হইতে অন্তরের দিকে ফিরে, তখন সমাজের উত্তরণ হয় সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত।

গুরুবর বলিতেছেন, সমষ্টির আত্মোপলব্ধি অপেক্ষাকৃত দেরিতে আসে। যখন আসে তখনও তাহার চেতনা বহির্মুখী। যেটুকু আন্তর থাকে তাহারও প্রকাশ বাহ্যিক। রাষ্ট্রের ব্যাপারে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপ্রেমের কেন্দ্র ভৌগোলিক, অর্থাৎ মুখ্যত দেশগত। পিতৃভূমি, জন্মভূমি ইত্যাদি শব্দে এই ভাবই প্রকাশ পায়। পরে ক্রমশ লোকের উপলব্ধি হয় যে ভূমিটা বাহিরের খোসামাত্র, রাষ্ট্রের যথার্থ দেহ দেশের নরনারী, নিত্য পরিবর্তনশীল কিন্তু নিত্য এক। এই বোধ আসিলে তখন রাষ্ট্রীয় চেতনা অন্তর্মুখী হইল। তখন আমাদের বুঝিবার সম্ভাবনা হইল যে রাষ্ট্রের যেমন দেহ আছে তেমনই তাহার আত্মাও আছে, আত্মগত জীবনের ভাল মন্দ দুই আছে।

সমাজ-বিষয়ে বহির্দৃষ্টিই সারা ঐতিহাসিক যুগ ধরে মানুষকে চালাইয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে খুব বেশি, প্রাচ্যে অপেক্ষাকৃত কম। রাজা,

প্রজা, পণ্ডিত, সবাই রাষ্ট্র বলিতে বুঝিয়াছেন তাঁহাদের শ্রেণীগত অধিকার, রাজ্যের বিস্তৃতি, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা, বিধি-বিধান ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। ইতিহাস বলিতে মানুষ বুঝিয়াছে রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক ধারণা প্রেরণা। মানসিক শক্তি পদার্থটি স্বীকৃত হইয়াছে শুধু ব্যক্তিসম্বন্ধে। বহু ঐতিহাসিক ধরিয়া লইয়াছেন যে প্রাকৃতিক বিধানের অনুযায়ী বাহিরের অভাব অনটনগুলিই রাষ্ট্রের গতি নির্ণয় করে। কাজেই, ইতিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্রীয় আবেষ্টনের প্রভাব, অর্থনীতিক শক্তিসমূহের খেলা এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অভিব্যক্তি। যাঁহারা মনস্তত্ত্বের উপর জোর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নজরে ত ইতিহাসের অর্থ হইয়া দাঁড়ায় জাতীয় নায়কগণের জীবনবৃত্তান্তের সমষ্টি। কিন্তু এ ত যথার্থ ইতিহাস নয়, এ শুধু সেই যুগের কাহিনী, যখন জাতির আত্মচৈতন্য পূর্ণভাবে জাগে নাই। তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে তখনও অন্তর্দৃষ্টি কাজ করিতেছিল। কাজ করিতেছিল বটে, তবে অবচেতন ভাবে। এই অবচেতন শক্তি যখন প্রকট হয়, তখন রাষ্ট্রের পরিচয়ের সূত্রপাত হয় তাহার আত্মার সহিত। অন্তরের সহিত একটা অস্পষ্ট রকমের সম্বন্ধ মানুষের বরাবরই ছিল, তবে অভিব্যক্তির প্রথম স্তরগুলিতে সেই অস্পষ্ট বোধ নানা খুঁটিনাটি বাজে বিষয় লইয়াই থাকিত—সামাজিক খেয়াল-সংস্কার, সামাজিক অভ্যাস ইত্যাদি। ইহাকে বলা যায় অন্তরের বাহ্যবুদ্ধি। অন্তর্দৃষ্টি অস্পষ্ট ছিল বলিয়া মানুষ তাহার সংস্কার খেয়াল অভ্যাসাদির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন কারণ দেখিতে পাইত না।

এই কথা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায় দুইয়ের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। ধর্মসম্প্রদায় ত ধর্মের ব্যাপার, অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাই তাহা চালিত হওয়া উচিত। কেন না, ধর্মের কাজই আত্মার সন্ধান ও উপলব্ধি। তবু দেখা যায় যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জীবনধারা, আরম্ভে আধ্যাত্মিক হইলেও, অতি সত্বর একটা ক্রিয়াকর্ম,

বিধিনিষেধাদি অন্ধ আচারের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। দুই শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের ইতিহাস ত ধর্মের নামে অত্যাচার নির্মম নরহত্যা ও নির্মম যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী বই কিছু ছিল না! গত কয়েক দশকমাত্র মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত মূলসত্য এবং তাহার আত্মার সন্ধান করিতে শিখিতেছে।

অধুনা আমরা দেখিতেছি যে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় চেতনা খুব দ্রুত এক নূতন মনোময় পথে ধাবিত হইয়াছে। জাতিসমূহ আপন প্রচ্ছন্ন আত্মার, আপন নিগূঢ় সত্তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আপন নব উপলব্ধিকে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রয়োগ করিতেছে। এই নূতন ধারার শক্তি ও বেগ বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইতেছে নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে, অথবা এমন সব পরাধীন জাতিগণের মধ্যে যাহারা পরতন্ত্র হইয়াও আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। নবজাগ্রত স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ জার্মানী ও নবজাগ্রত পরাধীন জাতির উদাহরণ ছিল স্বদেশীতে উদ্বুদ্ধ বঙ্গদেশ এবং Sinn Fein-এ প্রবুদ্ধ আয়র্লণ্ড।

জার্মানীর কথা পরে বিশদভাবে বলিতেছি। কিন্তু বঙ্গদেশের ও আয়র্লণ্ডের উদ্বোধন অন্তর্মুখী হইয়াছে প্রধানত এই কারণে যে আবেষ্টন অতি প্রতিকূল হওয়ার দরুণ এই দুই স্থানে বহির্মুখী প্রচেষ্টা সম্ভবপর হয় নাই। প্রবল সর্বগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ইহাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ইজ্জতের জোরে। অন্তরে স্বরাজের পতাকা তুলিয়া ইহাদিগকে বলিতে হইয়াছিল—আমি আমিই থাকিব, তুমি শক্তিমান হইতে পার, কিন্তু তোমার হুকুমে আমি আমার স্বভাব ছাড়িব না। অবশ্য পাঠকের জানা আছে যে শ্রীঅরবিন্দ এই পরিচ্ছেদ লেখার পরে আয়র্লণ্ডের আবহাওয়া কেমন করিয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া গেল। অন্তর্মুখী জাগৃতি বহির্মুখী হইবার সুযোগ পাইল। স্বাধীন

আইরিশ রাষ্ট্রের পত্তন হইল। বঙ্গদেশের প্রাদেশিক জাগরণও আজ অন্য মূর্তি ধারণ করিয়াছে। একটা বৃহত্তর সত্তা, বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীর বাঙ্গলা আজ আবার নিজেকে হারাইয়াছে। ভালমন্দ বিচারের এ স্থান নয়। আর, সত্যই ত ভালমন্দ মালিকের হস্তে। মোট কথা আয়র্লণ্ড ও বাঙ্গলা দুই দেশেরই ভাবনা-ধারা আজ একটা বাহ্য লক্ষ্য পাইয়াছে। তাই অনেকাংশে তাহার অন্তর্মুখী দিকটা চলিয়া গিয়াছে। তবে, শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে প্রাচ্য দেশসমূহে, চীনে, ইরানে, ভারতে, এমন কি পাশ্চাত্যের অনুকারী জাপানে পর্যন্ত নব অভ্যুদয়ের প্রেরণা অন্তরের যতটা, বাহিরে ততটা নয়। এই সমস্ত জাতির জাগরণের মধ্যে একটা Sinn Fein বা স্বদেশী ভাব বেশ সুস্পষ্ট। ভবিষ্যতে থাকিবে কি না বলা যায় না। জাপান ত আজ অন্য পথ ধরিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

তথাপি, আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে কতকগুলি দেশে বা কতকগুলি জাতির মধ্যে আমরা যে অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মোপলব্ধি দেখিতেছি তাহা সমগ্র মানবজাতির পরিবর্তনেরই পূর্বাভাস। এই অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর, এই আত্মার সন্ধান, ইহা ইচ্ছাকৃত। কোথাও অনুকূল আবেষ্টনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোথাও ফুটিতে দেরী হইতেছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে, এই দিকে একটা সাধারণ পরিবর্তন আসন্নপ্রায়। আয়র্লণ্ড ও ভারতবর্ষ জগৎ সমক্ষে প্রথম এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল, আমি যাহা, তাহাই থাকিব, আমি আত্মঘাতী হইব না। তাহার পূর্বে অধীন জাতিমাত্রেরই চেষ্টা ছিল যতটা পারে, প্রভুর অনুকৃতি। আজ আমি আমিই থার্কিব, এই মন্ত্র সকল দেশেই জীবনের প্রেরণা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এ পথে বিপদ আপদ নাই, এমন নয়। কিন্তু মানবজাতি আর এ আত্ম-অন্বেষণের পন্থা ছাড়িবে না—ব্যক্তিতেও নয়, জাতিতেও নয়। জাতির গভীরতর সত্তা, তাহার নিগূঢ় বিধান, তাহার অভ্যন্তর প্রদেশে অধিষ্ঠিত আত্মা, হইবে প্রত্যেক জাতির সাধনার বিষয়।

এই ভাব সর্বত্র জাগিয়া উঠিতেছিল বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে—প্রধানত পরাধীন ভারতে ও আয়র্লণ্ডে এবং জার্মানীর স্বাধীন নবগঠিত রাষ্ট্রে। যুদ্ধের ফলে সর্বত্র বেগে জাগিয়া উঠিল সেই গভীর আত্মচৈতন্য, কিন্তু রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। চৈতন্যের প্রকাশ হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হইল জটিল বর্বরজনোচিত-রূপে। টিউটন জাতি "to be oneself"-এর অর্থ বুঝিল আত্ম-সর্বস্ব হওয়া। অশেষ অনর্থের সূত্রপাত হইল। কেন অনর্থের পত্তন হইল তাহা বোঝা দরকার। মানব-অভিব্যক্তির অন্তর্মুখী যুগ ত আসিল; জাতিসমূহ আপন আত্মার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহাতে কি ভাল ফল ফলিতে পারে, যদি না প্রত্যেক জাতি অপর সমস্ত জাতির আত্মাকেও চিনিতে শেখে, যদি না পরস্পরকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শেখে? এই মৈত্রী শুধু বুদ্ধি-চালিত স্বার্থপ্রণোদিত হইলে চলিবে না, ইহার পশ্চাতে অন্তরের দেবতার প্রেরণা চাই। আমরা ত চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম নানারূপ জনহিতকর প্রণোদনা সত্ত্বেও জেনিভার আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ কিরূপে ধ্বংসপথে গেল—পশ্চাতে অন্তর্দেবতার প্রেরণা ছিল না বলিয়াই ত!

সম্প্রতি জগতে আন্তর শক্তি দুই দিক হইতে খুব জোর পাইয়াছে। প্রথমত জার্মানীর উদাহরণ হইতে; দ্বিতীয়ত জার্মানীর ভীষণ আক্রমণ-তাণ্ডবের ফলে। জার্মানী তাহার আত্মচৈতন্য হইতে এমন বেগ, এমন বল সঞ্চয় করিয়াছে যে তাহার দ্বারা নিপীড়িত দুর্বল জাতিও তাহার প্রতিঘাতে আপন অন্তরের গভীরতায় প্রবেশ করিতেছে প্রেরণার জন্য।

এখন, বিচার করিতে হইবে যে জার্মানী তাহার এই প্রচণ্ড subjective শক্তি পাইল কোথা হইতে, এবং পাইয়াও তাহার এরূপ আসুরিক অপপ্রয়োগে মত্ত হইল কেন? উনিশ শতকের অষ্টম দশকে এই জাতি প্রথম এক-রাষ্ট্রীয়তা লাভ করিল। তাহার আগে জার্মান জাতি ভিন্ন-ভিন্ন অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্যের প্রজা ছিল। এই প্রজাদের মধ্যে ভাষাগত সংস্কৃতিগত জাতিগত

সাম্য অনেকটা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে ইহারা এক অখণ্ড জার্মানী কখনও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। কালের গতিতে পূর্বসীমান্তে প্রবল প্রুসিয়া রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটাতে বাভারিয়া-আদি পশ্চিম দক্ষিণের পুরাতন রাজ্যগুলি আরও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ফলে বিক্ষিপ্ত-শক্তি জার্মানী সহজে সম্রাট নেপোলিয়নের অধীনস্থ হইল—প্রুসিয়াও যেমন গেল, বাভারিয়াও তেমনই গেল, প্রটেষ্টাণ্ট কাথলিক দুই সম্প্রদায়ের জার্মানই এক সাথে স্বাধীনতা হারাইল। এই যে কয়েক বৎসর ধরিয়া নেপোলিয়নের দাসত্ব, ইহাতেই এই জাতির অন্তরে মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিল। ইতিহাসে প্রথম একটা জ্বলন্ত জার্মান জাতীয়ভাব দৃষ্টিগোচর হইল। এই ভাবেরই পরিচয় আমরা পাই টুগেণ্ডবুণ্ড বা ধর্মসজ্ঘ নামক গুপ্ত সম্প্রদায়ের কার্যধারাতে। নগরে, গ্রামে, পাহাড়ে, সমতটে, সর্বত্র খোদিত, অঙ্কিত, দেখা যাইতে লাগিল টুগেণ্ডবুণ্ডের T অক্ষর, একটা বিশাল জাতির জাগরণের, তাহার আত্মোপলব্ধির চিহ্ন অবশেষে, আমরা জানি যে T-র সম্মুখে N টিকিতে পারিল না। জার্মানীর প্রবুদ্ধ আত্মচৈতন্য ব্লুকারের রূপ ধরিয়া ফরাসী সম্রাটকে হারাইয়া দিয়া অখণ্ড জাতিগঠনে মনোনিবেশ করিল। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আরও প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাটিয়া গেল। এই অর্ধ শতাব্দী জার্মানী নানা রাজ্যে বিভক্ত রহিল বটে, কিন্তু পূর্ববৎ লক্ষ্যহীনভাবে নয়। একমুখী চেষ্টা লইয়া জার্মান জাতি কাজ করিতে থাকিল, এক অখণ্ড বিরাট রাজ্য তাহারা গড়িবে, জার্মানীর অন্তরতম সত্তাকে জাগাইয়া তুলিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিবে। তখন যে এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে লুক্কায়িত ছিল এক প্রচণ্ড আসুরিক প্রেরণা, "সারা জগৎকে আমার পদানত করিব," তাহা জগৎও জানিত না, জার্মানীও জানিত না। তবে জার্মানের মত জাতি দেবতা হয়, নয়ত দানব হয়, ক্ষুদ্র অক্ষম মানবত্ব লইয়া সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। কাণ্ট, হেগেল, ফিখ্‌টে, নিট্‌শে, যাহাদিগকে গভীরতম জীবনতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব শিখাইয়াছে,

বেটফেন্ ওয়াগ্নের যাহাদিগকে মর্মস্পর্শী সঙ্গীতশাস্ত্র শিখাইয়াছে, গ্যেটে যাহাদের অন্তর্দর্শী কবি, তাহারা যে নূতন এক যুগের প্রবর্তক হইবে ইহা নিয়তি-নির্দিষ্ট। সঙ্কীর্ণ ইতিহাস পড়িয়া যেন আমরা মনে না করি যে, কাইসার উইলিয়াম, সেনাপতি মল্‌কে ও মন্ত্রীবর বিস্‌মার্ক জার্মানীকে শক্তিমান করিয়াছিলেন। যথার্থ শক্তি এই বহির্মুখী কর্মীরা দেন নাই, বরং জার্মানীর নবজাগ্রত অন্তরের শক্তিকে ইহারা বিপথে চালিত করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, precipitated its subjectivity into form and action at too early a stage. জার্মানীর উত্থান স্পষ্টত নিয়তি-নির্দিষ্ট। সে উত্থানের প্রতীক শুধু তাহার দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ মণ্ডলী নয়। নানা দিক দিয়া এই আশ্চর্য দেশ ইউরোপের সভ্যতা সংস্কৃতিকে আগাইয়া দিয়াছে। জার্মান ঐতিহাসিক, জার্মান বৈজ্ঞানিক, জার্মান শিল্পী, জার্মান কারখানার মালিক, সবাই পরিচয় দিয়াছে তাহার আশ্চর্য কার্যক্ষমতার, কার্যকরী বুদ্ধির ও সংঘটনের। এই উদ্যম, এই কর্মতৎপরতা জার্মানের নিজস্ব—কাইসার বা বিস্‌মার্কের দান নয়।

তাহা হইলে জার্মানীর হইল কি? এতখানি অন্তর্দৃষ্টি লইয়া, এত বড় প্রেরণা লইয়া, কার্যত এত দূর নামিয়া আসিল কিরূপে? পূর্বেই বলিয়াছি যে শুধু নিজের আত্মা দর্শন করিলে ত চলিবে না, সবাইয়ের আত্মাকে দেখিতে হইবে, সবাইয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে, তবেই উন্মত্ত দম্ভের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে। সেই অত্যাবশ্যকীয় শ্রদ্ধা ও মৈত্রী জার্মানীর হৃদয়ে জাগে নাই তাই জার্মানী রামচন্দ্র ভজিতে পারিল না, দশানন ভজিল।

জাতীয় অভ্যুদয়ে সকল দিক সমঞ্জস ভাবে ফুটিয়া উঠা চাই। মানুষের স্বভাব জটিল, তাহার সত্তার উর্ধ্বতম দিক আছে, নিম্নতম আছে। কোনটাই অবহেলা করা চলে না। আয়র্লণ্ড তাহার ভিতরের দিকটা ফুটাইয়া

তুলিয়াছিল, কিন্তু বহুকাল যাবৎ তাহার অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মাঝে সে সেতু বাঁধিতে পারে নাই। তাই তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইতে এত বিলম্ব হইল। জার্মানী সেতু বাঁধিয়াছে, কিন্তু সে সেতু ঘোর অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। অন্ধকার গহ্বরস্থ কত বিষাক্ত বায়ু সে বাহিরে বহিয়া আনিয়াছে, কে জানে! নিট্‌শের দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে নানারূপে বিকৃত করিয়া ট্রাইট্‌স্কে তাহার কিরূপ অপপ্রয়োগ করিয়াছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জুলুম জবরদস্তিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করিবার জন্য! তাহা এমন বিকৃত যে নিট্‌শে আজ থাকিলে হয়ত তাহাকে চিনিতেই পারিতেন না। তবু জার্মানীর অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যস্থ সেতুকে অস্বীকার করা যায় না। অর্ধশতাব্দী আত্মোপলব্ধির সাধনা, অর্ধশতাব্দী উপলব্ধ সত্যকে প্রয়োগ করিবার প্রচেষ্টা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জাতীয় সংঘটন, ইহার সবটাই সুস্পষ্ট। তথাপি তাহার পরিণাম দাঁড়াইল প্রতিবেশীর উপর জুলুম জবরদস্তি, আন্তর্জাতিক গুণ্ডামি। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গে আসল বস্তুটাই জার্মানের লক্ষ্য এড়াইয়া গেল, তাই এই বিপথগমন।

কেহ-কেহ হয়ত এরূপ মনে করিবেন যে অভিব্যক্তির পন্থাটাই বিপদসঙ্কুল, সাঁকো বাঁধিয়া কাজ নেই, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া কাজ নেই, পুরাতন পরিচিত নিরাপদ পথেই চলা ভাল। কিন্তু গুরুবর বলিতেছেন, অর্থসঞ্চয় দেবপূজার জন্যও হইতে পারে, আপন নীচবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যও হইতে পারে। অর্থসঞ্চয়ে, বলসঞ্চয়ে ত পাপ নাই, পাপ তাহার অপপ্রয়োগে। তাছাড়া, ক্রমোত্তরণের পথে ফিরিয়া যাওয়া ত চলে না। জার্মানীর আত্মোপলব্ধির সাধনা আমাদের সবারই অনুকরণীয়। কিন্তু তাহার পথভ্রান্তি বর্জনীয়। আজিকার ভীষণ রক্তবর্ণ ধূমের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, চিনিতে হইবে পরম সত্য, বুঝিতে হইবে কেন জার্মানীর মত এত বড় জাতি সেই সত্য দেখিয়াও দেখিল না, পাইয়াও পাইল না। এই বিভ্রম, এই পদস্খলন,

যোগমার্গের পরিচিত বস্তু। জার্মানী তাহার প্রাণময় অহমিকাকে আত্মন্ বলিয়া ভুল করিয়াছে। সেই আসুরিক শক্তি লইয়া সে তাহার দেহপ্রাণমনকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। ইহা অপেক্ষা বড় ভুল আর কি হইতে পারে, ব্যক্তির বা জাতির ?

পঞ্চম

দানবশক্তির জাগরণ

মানব সমাজের ক্রমোত্তরণে অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ একটা বিশিষ্ট ধাপ। প্রতীক, আদর্শ ও আচারের যুগ ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিয়া মানুষ মুখ ফিরায় আপন ব্যক্তিগত বুদ্ধির দিকে। একথা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তখনও মানুষের নজর থাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাহিরটার উপর। ব্যক্তির ও বিশ্বের বিধিবিধান, যাহার সে সন্ধান করে, তাহা বাহ্যিক। তবে বেশি দিন এরূপ চলে না। অবশেষে সে ডুব দেয় অন্তরের গভীরে, নিগূঢ় সত্যের নিগূঢ় বিধানের খোঁজে। যখন মানব আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইল, তখন হইতে সে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে সেই জ্ঞানের আলোকে। শুধু জীবনের বাহ্য স্বরূপের দ্বারা, বাহ্য প্রেরণার দ্বারা আর সে চালিত হইবে না।

কিন্তু এই অচেনা পথে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও বিস্তর। সব নির্ভর করিতেছে তাহার অন্তর্দৃষ্টির উপর। নৌকা যতক্ষণ ঘাটে বাঁধা থাকে ততক্ষণ সে নিরাপদ, কিন্তু অগাধ জলের স্রোত-ঘূর্ণির মাঝে পাড়ি দিতে হইলে পাকা মাঝির প্রয়োজন। তাই অন্ধ আচারের যুগে মানুষের তত বিপদ ছিল না, যত আসিল যুক্তিবুদ্ধির যুগে। তবু চিরদিন ত ঘাটে বসিয়া থাকা চলে না! একদিন খোলা দরিয়াতে ডিঙ্গা ভাসাইতেই হয়, যতই না কেন বিপদ আপদ সেখানে থাকুক। মানব যখন আচারের অন্ধকূপ ভাঙিয়া অজানার সন্ধানে মুক্ত প্রাঙ্গণে বাহির হইল, তখন সে বিপদকে মাথায় তুলিয়া লইল নূতন জীবন লাভ করিবার আশায়।

মানুষের নানা স্বরূপ আছে, দৃশ্যমান ও বাহ্যিক, কিন্তু তাহার নিগূঢ় প্রকৃত স্বরূপ মাত্র একটি। প্রতীয়মান বাহ্যস্বরূপকে সত্য রূপ মনে করাই নানা ভ্রান্তির, নানা অনর্থের মূল। ব্যক্তি বা সমাজের অভিব্যক্তির বিষয়ে

আলোচনা করিবার সময় এই কথাটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে মন অন্তর্মুখী হইলেও অন্তরের দেবতা না জাগিয়া কখন-কখন দানব জাগিয়া উঠে কেন।

আধুনিক সভ্যতা সব জিনিসকে যে ভিতর হইতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উদাহরণ স্বরূপ, ছেলেমেয়ের পালন ও শিক্ষার ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। আজ তাহার ভিত্তি হইয়াছে শিশুর মনস্তত্ত্ব, তাহার মনের ক্রমোন্মেষ। নবীন শিক্ষার লক্ষ্য দাঁড়াইয়াছে, শিশু তাহার আপন সত্তাকে আপন সামর্থ্য ও স্বভাব অনুসারে ফুটাইয়া তুলিবে, শিক্ষক তাহার সাহায্য করিবেন মাত্র। এই এক শিক্ষার ধারা, আর আগে ছিল আর এক ধারা, ছেলেকে জোর করিয়া মামুলী বিদ্যা গেলান, যেন রোগীকে বলপূর্বক ঔষধ সেবন করান! চোর ডাকাত খুনে প্রভৃতি অপরাধীর প্রতি ব্যবহারেও এইরূপ আমূল পরিবর্তন হইতেছে। আগে নীতি ছিল, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। রাজা দণ্ডবিধান করিতেন কতকটা প্রতিহিংসা বশে—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—কতকটা ভাবী দুষ্কৃতদের মনে ভীতিসঞ্চার করিবার জন্য। এখন ধারা হইয়াছে অপরাধীর মনোভাব বিশ্লেষণ, তাহার আবেষ্টনের বিচার, অপরাধের কারণ নির্ধারণ। দুষ্কৃতকে বাহির হইতে পিষিয়া না মারিয়া বরং তাহার মনের গতি ফেরান। জনসমষ্টি সম্বন্ধেও আধুনিক মত এই যে সমাজ একটা জীবন্ত সত্তা। তাহার জন্ম আছে, জীবন আছে, মরণ আছে। তাহার মন আছে। সে নিজের জীবনকে সার্থক করিতে চায়।

ইহা সত্য যে এই নূতন অন্তর্দৃষ্টির একটা গভীর অর্থ আছে, আত্মজ্ঞান তাহার প্রেরণা, উচ্চ তাহার আদর্শ। কিন্তু পথ অজানা, ইহার সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই। আমাদের জ্ঞানদৃষ্টিও সসীম, তাই পদস্খলন ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনাও বিস্তর। জার্মানী যে প্রচণ্ড চেষ্টা করিয়াছে তাহার

সম্যক আলোচনা করিলে আমরা ঠিক বুঝিতে পারি যে এই পথে বিষম ভুলচুক কেমন করিয়া আসে। প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অন্তর্দৃষ্টির উদয় হইয়াছে ব্যক্তিবাদের মধ্য হইতে, তাই ব্যক্তির ভিতরে যে প্রবল অহমিকা ছিল তাহা আরও উৎকট রূপে সংক্রামিত হইয়াছে সমাজে ও রাষ্ট্রে। ফলে দেখা দিয়াছে এক নূতন সর্বনেশে অহমিকা, এক উদ্দাম রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বার্থপরতা। মানবের নানা জাতির হৃদয়ে গর্ব দম্ভ চিরদিনই ছিল বটে। গ্রীসীয় জাতির বর্বরদের প্রতি ভাব, ভারতীয় আর্যের অনার্যের প্রতি অবজ্ঞা, ইহুদীদের মিসর অসুর প্রভৃতি বলশালী জেণ্টাইল জাতির প্রতি বিদ্বেষ, মুসলমানের কাফেরকে ঘৃণা, গত শতাব্দীতে শ্বেতকায়ের কৃষ্ণকায়ের প্রতি নির্মমতা, এ সব ইতিহাসের কথা। কিন্তু এই সমস্ত দর্প-দম্ভ কেন্দ্রীভূত হইয়া উনিশ শতকের শেষভাগে জার্মানের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ দিক দিয়া একা জার্মানই যে দোষী তাহা নহে। যে অহমিকা শ্বেতজাতি মাত্রেরই ব্যবহারে অল্পবিস্তর প্রকাশ পাইতেছিল তাহা জার্মানের হৃদয়ে পরাকাষ্ঠা লাভ করিল। তাহার দম্ভ, তাহার অত্যাচার, শ্বেতকৃষ্ণের বাছবিচার করিল না। যে সব অনাচার সুদূর আশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াতে ঘটিতেছিল তাহা ইউরোপের মাঝে দেখা দিল। এতদিন যে একটা ভব্যতার মুখোশ, ধর্মের ভান, সংস্কৃতির দোহাই ছিল, তাহা লোপ পাইল। তত্ত্বানুসন্ধানের পথে, আমরা অত্যাচারী দাম্ভিক মাত্রকেই দেবতার নামে দোষী করিব, আনাড়ী বা half-hearted অনাচারীকে নির্দোষ বলিব কেন? ছিঁচকে চোর ও বড় সিঁধেল চোরের অন্তরের প্রেরণা একই। শুধু একজন অন্যজন অপেক্ষা কর্মকুশল।

তবে জার্মানী শক্তিতে, সংগঠনে, আজ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার কার্যকলাপ আলোচনা করিলে রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির পথে যে প্রলোভন, বিপদ-আপদ, ভুলভ্রান্তি আছে তাহা পরিষ্কার বোঝা যাইবে। দানবের ভীষণ নগ্নমূর্তি

স্পষ্ট দেখা যাইবে। অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণাতেই মানবকে অগ্রসর হইতে হইবে। তজ্জন্য সেই পথে খানা-খোন্দল কোথায় আছে তাহা সঠিক জানা চাই। জার্মান সেগুলিকে উত্তমরূপেই জানিয়াছে। তাই মনে হয় যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত জার্মান দশাননের কাছেই একদিন নবযুগের রামচন্দ্রকে বসিতে হইবে গূঢ় রাষ্ট্রনীতির উপদেশের জন্য।

মানুষ যদি নিজের জীবনের যথার্থ বিধান জানিতে চায় ত তাহাকে বুঝিতে হইবে যে তাহার অহমিকা তাহার আত্মন্ নয়, অন্তঃপুরুষ তাহার আত্মন্। তাহার আত্মন্, অপরের আত্মন্, সর্বভূতের আত্মন্, এক ও অভিন্ন। যদি সে আপন জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিতে চায় ত দেহ-প্রাণমনের দাবি মিটাইয়া তাহা পারিবে না। তাহাকে আপন অন্তরস্থ দিব্যসত্তাকে ভিতরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেই সত্তার আলোকে সে জীবনের সত্য সুন্দর ও আনন্দের সন্ধান পাইবে।

বাঁচিবার সংকল্প, জানিবার সংকল্প, আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তারের সংকল্প, এ সমস্তই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ আপন প্রকৃতিবশেই সে সংকল্প পূর্ণ করিতে চায়। সে ইচ্ছাকে দমন করা মানে তাহার মনুষ্যত্বকে খর্ব করা। তবে ইচ্ছাকে সত্য পথে চালিত করিতে হইবে, অহমিকা বর্জন করিতে হইবে, নহিলে আপন অহমিকার সহিত অপর সমস্ত অহমিকার নিত্য সংঘর্ষ চলিবে, সমগ্র মানবের উত্তরণের পথ রুদ্ধ হইবে। যে অপরের ধ্বংসের উপর নির্ভর করে, তাহার আপন ধ্বংসও অনিবার্য। অবশ্য যতদিন না আত্মজ্ঞান জাগ্রত হয়, ততদিন মানুষ, ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রগত, চিন্তায় ও ও কর্মে স্বার্থ-সর্বস্ব হইবেই। অজ্ঞানের মধ্যে যাহার বাস, ভেদ অহমিকা তাহার অঙ্গের ভূষণ। ক্রমোত্তরণের পথে এই ভেদময় জগৎও নিয়তি-নির্দিষ্ট। জীবনের এই স্তরে মানব তাহার আইনকানুন, নীতি-জ্ঞান, শাস্ত্রানুশাসনের সাহায্যে বাহির হইতে যতটা পারে উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ

করে। যথার্থ আত্মজ্ঞান তখনও তাহার ভিতরে জাগে নাই। কিন্তু তাহাকে ধীরে-ধীরে আপন সত্তাকে অন্তর্মুখী করিতেই হইবে, আত্মজ্ঞান জাগাইতেই হইবে। তাহাকে জানিতেই হইবে যে অহমিকা, ভেদজ্ঞান, এ সব দুদিনের জিনিস, আসল বস্তু তাহার দিব্যসত্তা। মানবজাতির অভিব্যক্তি মানেই সেই দিব্যসত্তার জাগরণ, দিব্য অভেদ-জ্ঞানের উন্মেষ। এই যে অভেদ-জ্ঞান, যাহা ক্রমোত্তরণের পথে একান্ত আবশ্যক, ইহার তাৎপর্য এই যে আমার অন্তঃপুরুষ ও অপর সকলের অন্তঃপুরুষ এক ও অভিন্ন, সবই এক অখণ্ড পরম পুরুষের প্রকাশ। এই ভাবই প্রকট হইবে একদিন, যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনই বিশ্বে। ব্যষ্টি এক রকমে ঈশ্বরকে প্রকট করিবে, সমষ্টি আর এক রকমে। কেহ কাহাকেও খর্ব করিবে না, বাধা দিবে না। ব্যক্তি যতক্ষণ সংসারে থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তির অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিতেই হইবে। সমাজকেও তেমনই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, তাহার সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটনের দিকে নজর রাখিতে হইবে, কেন না ব্যক্তির নাশে বা অধোগমনে তাহারই অঙ্গহানি। এই যথার্থ Subjectivism-এর শিক্ষা। ভারতীয় ঋষি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই তত্ত্ব যে আমি মানে সেই পরম পুরুষ যিনি আমাদের যথার্থ আত্মন্, যাঁহাকে আমাদের পাইতেই হইবে। সেই পুরুষ সবার মধ্যেই, ব্যষ্টি তথা সমষ্টিতে, এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্তারূপে বিদ্যমান।

ব্যক্তি সম্বন্ধে মানুষ এই সত্য কিছু-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে, যদিচ সে উপলব্ধিকে সে কাজে লাগাইতে পারে নাই, যদিচ অনেক ক্ষেত্রে তাহার কার্যধারা তাহার উপলব্ধির উল্টা দিকেও গিয়াছে। জাতি বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আরও বেশি গোলযোগ হইয়াছে, কেন না সেখানে এই সত্যকে মানুষ আদৌ ধরিতে পারে নাই। এখানেই জার্মানের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। সমষ্টির অহমিকাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে সমষ্টিকে জীববৎ এবং ব্যষ্টিকে

জীবকোষবৎ বলিয়া দেখিতে লাগিল। জাতিই হইল তাহার নজরে জীবনের মুখ্য অভিব্যক্তি। প্রাণমন তাহারই, চেতনা তাহারই, ব্যক্তি ত জীবকোষের মত অবচেতন তত্ত্ব মাত্র! আবার, জাতি বলিতে সমগ্র মানব জাতিকে সে ঠিক দেখিল না, কারণ স্পষ্টত ও কার্যত এই বিরাট সমষ্টির ধারণা করা কঠিন। তাই কার্যক্ষেত্রে সে প্রতীক দাঁড় করাইল শক্তিমান, বুদ্ধিমান প্রগতিশীল জার্মান রাষ্ট্রকে ও টিউটন জাতিকে। স্থির করিল যে জার্মানীকে যত বড় করিবে, টিউটনের প্রভাব যত বাড়াইবে, সমগ্র মানব জাতির উৎকর্ষও ততটা সাধিত হইবে। সে বুঝিল না যে রাষ্ট্রীয় অহমিকা ও টিউটন দম্ভকে সিংহাসনে বসাইয়া সে কত বড় দানবের আবাহন করিতেছে! এইরূপে দেবতাকে ছাড়িয়া রাষ্ট্ররূপ অপদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইল এই প্রবল পরাক্রান্ত জাতি। অন্তর্দৃষ্টির অপূর্ব পরিণত ঘটিল!

কিন্তু এ ছাড়াও নানারকমে এই সমষ্টিগত অহমিকা জগতের ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিল। সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করিল এই বদ্ধমূল ধারণা যে ব্যক্তির জীবনের আপন মূল্য কিছু নাই, তাহা সমষ্টির জীবনের কলকব্জা মাত্র হইবে। ব্যক্তিকে অন্নবস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্যাদির দিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে বই কি। কিন্তু স্বতন্ত্র ইচ্ছা তাহার থাকিবে না, সে সমষ্টির আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাত্র হইবে। এখন, এই যে সমষ্টি, ইহা ত মূলে একটা অস্পষ্ট ধারণা। ইহার অবস্থান কোথায়, কোথা হইতে ইহা আপন ইচ্ছা, সংকল্প ও শক্তি প্রয়োগ করিবে? এ প্রশ্নের উত্তর, রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই নিয়ন্তা অনুমন্তা, সেই প্রাণবস্তু, তাহার সত্তাতেই মানবজীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। এই রাষ্ট্রকে করিতে হইবে সর্বরকমে পূর্ণ ও শক্তিশালী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বব্যাপী। ফলে, ব্যক্তি গেল, তাহার স্থানে আসিল সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত সর্বশক্তিমান সর্বগ্রাসী আধুনিক রাষ্ট্র। জার্মানী বর্তমান যুগের স্টেট পূজন প্রবর্তিত করিল। সংঘটন ও সংঘশক্তি চরমে উঠিল, কিন্তু তাহার মূল্য ধরিয়া দিতে হইল মানুষকে। সে মূল্য যে

কতটা, তাহা আজও সম্যক্ বোঝা যায় নাই। তবে, গভীরতর বৃহত্তর জীবনের আদর্শ পশ্চাতে হটিয়া গেল। চলিয়া গেল বোধির শক্তি, অধ্যাত্ম জীবনের মাধুর্য, যাহা শুধু ব্যক্তির মধ্যেই প্রকট হইতে পারে। এটুকু পরিষ্কার।

নবীন যুগের রাষ্ট্র হইল লোকের চক্ষে দিব্যপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সত্তা। আগে-কার দিনে যেরূপ দ্বিধাশূন্য হইয়া লোকে দেবতার আদেশ মাথায় তুলিয়া লইত, সেইরূপ এখন রাষ্ট্রের আদেশ মানিয়া লইতে লাগিল। রাজ্যের মধ্যে সুনীতি দুর্নীতি নির্ধারিত হইতে লাগিল রাষ্ট্রের অনুমোদিত কি অননুমোদিত তাহার উপর। ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান রহিল না। অপর দিকে এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের সম্বন্ধ হইল দুটি সমষ্টিগত প্রচণ্ড অহমিকার সংঘর্ষ, যুদ্ধ। এই যুদ্ধই হইল মানুষের মস্ত বড় কাজ। আগেকার যুগে ব্যক্তিগত এক অহমিকার সহিত আর এক অহমিকার যুদ্ধ বন্ধ থাকিত প্রতীকের, আদর্শের বা আচারের প্রভাবে। যখন রাজ্য গঠন হইল, তখন রাজা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিলেন। রাজা ও ব্রাহ্মণ দেবতার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহারা দেবতার নামে শান্তি রক্ষা করিতেন। কিন্তু এখনকার আন্তর্জাতিক পরিবেশে দেবতার কথা কে শুনিবে? সুনীতি দুর্নীতি মানে জয়পরাজয়। এই যে জার্মানীর রাষ্ট্রনীতি, ইহারই অনুকরণ করিতেছে অপর বহু জাতি, কেহ খোলাখুলি, কেহ লুকাইয়া। যুদ্ধাবস্থা ও শান্তির অবস্থার মধ্যেও বিশেষ তফাৎ নাই, কেন না শান্তির দিন মানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। যুদ্ধে যেমন নানা আক্রমণ-পন্থা আছে আছে, শান্তিতেও সেইরূপ কত পন্থা আছে! যুদ্ধে শত্রুকে প্রাণে মারা হয়, শান্তিতে পেটে মারা হয়। পেটে মারিবার কত রকমের ভীষণ শস্ত্র আছে তাহা পাঠক ভালরূপেই জানেন।

তাহা হইলে নবীন তন্ত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শেষ হইবে, সুনীতি কুনীতিরও আর কোন প্রয়োজন রহিবে না। মানবের এক লক্ষ্য হইবে সর্বশক্তিমান

রাষ্ট্র সংগঠন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, যুদ্ধে বা শান্তিতে, প্রবল দুর্বলকে গ্রাস করিবে, দুর্বল জাতির সমূলে উৎপাটন নিরন্তর ঘটিবে। অবশেষে একদিন জগতের যোগ্যতম জাতি টিউটন, জগৎ জয় করিয়া মানবের প্রগতির পথ উন্মুক্ত করিবে। এই জার্মানীর স্বপ্ন। জার্মানীকে দেখিতে হইবে যে তাহার এই সংস্কৃতি লইতে পারিবে কে। কর্মকুশলতাও এ সংস্কৃতির অন্তর্গত। ইউরোপ বা আমেরিকার লাতিন জাতিসমূহ কোথায় পাইবে এরূপ কৃষ্টি, এরূপ কর্মকৌশল, যাহার দ্বারা তাহারা মানব জাতির অগ্রগতির সাহায্য করিবে? আফ্রিকা বা আশিয়ার স্বভাবত শক্তিহীন উদ্যমহীন নিম্ন-অধিকারী জাতিবৃন্দের ত কথাই নাই! তাহা হইলে মানবের একমাত্র আশা এই যে জার্মানী অপর সমস্ত টিউটন জাতিকে কুক্ষিগত করিয়া এক বিরাট টিউটন মহাজাতি সৃষ্টি করিয়া ক্রমোন্নতির মার্গ উন্মুক্ত রাখিবে। মানুষ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে।

সকল জার্মানেরই যে এই এক মত ছিল, তাহা নহে। বেশীর ভাগ জার্মান জ্ঞাতসারে এরূপ মনে করে নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? একটা অপেক্ষাকৃত ছোট দল, ভাবুক, শক্তিমান ও উদ্যোগী, সমগ্র জাতিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া চালাইতে পারে, রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর আপন ছাপ মারিতে পারে। জনসাধারণ তাহাদের সব কথা না বুঝিলেও অবচেতন ভাবে তাহাদের নির্দেশ মানিয়া চলে। জার্মানীতে এইরূপই ঘটিল। সমগ্র জার্মান জাতি, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, স্ফুট বা অর্ধস্ফুটস্বরে, এই নেতৃবর্গের সুরে সুর মিলাইল। এই নবীন জীবনধারাকে উপহাস করা সহজ। ততোধিক সহজ ইহাকে অবজ্ঞা কি ঘৃণা প্রদর্শন করা—বিশেষত যখন আমরা নিজেরাও গোপনে এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছি, শুধু সাহস ও সামর্থ্যের অভাবে পূর্ণভাবে তাহার অনুসরণ করিতে পারি নাই। জার্মানীর ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে যে সরল নিষ্ঠা রহিয়াছে তাহা বিকৃত হইলেও তাহার কত শক্তি তাহা আমাদের বোঝা

কর্তব্য, একথা মানিয়া লওয়াই ভাল। জার্মানের জীবনে, যাহাকে চলিত ভাষায় বলে ঢাকঢাক গুড়গুড়, তাহা নাই, তাহার মুখে এক পেটে এক নয়। অবশ্য একদিন জার্মানীর আসুরিক আদর্শকে জগৎ হইতে সরাইয়া দিতেই হইবে, তাহার রাষ্ট্রীয় দম্ভকে চূর্ণ করিতেই হইবে। তবে তাহা আমরা পারিব যদি আমরা তাহারই মত একনিষ্ঠ হই, অথচ আমাদের নিষ্ঠাকে তাহার মত বিকৃত রূপ ধারণ করিতে না দিই। নইলে শুধু মহৎ উদ্দেশ্যের নামে খেলা করিলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না।

জার্মান ধারার দুই দিক আছে, এক অন্তরের ও দ্বিতীয় বাহিরের, অর্থাৎ এক রাষ্ট্রীয় অপর আন্তর্জাতিক। রাষ্ট্রীয় দিকে প্রধান নীতি ব্যক্তিকে দমন, নির্মম ভাবে দমন—অবশ্য ব্যক্তির নিজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের অজুহাতে। এই নীতির প্রভাব এমন বাড়িয়া চলিয়াছে যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের দল আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না। তাহারা অপেক্ষা করিতেছে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার জন্য, চাকা আবার ঘুরিয়া যাইতে পারে এই আশাতে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আদর্শের সংঘর্ষ আজও চলিতেছে, জয়পরাজয় অনিশ্চিত। একবার মহাযুদ্ধ হইয়া গেল কিন্তু স্রোত ফিরিল না। আবার এক জগৎব্যাপী যুদ্ধ লাগিয়াছে। এ যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্যক্তির অদৃষ্টে কি আছে। তবে মারামারি কাটাকাটি দ্বারা আদর্শের জয়পরাজয় নির্ধারিত হয় না। গতবারে যুদ্ধ জিতিয়া কি কিছু শিক্ষা হইয়াছিল? তাহা হইলে আজ ফরাসীর এ দুর্দশা কেন?

আত্মপ্রবঞ্চনা সাংঘাতিক জিনিস। আমাদের মনে রাখিতেই হইবে যে জার্মানী তাহার আন্তর্জাতিক নীতিগুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া খোলাখুলি সেই নীতির অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু পবিত্র অহমিকাকে অপর জাতিও বড় জিনিস বলিয়াছে। তাহা যদি হয় ত জার্মান দোষ করিল কি? প্রবল ও দুর্বল জাতি, প্রগতিশীল ও পশ্চাৎপদ জাতি, এ ভেদ ত জার্মান ছাড়া অপরেও

করিয়াছে। গায়ের জোরে কি বাণিজ্য-বুদ্ধির জোরে আধিপত্য স্থাপন কি ইতিহাসে আর কেহ করে নাই? প্রবল দুর্বলকে প্রাণেও মারিয়াছে, পেটেও মারিয়াছে। মাঝেমাঝে হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইয়াছে। তবে প্রভেদ কোথায়, বুঝিতে হইবে। প্রথম জার্মানী মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়াছে, সে তাহার নির্মমতার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করে না। দ্বিতীয়ত, যাহা সুদূর আশিয়া আফ্রিকাতে সংঘটিত হইত, জার্মানী তাহা ইউরোপের মাঝে আরম্ভ করিয়াছে। হয়ত ভালই করিয়াছে মুখোশ খুলিয়া। জগৎ দেখুক নগ্ন অসুরের বীভৎস মূর্তি। যুদ্ধ যুদ্ধই. পাদরী সাহেবকে সম্মুখে শিখণ্ডীর মত খাড়া করিলেই কি তাহাকে অন্য কিছু বলা যায়! ভালমন্দের প্রভেদ আজ আমাদের চোখের সামনে জাজ্বল্যমান। ভাল চাও ভাল নাও, মন্দ চাও মন্দ নাও। কিন্তু আর ছেঁদো কথায় মনের ভাব ঢাকিতে চেষ্টা করিও না। কোন ফল হইবে না। জার্মানী সে পথ বন্ধ করিয়াছে। দেবতারা দেখাইয়াছেন যে কর্ম ঠাট্টা তামাসার বস্তু নয়।

জার্মানের সকল গণ্ডগোলের মূলে এই গলদ যে সে তাহার দেহপ্রাণকে আত্মন্ বলিয়া ভুল করিয়াছে। এ টিউটন মানবের প্রাচীন ওডিনপূজার প্রত্যাবর্তন নয়। এ এক নূতন পথ, জড়বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মনের নির্দেশ ও দেহমনের নির্দেশ, চরম সত্য ও ব্যাবহারিক প্রতীয়মান সত্য, ইহাদের মধ্যে গোলযোগের ফল। সমাজের উপর ব্যক্তিগত অহমিকার অধ্যারোপ, জড়বাদের স্কন্ধে সূক্ষ্ম তত্ত্বের আরোহণ। ফল, গোলকধাঁধায় প্রবেশ। এ গোলকধাঁধা হইতে বাহির হওয়ার একমাত্র পন্থা অভেদ উপলব্ধি, সকল অহমিকার বর্জন, মণিগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূত্রের দর্শন। এ পথ যে দেখাইবে সেই মানবের বন্ধু।

ষষ্ঠ

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ

মানবের অগ্রগতির এই যে শোচনীয় পরিণাম আজ দাঁড়াইয়াছে ইহা বুঝিতে হইলে ব্যক্তিবাদের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। কেন না, কি হইতে কি হইয়াছে, মানুষ শিব গড়িতে গিয়া বানর কেন গড়িল, তাহা না বুঝিলে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কিরূপে স্থির হইবে? ব্যক্তিবাদের মূলতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এক একটি পৃথক সত্তা, তাহার পূর্ণ অধিকার আছে আপন ইচ্ছা ও বুদ্ধি অনুসারে আপন জীবন সার্থক করিবার। এই অধিকার মাত্র একটি দিকে সীমবদ্ধ, নহিলে ইহার গতি অপ্রতিহত। সীমা এইখানে যে স্বাতন্ত্র্যকামী জন অপর কোন জনের অধিকারে কোনরূপে হাত দিবে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপরের জীবনকে খর্ব করিতে পাইবে না। এই স্বাতন্ত্র ও এই তাহার গণ্ডী, দুইয়ের সামঞ্জস্য নীতির উপর ব্যক্তিবাদের যুগ তাহার সমবেত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। এই নূতন ধারায় জীবনে মানুষের যেমন পাওনা আছে তেমনই দেনাও আছে, যেমন স্বাধীনতা আছে তেমনই শৃঙ্খলাবন্ধনও আছে, যেমন অধিকার আছে তেমনই কর্তব্যও আছে।

এ ত গেল একটা জাতির আপন ভিতরের কথা। আন্তর্জাতিক জীবনেও অনেকটা একই ব্যাপার ঘটিল। বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ যেমন ব্যক্তিকে মুক্তি দিল, তেমনই জাতি বা রাষ্ট্রকেও মুক্তি দিল। প্রত্যেক জাতি পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবে, কিন্তু সে অপর জাতির স্বাধীনতাকেও মানিয়া লইবে, শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের মর্ম এই যে স্বতন্ত্র জাতি পুরাপুরি তাহার আপন ভাগ্যনিয়ন্তা হইবে, তাহার ইচ্ছা হয় সে সুরাজ্য স্থাপন করিবে, না হয় কুরাজ্য স্থাপন করিবে, কিন্তু স্বরাজ্যে তাহার জন্মগত অধিকার। বাহিরের দরদী তাহাকে অক্ষম নাবালক সাব্যস্ত করিয়া তাহার অধিকার ক্ষুণ্ণ

করিতে পাইবে না। তাহা হইলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতি অবাধে স্বচ্ছন্দে চলিতে পাইবে, কিন্তু অপর ব্যক্তির বা জাতির স্বচ্ছন্দ গমনে সে কোন বাধা দিতে পাইবে না। নীতি হিসাবে এসব খুব ভাল কথা। কিন্তু, কার্যত ইহার প্রয়োগ বড় কঠিন। তাই ব্যক্তির নিয়মনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধান এবং জাতির নিয়মনের জন্য আন্তর্জাতিক বিধান বিহিত হইল।

ব্যক্তিবাদী যুগের এই কল্পনাসমূহ আজও সর্বথা যায় নাই। আজও এত কাণ্ড হওয়ার পরেও আন্তর্জাতিক সংঘের আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের মোহ পুরাপুরি কাটে নাই। কিন্তু সংঘের ডিক্রী জারী হইবে কিরূপে, কে জারী করিবে, তাহা কেহই জানে না। ছোটকে, দুর্বলকে না হয় ধমক দিয়া কাজ করান যায়। কিন্তু বড়কে আঁটিয়া ওঠা কঠিন ব্যাপার। জাপান মাঞ্চুকুয়ো লইল, ইতালী হাবসী-সাম্রাজ্য গ্রাস করিল, স্পেনে দীর্ঘকালব্যাপী আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলিল, পশ্চাৎ হইতে বড় বড় জাতি, কেহ বা এদিকে, কেহ বা ওদিকে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন। সংঘের উপরোধ উপদেশ ধমক বা আদেশ কেহ গ্রাহ্যও করিল না। আন্তর্জাতিক সংঘ ও আন্তর্জাতিক আইন প্রহসন হইয়া দাঁড়াইল। জগৎ বুঝিল যে আবার একটা মহাযুদ্ধ বই গত্যন্তর নাই। যথাকালে যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এবারও উভয়পক্ষ দাবি করিতেছে যে তাহাদের লক্ষ্য মহামানবের উন্নতিসাধন, দুর্বলের স্বাধীনতা সংরক্ষণ। তবে মুখোশ প্রায় খুলিয়া গিয়াছে, আর বড় একটা কাহারও উৎসাহ নাই নিছক পরোপকার চর্চাতে। হয়ত এ যুদ্ধের পরেও আবার অক্ষম পক্ষে পূর্ণস্বাতন্ত্র্যের বদলে mandate-এর ব্যবস্থা হইবে, নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য অছি নিযুক্ত হইবে। কিন্তু জগৎ আর বিশ্বাস করিবে না যে ইংরেজরা ইহুদীর দরদী বন্ধু, বা ফরাসীরা সিরীয় আরবের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ। হাবসী বাদশাহ যখন গুণ্ডার হস্তে নিগৃহীত হইতেছিলেন, তখন কেহ একটা "আহা"-ও বলিল না। কিন্তু মহাযুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে-সঙ্গে ফরাসী

ও ইংরেজের হাবসী-প্রীতি উছল হইয়া উঠিল। মোট কথা, আপন-পর ভেদ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ এসব সমস্যার সমাধান হইবে না। আন্তর্জাতিক সংঘ, আন্তর্জাতিক আইন, এসবই জোড়াতালি মিটমাটের ব্যাপার। গুরুবরের স্পষ্ট নির্দেশ যে, মানুষ যেদিন মনকে অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বে উঠিবে তখনই সে আপন অন্তরস্থ পুরুষ ও সর্বভূতের অন্তরস্থ পুরুষকে এক ও অভিন্ন বলিয়া বুঝিবে, সবাইকে চিনিবে এক অখণ্ড বিরাট পুরুষের প্রকাশ বলিয়া। আজিকার অন্ধ মানুষ হয় ত উপহাস করিয়া বলিবে, "ধান ভানিতে শিবের গীত কেন!" কিন্তু আর বেশি দিন মানুষ অন্ধ থাকিবে না, তাহার দৃষ্টিলাভ নিয়তি-নির্দিষ্ট। দিব্যদীপ্তির অরুণ রাগ দিগন্তে দেখা দিয়াছে।

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ দেখাইতেছেন যে জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন কিরূপে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে ধীরে-ধীরে খর্ব করিল। যুক্তিবাদ ও স্বাধীনতার যে আদর্শ লইয়া ফরাসী জাতি অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে রাজার বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার সহিত সকলেই পরিচিত আছেন। তাহারা চাহিয়াছিল এক কোপে রাজা জমিদার ও ধর্মযাজকদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবে। এই বিপ্লবের ফলে সারা ইউরোপময় স্বাতন্ত্র্যের ও যুক্তি-বুদ্ধির একটা জোর হাওয়া বহিল। ঘাত-প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী, তবে মোটের উপর উনিশ শতকের মানুষ যুক্তিবাদ ও স্বাধীনতার আদর্শেরই অনুসরণ করিতে লাগিল। অথচ বিংশ শতকে দেখা যাইতেছে যে সব উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। যুক্তির স্থানে আসিয়াছে একচ্ছত্রী অতিমানবের আদেশ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থানে আসিয়াছে ব্যক্তির বিলোপ। এই পরিণামের একটা বড় কারণ, গুরুবর বলিতেছেন, জড়বিজ্ঞানের নির্দেশ। জড়বিজ্ঞানের মধ্যে আধুনিকতম বিজ্ঞান জীববিদ্যা। এই বিদ্যার গূঢ়তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল বহু বহুকাল পূর্বে প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন গ্রীসে। কিন্তু পরবর্তী মধ্যযুগের

অন্ধকারে অপর সমস্ত প্রাচীন বিদ্যার সহিত এ বিদ্যাও লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। উনিশ শতকে ডারউইন প্রমুখ পণ্ডিতগণের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে এই বিদ্যার পুনরুজ্জীবন হইল। সভ্য মানবের পক্ষে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও জীবজগতের ক্রমবিকাশ একটা মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া গণিত হইতে লাগিল। মানুষ শুনিয়া অবাক হইল যে সে এবং নগণ্য এককোষ প্রাণী এমিবা জ্ঞাতিকুটুম্ব, তৃণশৈবালাদিও তাহার আত্মীয়। এ সব ত ভাল কথা। কিন্তু আপদ হইল যে একশ্রেণীর পণ্ডিত জীবজগতের বিধিবিধানসমূহকে মানবের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নজরে সমাজ বা রাষ্ট্র হইল organism, সমগ্র দেহতন্ত্র; অতএব ব্যক্তি হইল দেহকোষবৎ, অবচেতন। এই নূতন পরিপ্রেক্ষা লইয়া সে-সকল রাষ্ট্র বা জাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহাদের মূলমন্ত্র স্বভাবতই এই হইল যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন মূল্য নাই। রাষ্ট্রই সব। এইরূপ অপর নানা বিপদও আসিয়া জুটিতে লাগিল, গণ্ডগোল বাধিয়া গেল মানবের জীবনযাত্রাতে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে জড়-বিজ্ঞান মানুষকে দুইটি বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। একদিকে শিখাইয়াছে প্রবল ব্যক্তিবাদ। সে ব্যক্তিবাদ প্রচণ্ড প্রাণময় অহমিকা, তাহাতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নাই। অপর দিকে শিখাইয়াছে নিতান্ত স্বার্থপর সমবেত জীবন, তাহাতে ব্যক্তিগত প্রগতির কোন স্থান নাই, অপর জনসমবায়ের সহিত কোন মৈত্রীসম্বন্ধও নাই। জীবতত্ত্ব চর্চা করিতে গিয়া মানুষ দেখিল যে প্রত্যেক জীব আত্মরক্ষার জন্য, আত্মোন্নতির জন্য, আত্মতুষ্টির জন্য, অবাধে অপরকে পদদলিত করিতেছে, পরিবেশের সহিত অহরহ যুদ্ধ করিতেছে। সে ভাবিল আমি কেন এইরূপ না করিব! সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা ব্যবস্থা করিতে সে প্রবৃত্ত হইল যাহার এই মূল নীতি। পশুজগতে, কীটপতঙ্গের জগতে হয়ত এরূপ ঘটে। তাও সর্বত্র ঘটে কি-না সন্দেহ। ব্যক্তিগতভাবে যদি সর্বত্র ঘটিত, তাহা হইলে

বল্মীক, মধুচক্র ও বীবরগ্রাম গড়িয়া উঠিত না। আচ্ছা, যেখানে আমরা স্বার্থপর হিংসানীতি দেখি, তাহারই বিবেচনা করা যাক। সিংহ হরিণ মারিয়া খায়। কেন? প্রকৃতির নিয়মে, তাহার স্বভাব বলিয়া। অনেক মানুষও জানোয়ার মারিয়া তাহার মাংস খায়, কিন্তু সে ত স্বভাববশে নয়! তাহার বুদ্ধি আছে, চিন্তা আছে, সে একটা ভালমন্দ স্থির করিয়া চলে। আবার অনেক মানুষ আছে, অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা মাংস খায় না। খায় না, খাওয়া উচিত বা প্রয়োজন মনে করে না বলিয়া। তেমনই বংশবৃদ্ধি জীবের একটা স্বভাবগত বৃত্তি। কিন্তু মানুষের মধ্যে বিস্তর সংযমী ব্রহ্মচারী আছেন যাঁহারা বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া এই বৃত্তিকে সংযত করিয়াছেন। অতএব ঘোর গলদ ঘটিল যখন বুদ্ধিজীবী মানব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বুদ্ধিহীন পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের ধারা বরণ করিয়া লইল। সে মনস্থ করিল আমি বলবান হইব, কর্মকুশল হইব, অপরের উপর আধিপত্য করিব। বিচিত্র পন্থা ধরিল যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদ। সেকালে আচারবাদের যুগে এ বালাই ছিল না। মানুষ তখন গতানুগতিকের অনুসরণ করিত। তাহার অধিকার অপেক্ষা তাহার কর্তব্যকেই সে বড় বলিয়া দেখিত, দেখিতে বাধ্য ছিল। বুদ্ধিবাদ তাহাকে প্রেরণা আনিয়া দিল আপন হক্ সাব্যস্ত করিবার। উপরে বলিয়াছি যে, বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইল যে যেমন দেনা আছে তেমনই পাওনাও আছে। কিন্তু জীববিস্তার তাড়নাতে মানুষ নূতন-নূতন রকমের জনসমবায় গঠনে মন দিল। নিট্শেবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি নানা মতবাদ তাহাকে বলিয়া দিল যে ব্যক্তি ব্যক্তিকে অবাধে দাবাইয়া রাখিতে পারে, রাষ্ট্র ব্যক্তির নিপীড়ন করিতে পারে, এক জাতি অপর জাতিকে নিগৃহীত করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে গ্রাসও করিতে পারে। কর্মতৎপরতা হইল নূতন দেবতা, যাহার সম্মুখে সকল ন্যায় অন্যায় বোধকে বলি দিতে হইবে। কর্মে সফলতা হইল সুনীতি, যেন তেন প্রকারেণ কাজ হাসিল করাই যথার্থ ধর্ম।

তার পর জীববিদ্যা হইতে মানব এ তত্ত্বও আহরণ করিল যে জীবজগতের ক্রমোত্তরণ ব্যাপার শ্রেণীগত, ব্যক্তিগত নয়। সে ভুলিয়া গেল যে বুদ্ধি বিকশিত হওয়ার পূর্বে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, বুদ্ধির উন্মেষের পরে ব্যক্তিই হইয়াছে ক্রমবিকাশের চাবিকাঠি। বুদ্ধিজীবী মানব স্বেচ্ছায় বিবর্তনের অনুকূল পন্থাও অবলম্বন করিতে পারে, প্রতিকূলও পারে। পশু তাহা পারিত না। অবশ্য মানুষ প্রকৃতির অভিব্যক্তি রোধ করিতে পারিবে না, তবে সে স্বেচ্ছায় প্রগতি স্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকিতে পারে। তাহার নিয়তি সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষি নির্দেশ করিয়াছেন যে "আত্মঘ্ন জন অন্ধতমসাবৃত অসূর্য লোকে প্রবেশ করে।" মানবের বিবর্তন যে শ্রেণীগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত নয়, এই ভ্রান্ত ধারণা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জার্মান আদর্শের রাষ্ট্র-কল্পনা। যাহার মূল মন্ত্র, রাষ্ট্র ও জাতিই সব, ব্যক্তি কিছুই না।

তাহা হইলে দেখিতেছি যে একদিকে রাষ্ট্রের বা বর্ণের বা সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাসী আসুরিক অহমিকা, অপরদিকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের পূর্বতন আদর্শ, এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। সেই সংঘর্ষেরই একটা রূপ বর্তমান মহাযুদ্ধ। তবে এখনও লুকোচুরি চলিতেছে। মুখে ও কাজে এক হয় নাই। হইবেও না, যতদিন মানুষ ভগবানকে ইহজীবনের সকল কার্যে সকল ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই জাতিগত ঈর্ষা বিদ্বেষের পশ্চাতে দেখা দিয়াছে এক নবীনতর বৃহত্তর আদর্শ যে সমগ্র মানব জাতি অভিন্ন এক, একদিন সারা পৃথিবী জুড়িয়া এক অখণ্ড বিরাট রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে, যাহার মধ্যে আজিকার খণ্ড-খণ্ড রাজ্য ও সাম্রাজ্য সব বিলীন হইয়া যাইবে। বহু ভাবুকের মুখে এই কথা শোনা যাইতেছে। কথাটা খুব বড়, তবে পাঠক একটা কথা কিছুতেই ভুলিবেন না। শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন চান না যে তাঁহার উপলব্ধ ভবিষ্যৎ দেব-মানব সব এক ছাঁচে ঢালাই হইবে, এ পৃথিবীর অপূর্ব বৈচিত্র্য একটা অসুন্দর ধূম্রবরণ মহাকাশে

লয় পাইবে। তাঁহার কল্পিত ভবিষ্য মানব দিব্যজ্ঞানে জাগ্রত হইবে, তাহার অহমিকা দূর হইবে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব যাইবে না। বিচিত্র বর্ণবিন্যাস থাকিবে, নানা গ্রামে নানা সুরে নানা যন্ত্র বাজিবে, কিন্তু অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য কোথাও থাকিবে না। বেখাপ্পা বেসুরো বলিয়া জগতে কিছু রহিবে না। কেন রহিবে না, একটু ভাবিয়া দেখুন। কারণ তখন সকলেই জানিবে যে সংসাররূপ কণ্ঠহারের মণিসমূহ একই সূত্রে গাঁথা। বিদ্যা মানেই সেই সূত্রের উপলব্ধি। বিজ্ঞ হয়ত মাথা নাড়িয়া বলিবেন, এ কোনদিন হইবে না হইতে পারে না। কিন্তু এ পরিণতি না হইলে জগতে মানবের অভ্যুদয়ের কোন অর্থ থাকে না, মানব-সমাজের আদিমতম অবস্থা হইতে এখনকার অবস্থাতে ক্রমোত্তরণেরও কোন অর্থ থাকে না। একে একে ব্যক্তির, পরিবারের, কুলের, গোষ্ঠীর সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া যেরূপে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ একদিন অভেদদর্শী নর রাষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া জগতে অখণ্ড মানব-সমাজ গড়িয়া তুলিবেই। এ অলীক স্বপ্ন নয়। তবে, মানবের দেবতাকে বাদ দিয়া মানবমহামণ্ডল গড়িয়া উঠিবে না, ইহাও নিশ্চিত।

বর্তমানে যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি তাহা বুঝিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটা বহির্দৃষ্টির ও অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। বহির্দৃষ্টির কাজ বাহির হইতে দেখা, বাহিরে দাঁড়াইয়া জগদ্ব্যাপারকে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ, যেমন বাহির হইতে মানুষ একটা যন্ত্রের কাজ নিরীক্ষণ করে। যখন মন ইন্দ্রিয় সাহায্যে যন্ত্রের সমস্ত ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিল, বুদ্ধি তাহার বিধান আবিষ্কার করিল, তখন মানুষ তাহার উপর নিজের সংকল্প প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টি আপন-আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে জনসমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে প্রত্যেক রাষ্ট্র হইল আপনাতে আপনই পূর্ণ এক একটি সত্তা। সে আপন জীবন সার্থক করিবার জন্য ব্যক্তি ও জনসমাজকে আজ্ঞাকারী ভৃত্যে

পরিণত করিবে। ব্যক্তিকে বা জনসমাজকে শিক্ষা-দীক্ষা অন্নবস্ত্র যাহা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিবে তাহা দিবে, কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থের, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য। আমাদের বাঙ্গালাতে একটা কথা আছে, মুসলমানের মুরগী পোষা। মালিক কত যত্নই না করে মুরগীকে, কিন্তু সবটাই নিজে ডিম মাংস খাইবে বলিয়া। মুরগীর যে আপন একটা প্রাণ আছে, চেতনা আছে, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। আধুনিক নমুনার রাজ্যেও সেইরূপ ব্যক্তির ইচ্ছার দিকে নজর করিবার দরকার নাই, তাহাকে আত্মোন্নতির সুযোগ দেওয়ারও দরকার নাই, সে বাঙ্গালী মুসলমানের মুরগীর মত বহাল তবিয়তে থাকিয়া গৃহস্থের পুষ্টিসাধন করিলেই হইল। রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য যাহা কিছু করিবে, তাহা এই জন্য যে তাহাকে রাষ্ট্রের কাজের জন্য গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। কেন না সে রাষ্ট্র-দেহের অবচেতন উপাদান মাত্র। যে-বিধানের দ্বারা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহার অবস্থান ব্যক্তিসত্তার বাহিরে। সে-বিধান যদি ধীমান শক্তিমান ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা আবিষ্কৃত বা নির্ধারিত হয়, তাহা হইলেও একথা সত্য। বহিরঙ্গের এই স্বরূপ।

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়ের আরম্ভ একই স্থান হইতে, উভয়েরই লক্ষ্য ব্যষ্টির ও সমষ্টির সামঞ্জস্য সাধন, তাহাদের দেহ-প্রাণ-মনের রহস্য উদ্ঘাটন। কিন্তু ইহাদের নজর বিভিন্ন, ধারা বিভিন্ন। বহিরঙ্গের কথা ত উপরে বলিলাম। তাহাদের দৃষ্টি কতটা বাহ্য, তাহা বোঝা গেল। অন্তরঙ্গ কিন্তু সব জিনিসটাকে দেখে নিত্য-বিকাশোন্মুখ আত্মচৈতন্যের দিক হইতে। এখানে জীবনবিধানের অবস্থান আপন অন্তরেই, বাহিরে নয়। আমাদেরই ভিতরের সত্তা কাজ করে আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-প্রসারের দ্বারা। যুক্তিবুদ্ধি আছে, সংকল্পও আছে, কিন্তু তাহারা আত্মনের নির্দেশ মত কাজ করে। যুক্তি আনে আত্ম-প্রত্যয়, সংকল্প আনে আত্ম-প্রভাব। তবে যুক্তিবুদ্ধিই অন্তরঙ্গের একমাত্র শক্তি নয়। নানাপ্রকারের জ্ঞান ও শক্তির আবাহন সে করে। বুদ্ধিকে ত

প্রথম-প্রথম সে উড়াইয়াই দেয়, প্রাণশক্তির উপরই অধিক জোর দেয়। তারপর সে ক্রমশ জাগাইয়া তোলে উচ্চতর বুদ্ধি ও সূক্ষ্মতর বোধিকে, এবং জগৎকে দেখিতে পায় ঢের বেশি ব্যাপক ও সমঞ্জস ভাবে। বস্তুর শুধু বাহিরের যান্ত্রিক রূপ না দেখিয়া দেখিতে শিখে তাহার অন্তর্নিহিত মূল সত্য। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, অন্তর্দৃষ্টির লক্ষ্য আত্মার উপলব্ধি, আত্মাতে বাস, আত্মার সত্যকে ভিতরে বাহিরে সার্থক করা।

কিন্তু কই, subjectivism ত মানবজীবনের সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না! কেন সে পারিল না তাহা ভাবিবার বিষয়। এই যে Self, আত্মন্, ইহার সত্য স্বরূপ কি, ইহার অবস্থান কোথায়? সেই একই গোলযোগ বাধিল, যাহা বহিঃরঙ্গের বেলায় বাধিয়াছিল। ব্যষ্টিগত আত্মন্ না সমষ্টিগত আত্মন্, কাহার পূর্ণ পরিণতি মানব জীবনের লক্ষ্য? অন্তর্মুখী ব্যক্তিবাদের আজ জগতে স্থান নাই। কেন না আজ ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে ব্যক্তি স্বভাবতই অপূর্ণ, তাহার পূর্ণতা রহিয়াছে আপন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। খুব নির্মমভাবে এই কথাটা বলা যায় মানুষকে—ব্যক্তিরূপে তোমার বাঁচিবার অধিকার নাই, কোনরূপ পূর্ণ অভিব্যক্তি তোমার তোমাতে প্রাপ্য নয়, সমষ্টির সহিত তোমার যে সম্বন্ধ তাহার দ্বারাই নির্ণীত হইবে তোমার চিন্তা ও কর্মের ধারা; সমষ্টিগত চৈতন্য, তাহার আপন অভিব্যক্তির জন্য, তোমার সকল স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়া তোমাকে রাষ্ট্ররূপ যন্ত্রের পেরেক-কবজাতে পরিণত করিবে; অন্তর্দৃষ্টির সহিত এই নির্দেশের কোন অসঙ্গতি নাই।

তবে, মানব সংস্কৃতির চরম নিয়তি কি এই? গুরুবর আশ্বাস দিতেছেন, তাহা কেন, আমরা আত্মন্‌কে যদি ব্যাপকভাবে দেখি, যদি উপলব্ধি করি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যে ব্যষ্টি, সমষ্টি, সমগ্র বিশ্ব একই, অখণ্ড সৎ-এর প্রকাশ, সর্বত্রই তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপে বিদ্যমান, তাহা হইলে আর কোন সমস্যা থাকে না।

এই উপলব্ধির দীপ্তিতে আমরা ব্যষ্টি-সমষ্টিকে তাহাদের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পাইব, বুঝিতে পারিব যে উভয়ের সমানভাবে, সঙ্গতভাবে অগ্রগমনই প্রকৃতির নিয়তি-নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি। এই যে অগ্রগতি, ইহার ফলে ব্যষ্টি সমষ্টিকে সার্থক করিবে; সমষ্টি ব্যষ্টিকে সার্থক করিবে। এক অখণ্ড বিরাট পুরুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত রূপ একসঙ্গে সমানে সঙ্গত ও স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিলে দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিবে না, ভেদও থাকিবে না। এক পূর্ণতর বৃহত্তর একত্বে তাহারা মিলিত হইবে।

আবার এদিকে অন্তর্দৃষ্টির আত্ম-সন্ধান, বহির্দৃষ্টির মতই দেহ বা প্রাণ বা মনের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতে পারে—দেহ বা প্রাণ বা মনের স্থূলতর পন্থা ধরিয়া আত্মোন্নতির প্রয়াস করিতে পারে। অয়নের পথে এ একটা অন্তরায়, সন্দেহ নাই। তবে অন্তর্মুখী জড়বাদ ব্যাবহারিক ও বাহ্যমুখী হইয়া বেশিদিন টিকিতে পারে না, কেন-না তাহার স্বাভাবিক প্রসার অন্তরের দিকে। তথাপি একটা পরিণাম ইহার থাকিয়া যায়, যাহাকে ঠিক বাঞ্ছনীয় বলা যায় না। মানুষ নিজেকে প্রধানত প্রাণময় জীব বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করে। সে প্রাণশক্তিতে এমন মশগুল হইয়া যায় যে দেহ ও মন উভয়কেই আজ্ঞাকারী ভৃত্য বই কিছু মনে করে না। আজিকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই অবস্থাই বিশেষ করিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্তরকে অতিক্রম করিলে তবে মানুষ পৌঁছায় আর এক অবস্থাতে যেখানে সে নীতি, ধর্ম, বুদ্ধি, বোধি, সুন্দরের উপলব্ধি, ভাবের আবেশ, ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া তাহার জীবন সার্থক করিতে প্রবৃত্ত হয়। সঙ্গে-সঙ্গে mysticism, occultism ইত্যাদি সূক্ষ্ম অতিপ্রাকৃত অতিভৌতিক ব্যাপারের সাথেও তাহার পরিচয় ঘটে। এখান দিয়াও তাহার প্রগতির পথ খোলা, যথার্থ আত্মনের উপলব্ধি সম্ভবপর। এই উপলব্ধি যখন আসিবে তখন দেহ-প্রাণ-মন তিনই হইয়া দাঁড়াইবে সেই আত্মনের যন্ত্রস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধ অসঙ্গতি দাবি-দাওয়া

জোর-জবরদস্তি আর কিছুই থাকিবে না। দেহ, প্রাণ, মন, তিন তত্ত্বই তখন হইয়া যাইবে আমাদের জীবনের ধ্রুব লক্ষ্যের সুসমঞ্জস সাধনত্রয়। ধ্রুব লক্ষ্যের অর্থ নয় শুধু দেহ-প্রাণ-মনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি। ইহারা হইবে অন্তঃপুরুষের, আমাদের সকলের মধ্যে অনুস্যূত বিরাট পুরুষের, আত্মপ্রকাশের ভিত্তি। একবার পুরুষ প্রকট হইলে তাহার ফলে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মানব-জীবন, ভিতরে বাহিরে, চিন্তায় তথা কার্যে, রূপান্তরিত হইবে। এক বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরম আনন্দ, পরম শক্তি ও পরম জ্যোতিতে সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

সপ্তম

মানব সমাজের যথার্থ লক্ষ্য

মানবজীবনের যথার্থ বিধান ও জনসমবায়ের পূর্ণ লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শুধু মানুষের দেহের ও প্রাণের ক্রমবিকাশ বুঝিলে চলিবে না, বুঝিতে হইবে প্রকৃতির বিবর্তনে মানুষের স্থান কোথায় এবং তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক নিয়তি কি। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কখনও মানবের মন অন্তর্মুখী, কখনও বা বহির্মুখী। অন্তর্মুখী যুগেই মানব নূতন-নূতন ভাবের প্রবর্তন করে, নিত্য অভিনব দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিয়া নব-নব তত্ত্বের উদ্ভাবন করে। বহির্মুখী যুগে সে তাহার পূর্ণ স্বরূপ, তাহার যথার্থ নিয়তি, তাহার জীবনবিধান, বুঝিতে পারে আংশিকভাবে মাত্র। যেটুকু বোঝে সেইটুকুকে বাহ্য রূপ দেয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী জীবনটাকে গড়িয়া তোলে। আবার যখন সে ভিতরে ডুব দেয়, তখন হৃদয়ঙ্গম করে আপন অসীম বীর্য ও সামর্থ্য, উপলব্ধি করে আপন বিরাট ভবিষ্যৎ, একটা অভিনব জীবনধারার পথ খুলিয়া যায় তাহার সম্মুখে।

সৎ মানেই একটা অসীম অনন্ত অনির্দেশ্য সত্য। কিন্তু ইহলোকে তাহার ভিত্তি, তাহার আরম্ভ জড়পিণ্ড। আকাশের অগণন গ্রহতারা, তাহারই একটি আমাদের মেদিনী, সেই মেদিনীর বক্ষে অসংখ্য জড়বস্তু, অগণ্য জীবের জড়দেহ। এই ত সৃষ্টির বনিয়াদ! এই সমস্ত বাস্তব দেহরূপ খোলসের মধ্যে প্রত্যেক জীবের জীবনবিধান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য অদ্ভুত। কিন্তু তাহার মূলে অখণ্ড একত্ব। একই ছকের উপর একই নিয়মানুসারে সমগ্র জীবনবিধান বিহিত। তথাপি প্রত্যেক শ্রেণীর আপন বিশেষত্ব আছে এবং এই বিশেষত্বই জগৎকে নানা বর্ণের, নানা

আকৃতির, নানা গন্ধের, নানা রসের এমন অপূর্ব সমন্বয় করিয়া তুলিয়াছে। নানা বিচিত্র উজ্জ্বল রঙের সূত্র দিয়া বিশ্বকর্মা এই আশ্চর্য সুন্দর কিংখাবের চাদর বুনিয়াছেন। নিশ্চেতন জড়পদার্থে বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ। শ্রেণীবৈচিত্র্য আছে, কিন্তু শ্রেণীমধ্যস্থ বস্তুর প্রকারভেদ খুব কম। জল, স্বর্ণ, অঙ্গার, ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু একসের জল বা স্বর্ণ বা অঙ্গার বলিলেই প্রত্যেকটির স্বরূপ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া গেল। জগতের আদিম অবস্থা এই ছিল। কিন্তু প্রাণশক্তির বিকাশের সঙ্গেসঙ্গেই ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া গেল। প্রত্যেক মূষিক বা মার্জার বা অশ্ব অপর সমস্ত মূষিক বা মার্জার বা অশ্বের ঠিক অনুরূপ নয়। ব্যক্তিত্ব ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। যখন প্রাণীর মধ্যে মনোবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, তখন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আরও বাড়িয়া চলিল। সচেতন মন ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই অপূর্ব বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। এইরূপে মানুষ মানুষ থাকিয়াও আপন ব্যক্তিগত বিধান অনুসারে আপন পথে লক্ষ্যের পানে ধাবিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

এই যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ইহাই মানবের মানবত্ব। নিম্নস্তর প্রাণীর সহিত নরের পার্থক্য এইখানেই। তাহার মানসিক চেতনা মুক্তি পাইয়াছে, তাহার সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হইয়াছে, সে মনে করিলে আপন সংকীর্ণ ও সসীম সত্তাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে। অবশ্য, তাহার জড়দেহ, তাহার আধ-আলো আধ-আঁধারে অভ্যস্ত মন, তাহাকে টানিয়া নীচে নামাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহার প্রকৃষ্ট চেতনা, তাহার শুদ্ধ বুদ্ধি, তাহার উচ্চ সংকল্প, তাহাকে ঊর্ধ্বগামী করিবে। মানবের বিজয়যাত্রা নিয়তি-নির্দিষ্ট, যদিচ এখনও সে নিজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আজও সে তাহার আবেষ্টনের সহিত যুদ্ধে রত, তাহার মন যে সেইদিকেই পড়িয়া থাকে! আপন বুদ্ধিবলে মানুষ পরিবেশের উপর নানারূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে

বটে, কিন্তু এখানে সে থামিবে না। সে পরম সত্যকে উপলব্ধি করিবেই, পরা চেতনাতে উঠিবেই। যেখান হইতে তাহার অবতরণ, সেইখান অবধি তাহার দৌড় ; কিন্তু সেখানে পৌছিতে হইলে আপন জ্যোতির্ময় অতিমানসকে আবাহন করিতে হইবে এবং তাহার আলোকে দেখিতে হইবে সেই বিরাট পুরুষকে যিনি বিশ্বে সর্বত্র অনুস্যূত, বিশ্ব যাঁহার বীর্যের প্রকাশ বই কিছু নয়। শুধু দর্শন নয়, সেই অদ্বিতীয় অখণ্ডের সহিত এক হইতে হইবে। শক্তি, চেতনা, সংকল্প ও জ্ঞানে অভিন্ন হইতে হইবে। তখন নরজীবন ব্রহ্মে সার্থক হইবে, ব্রহ্ম নরজীবনে সার্থক হইবেন। সেদিন মানুষ শুধু যে আপনাকে খুঁজিয়া পাইবে তাহা নহে, আপনাকেও পাইবে, বিশ্বকেও পাইবে। এই তাহার নিয়তি, এই তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের তাৎপর্য।

এই ক্রমোত্তরণ ঘটিবে প্রধানত ব্যক্তির মধ্য দিয়া। কারণ, এক-একটি ব্যক্তি এক একটি জীবাত্মা, অদ্বিতীয় পরমাত্মনের এক-একটি বিভিন্ন আধারে প্রকাশ। প্রতি ভূতে এবং সর্বভূতে তাঁহার প্রকাশ। প্রতি এবং সর্ব কথা দুইটি লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের মধ্যেই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। মানুষ সাহায্য বিনা শুধু তাহার মানসিক শক্তি দ্বারা এ উপলব্ধি আনিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। তবে সাহায্য সে পাইবে একদিকে তাহার প্রচেতন সত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত দিব্যজ্ঞান হইতে, অপরদিকে তাহার পার্থিব আবেষ্টন হইতে, প্রকৃতি ও জনসমাজের মধ্যে অধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম দিব্য শক্তি হইতে। ব্যষ্টি-সমষ্টির পরস্পর সম্বন্ধের রহস্যই এই। জগতের প্রত্যেকটি জীব মানুষের সহায় হইবে তাহার পরম সত্যের উপলব্ধিতে। হয়ত সে এই সাহায্যের অপব্যবহার করিতে যাইবে। কিন্তু সবের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছে যে দিব্যসংকল্প, তাহা সমস্ত ভুলচুক সংশোধন করিয়া লইবে। এই যে অপরের সাহায্যের কথা বলিলাম, ইহা মৈত্রী রূপেও আসিতে পারে, বিরোধ রূপেও আসিতে পারে। ফল একই

দাঁড়ায়, দুটিই ব্যক্তির ক্রমবিকাশের অনুকূল শক্তি। সব চেয়ে বড় কথা এই যে ব্যক্তি শুধু তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য নিয়তির নির্দেশকে অনুসরণ করে না, করে তাহার সমগ্র জাতির জন্য। একক মুক্তি তাহার লক্ষ্য নয়, সমগ্র প্রকৃতির উত্তরণ তাহার কাম্য। তাই তাহাকে সত্যকার প্রেরণা জোগায় বিরাট বিশ্বসংকল্প, তাহার একার ক্ষুদ্র সংকল্প নয়।

সেইজন্য, মানুষ যখন আপন যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব ও নিয়তিকে জানিবে, বুঝিবে, তখন তাহার সমবেত লক্ষ্য হইবে এমন আবেষ্টনের সৃষ্টি যেখানে ব্যক্তি শ্রেণী সম্প্রদায় জাতিনির্বিশেষে সমগ্র মানব-মহাজাতি দিব্য পূর্ণতার দিকে ধীর অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে। আর, মানুষ যেমন-যেমন দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিবে, তেমন-তেমন তাহার জীবনে প্রকট হইতে থাকিবে আত্মনের জ্যোতি শক্তি সৌন্দর্য সুসঙ্গতি ও পরমানন্দ। এই দিব্যরূপ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারের হইবে, কিন্তু সাধারণ নরজীবন সমানে চলিতে থাকিবে মুক্তি ও পূর্ণতার দিকে। ব্যষ্টির মুক্তি, সমষ্টির সুসঙ্গতি। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, জাতিতে-জাতিতে, বিরোধ অসঙ্গতি থাকিবে না, প্রত্যেকেই অব্যাহত স্বাতন্ত্র্য লইয়া মহামানবের জীবনকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর সার্থকতার পানে লইয়া যাইবে। এই চেষ্টাই মানুষ তাহার অর্দ্ধপরিস্ফুট দৃষ্টি লইয়া চিরদিন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান ও আত্মকর্তৃত্বের অভাবে সে সফলকাম হয় নাই। আমরা আমাদের অধিগম্য স্থানের যতই নিকটবর্তী হইতে থাকিব, ততই আমাদের গতি লাবলীল ও স্বচ্ছন্দ হইবে। অন্তরে অবস্থিত পুরুষ জ্ঞান ও জ্যোতির সহিত সংকল্পের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া আমাদের জীবন পূর্ণতর করিয়া তুলিবেন।

মানুষ ত বিরাট পুরুষেরই পৃথিবীতে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাহিরের পার্থক্য যতই থাকুন না কেন, সকল মানুষ অন্তরে, স্বরূপে, দেহে, প্রাণে, মনে একই সত্তা। একই নিয়তির বশে

বিশ্বমানব যুগযুগান্ত ধরিয়া একই পথে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার গতি কখনও মনে হইয়াছে সম্মুখের পানে, কখনও পিছনের পানে, কিন্তু বস্তুত সে স্থির ধীর ভাবে সারাক্ষণ তাহার চরম লক্ষ্যের পথ ধরিয়া আগুয়ান হইয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, ব্যষ্টি ও সমষ্টির অদৃষ্টে কত জয়-পরাজয় ঘটিয়াছে, কত মানুষ, কত জাতি কীর্তি অর্জন করিয়াছে, কত প্রকারে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, দাবাইয়াছে, শাসাইয়াছে, কিন্তু সবই অর্থহীন। শুধু সেইটুকুরই অর্থ আছে যেটুকু মানবজাতির ক্রমবিকাশের পথ সুগম করিয়াছে। তাই শাস্ত্রমতে লোক-সংগ্রহই মানুষের কর্মের যথার্থ প্রেরণা।

সমগ্র নরজাতির ক্রমোত্তরণই যে আসল কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমষ্টির ক্রমোত্তরণে ব্যষ্টির স্থান কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। ব্যক্তি কি সমাজরূপ যন্ত্রের প্রাণহীন পেরেক-কবজা, সমাজরূপ দেহের অবচেতন জীবকোষ মাত্র? গুরুবর বলিতেছেন, কখনই না, ভুলিলে চলিবে না যে প্রত্যেক ব্যক্তি বিরাট পুরুষের আধার, বিশ্বের সমস্ত সামর্থ্য তাহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত, দিব্যজ্যোতির দর্শন ঘটিলেই সে বলিয়া উঠিবে, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহং। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন স্বভাব অনুযায়ী পন্থা ধরিয়া আপন জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই না পরম সত্যের কল্যাণতম রূপের সন্দর্শন তাহার মিলিবে। তবেই না সে আপনার মধ্যে ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে এক সাথে দেখিবে। এই যে ব্যক্তির আপন স্বরূপ ও স্বভাব, ইহা তাহাকে আপনই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, অন্তরের কেন্দ্র হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে হইবে। রাষ্ট্র ও সমাজ, রাজা ও সমাজপতি, শাস্ত্র ও শাস্ত্রী, ধর্ম ও ধর্মোপদেশক, তাহাকে কখনও সাহায্য করিবে, কখনও বা তাহাকে বাধা দিবে। তাহার আত্মোপলব্ধি তাহার আপন হাতে, সে নির্ভয়ে আপন পথে আগুয়ান হইবে।

তাহার জীবনধারা, তাহার অভিব্যক্তি জগতের জন্য, ইহা সত্য কথা। কিন্তু সে নিজে নিজেকে খুঁজিয়া না বাহির করিতে পারিলে জগৎকে সে কি দিবে ? আপন অন্তঃপুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটিলে তবে না সে মুক্ত উদার দৃষ্টি লইয়া বিশ্বের পানে চাহিবে। ক্রমোত্তরণের পথে মানুষ নানা আদর্শের সংস্পর্শে আসে, নানারূপ সংঘটন শৃঙ্খলার অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে-সমস্ত সে প্রয়োজনমত নিশ্চয়ই কাজে লাগাইবে, কিন্তু কাজ হইয়া গেলেই ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে, নিরর্থক বোঝা ঘাড়ে করিয়া দুরূহ পথ চলিতে প্রবৃত্ত হইবে না। সেইরূপ ভূত ও বর্তমান মানবের ভাবধারা, তাহাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতেও মানুষকে প্রেরণা সংগ্রহ করিতে হইবে। কেন না, দৃষ্টির সংকীর্ণতা একান্ত বর্জনীয়। তবে এই যে অপরের চিন্তা বা ভাব বা অভিজ্ঞতা, ইহাকে তাহার আপন সত্তার মধ্যে খাপ খাওয়াইতে হইবে, নহিলে আবার তাহার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতিধারা ব্যাহত হইবে। ব্যক্তি যে স্বাতন্ত্র্য চায়, সেটা তাহার অহমিকার বিদ্রোহ নয়, বরং তাহার অন্তঃ-পুরুষের আত্মপ্রকাশ।

ব্যক্তিগত মানব ও মানব-মহাজাতির সম্বন্ধের আলোচনা ত কতকটা করা হইল। কিন্তু শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদি জনসমবায়ের স্থান কোথায় ? ইহাদের সহিত ব্যষ্টির বা সমষ্টির সম্বন্ধ কি ? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, শ্রেণী বা জাতিকে ব্যষ্টি ও মহতী সমষ্টির মাঝে মধ্যস্থ বলা যায়। মধ্যস্থ কথাটাই একটা বিরোধের সূচনা করে। ব্যক্তি ও মহাজাতির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও আপাত-বিরোধ রহিয়াছে, তাহার সমাধানই এই মধ্যস্থের অবশ্য-করণীয়। জাতি ব্যক্তিরও সহায় মহামানবেরও সহায়, তাহাদের উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি সাধন করে। গুরুবরের কথায়, পরস্পরকে সার্থক করার কাজে সহায়তা করে। ব্যক্তি যে জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই। ব্যষ্টিগত মানুষ আদর্শে, ভাবধারায়, কার্যধারায়,

জীবনযাত্রায়, যে-জনসমবায়ের সহিত মিলিত, তাহাকে সেই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়ই বলা যায়। এইরূপেই কার্যত সমাজ-সম্প্রদায়াদি গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান কালে সর্বপ্রধান জনসমবায়, Nation বা রাষ্ট্রগত জাতি। একরাষ্ট্রীয়তাকেই আজ যথার্থ অচ্ছেদ্য মিলনসূত্র মনে করা হয়। ব্যক্তি তাহার ভাবনা ও কার্য দ্বারা এই রাষ্ট্রকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে এবং বিশ্বাস করে যে ইহার মধ্য দিয়াই বিশ্বমানবের জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু এইটাই এবিষয়ে শেষ কথা নয়। মানুষের সম্প্রদায়, জাতি বা রাষ্ট্র নির্দেশ করিলেই তাহার স্বরূপ সম্যক বর্ণিত হইল না। স্বভাব-মুক্ত মানবকে সমবায়-বন্ধন কখনই পুরাপুরি বাঁধিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে হিন্দু বা খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, কৃষক বা তন্তুবায়, জাপানী বা জার্মান বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহার স্বরূপের পূর্ণ নির্দেশ হইল না। কেন না ব্যক্তি এই সমবায়ের যে কোনটার অন্তর্গত হইলেও সে বিশ্বমানবের এক জন। শুধু তাই নয়, তাহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দিব্য জ্যোতিষ্মান বিশ্বাতীত সত্তা। তবে একথাও সত্য, সে নিজেই নিজেকে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিতে চায় এবং ইচ্ছা করিয়া রাখে। রাখে বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃপুরুষও বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইতে সদা চেষ্টিত। এই তাহার মানবত্বের গূঢ় অর্থ, এইখানেই পশুর সহিত তাহার প্রভেদ।

তথাপি বিশ্বমানব এত বড় বিশাল জনসমবায়, যে তাহার. সহিত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্থাপন সহজসাধ্য নয়। তাই ক্ষুদ্রতর সমষ্টিগুলির আজও জগতে প্রতিপত্তি ও সার্থকতা। কিন্তু বিপদ এই যে ইহাদের সংকীর্ণ স্বার্থ, অহমিকা ও বিরোধ মানবের উন্নতির পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্যত সমাজ বা শ্রেণীর বা রাষ্ট্রের যে উপযোগিতা নাই, তাহা নহে। সমাজ থাকিলে ত ক্ষতি ছিল না, যদি সমাজগত অহমিকা না থাকিত! যদি ইহারা প্রত্যেকে বুঝিত যে আমিও যেমন স্বতন্ত্র, অপরেও তেমনই স্বতন্ত্র, তাহা হইলে বিরোধ

আসিতে পারিত না। বরং বিভিন্ন সমাজ বা জাতিগুলি সমঞ্জসভাবে মানবের অভিব্যক্তির সহায়তা করিত। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এ বিষয়ে একরকম বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, আদালত পুলিশ ও পল্টন ব্যক্তিকে কতকটা রক্ষা করে। কিন্তু রাষ্ট্র বা জাতি আজও স্বাধীনতার গণ্ডী মানিতে চাহে না। স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার। প্রাচীনকালে যে দেবতার নামে নিয়মন ছিল, অর্থাৎ রাজগুরু বা পোপ বা উলেমার বিধিনিষেধ ছিল, তাহা আর নাই। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যেটুকু হইয়াছে, তাহা বালির বাঁধ। মানবের অভিব্যক্তিতে ছোট-ছোট জাতি বা রাষ্ট্রগুলি লোপ পাইবার প্রয়োজন নাই, বরং ইহারা থাকিলে মানব জীবনের বৈচিত্র্য বজায় থাকিবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে সব সমবায়ই কাজে লাগিবে, তবে এটা দেখিতে হইবে যে ইহারা কিছুতেই ব্যক্তির ক্রমোত্তরণের কাজ ব্যাহত না করে। সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রীয় জীবনই চরম কাম্য এবং সেই কাম্য লাভের জন্য ব্যক্তিকে ও বিশ্বমানবকে পথ হইতে সরাইয়া দিতে হইবে, এই বিপরীত ও অসম্ভব দাবিকে চিরদিনের জন্য নাকচ করিয়া দিতে হইবে, নহিলে অভিব্যক্তির দ্বার রুদ্ধ। এই দাবি যুক্তির বিকৃতি বই কিছু নয়।

মূল সত্য কি, তাহা আমরা জানি। ব্যক্তি বা জাতি বা বিশ্বমানব সবই এক পরম পুরুষের, একই শুদ্ধ সত্যের আত্মপ্রকাশ। ইহাদের মধ্যে কোন যথার্থ অসঙ্গতি নাই, থাকিতে পারে না। প্রকৃতির ক্রমোত্তরণের পথে তিনেরই কাজ আছে, তিনেরই স্থান আছে। রাষ্ট্র-জীবন মানে এক দেশ-বাসী, একই লক্ষ্যের সন্ধানী, বহু জনের সম্মিলিত জীবন। তাহার আপন বৈশিষ্ট্য আছে, আপন চিন্তাধারা ও কর্মধারা আছে, আপন জীবন-বিধান আছে। সেই বিধান অনুযায়ী সে আপনার মানুষকে পূর্ণতার পানে লইয়া যাইবে। তবে আন্তর্জাতিক সঙ্গতি এবং মৈত্রীও অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কেন না সকল জাতি বস্তুত একই ব্রতে ব্রতী। সে ব্রত মহামানবের অভিব্যক্তি।

জাতিতে-জাতিতে আড়াআড়ি ঝগড়াঝাটির কোন স্থান নাই মানবের এই চরম নিয়তিতে। তেমনই আবার, প্রত্যেক জাতির পূর্ণ অধিকার আছে অপর জাতির জুলুম জবরদস্তির হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার। এই অধিকার তাহাকে বজায় রাখিতেই হইবে—নিজের জন্ম ততটা নয়, যতটা সমগ্র মানবের জন্ম। যদি সে জড়তা বা ক্লৈব্যবশে আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে দেয়, ত সে সবার ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, মানবের চরম নিয়তি পূর্ণ হওয়ার দিন বিলম্বিত হইল।

ব্যক্তির ও জাতির, উভয়েরই অধিকার আছে এই বলিবার যে আমি যাহা তাহাই থাকিব। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে ব্যক্তি বা জাতি আপন সংকীর্ণ মতবাদ, আপন কুসংস্কার, আপন অপূর্ণতার পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া চিরদিন জগতে একাকী চলিবে, কাহারও সহিত লেন-দেন রাখিবে না। ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সহিত আদান-প্রদানের দ্বারা আপন জীবনধারা সমৃদ্ধ করে, জাতিও সেইরূপই করিবে। তবে অপরের নিকট হইতে লব্ধ বস্তুকে আপনার করিয়া লইতে না পারিলে তাহা হইতে কোন স্থায়ী লাভ হয় না। এ সব ব্যাপারে কিন্তু জোর-জবরদস্তির ফল শোচনীয় হইয়া থাকে। যাহা লইবে তাহা স্বেচ্ছায় লইবে, তাহাকে আপন জীবনধারার শামিল করিয়া লইবে, তবেই তাহা জীবন্ত থাকিবে। মোট কথা, জাতির বা রাষ্ট্রের উন্নতি স্বেচ্ছাধীন ও অন্তরের প্রেরণাগামী হওয়া চাই, হইলেই তাহা বিশ্বমানবের অভিব্যক্তির সহায়ক হইবে, নচেৎ হওয়া কঠিন। অতএব সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস ভিতর হইতে পরিণতি—ব্যক্তিরও, জাতিরও, বিশ্বমানবেরও। এই তিন সত্তার ক্রমবিকাশ সুসঙ্গত সমঞ্জস ভাবে হইতে থাকিবে, একে অপরকে খর্ব করিবে না। প্রথম, ব্যক্তিগত উন্নতির লক্ষণ দেখা যাক। স্বেচ্ছায় অন্তরের প্রেরণাতে ক্রমপরিণতি, অপর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি, জনসমাজের জীবনধারার সহিত সুসঙ্গতি, বিশ্বমানবের

অভিব্যক্তির সহিত তাল রাখিয়া চলা, এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিকাশের বিধান। দ্বিতীয়, জাতির বা জনসমাজের প্রগতির বিধান। এখানেও মূল নীতি অন্তরের প্রেরণা এবং অপর জাতির স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, তথা ব্যক্তির ও বিশ্বমানবের ক্রমোত্তরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষণ। তৃতীয়, বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশ। ইহার মন্ত্র ব্যক্তিগত ও সমাজগত ক্রমপরিণতির পূর্ণ সহায়তা লইয়া স্থির ধীরভাবে ঊর্ধ্বগমন। ইহার লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি এবং মানবের অন্তরে দিব্যশক্তির জাগরণ। একদিন সকল মানব অভেদ উপলব্ধি করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেদিনও বিশ্বমানব ব্যক্তি ও জাতিকে খর্ব করিবে না। এই যে বিধান, ইহা স্বভাবত অপূর্ণ মানবের পক্ষে দুর্লভ। হয়ত বহুদিন মানুষ এখানে পৌঁছিবে না। এ পর্যন্ত সে যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা নানা বিপর্যয়, নানা জুলুম জবরদস্তি, নানা অসন্তোষ বিদ্রোহের মধ্য দিয়া। জ্ঞানের উদারতা, মনের নমনীয়তা, স্বভাবের শুদ্ধতার অভাবে মানুষ স্বাতন্ত্র্য ও সুসঙ্গতির পথ ধরিতে পারে নাই, জবরদস্তি, বিরোধ ও গোঁজামিলের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছে।

তথাপি আজ জগতে জাতিসমূহ পরস্পরকে জানিতে চিনিতে শিখিতেছে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়া যাইতেছে, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতেছে। সুদূর ভবিষ্যতে একটা একত্বের কল্পনা অস্পষ্টভাবেও কাহারও-কাহারও মনে জাগিয়াছে। আকাশ এখনও তমসাচ্ছন্ন, কিন্তু পূর্বদিকে যেন একটু আলোর আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মানুষ তাহার দৃষ্টি যদি অন্তরের দিকে ফিরায়, যদি সে অন্তরের গভীরে ডুব দেয়, ত চরম সত্য তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইবেই। তখন আত্মোপলব্ধির দ্বার তাহার সম্মুখে খুলিয়া যাইবে। কিন্তু অহমিকা পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে না পারিলে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তথাপি সে নিজের যথার্থ স্বরূপ, নিজের জীবনের যথার্থ বিধান বুঝিলে তাহার অহমিকাও একদিন খসিয়া পড়িবে।

অষ্টম

আধুনিক সভ্যতার স্বরূপ

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে মানব জীবনের চরম কাম্য অভিন্ন একত্বের মধ্যে বৈচিত্র্য, অর্থাৎ পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিগত জীবনের সহিত সমবেত জীবনের সামঞ্জস্য। এখন দেখা যাক, আত্মোপলব্ধির ঠিক মর্ম কি, সমষ্টির ও ব্যষ্টির। কেন না আত্মোপলব্ধি ব্যতিরেকে জীবনের পূর্ণতা আসিতে পারে না। সমগ্র নরজাতির অখণ্ড একত্ব আজও কার্যত আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে। বড় সমষ্টি বলিতে আমরা বুঝি নেশন বা মহাজাতি। এই নেশন-এর কার্যধারা আমরা দেখি বটে, কিন্তু তাহার প্রেরণা ও ভাবনাধারার সহিত আমাদের সম্যক পরিচয় নাই। ব্যক্তিকে আমরা চিনি, তাহার অন্তরের কথা আমরা ভাল করিয়াই জানি। তাই তাহাকে লইয়া আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যাক। ব্যক্তির মধ্যে আমরা যাহা দেখিব, তাহা অনেকটা সমাজ বা জাতি সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। আমরা ত স্থির বুঝিয়াছি যে ব্যক্তি পূর্ণ-পরিণত না হইলে তাহার সমাজও পরিণতি লাভ করিবে না।

মানুষের আত্মন্ তাহার নিগূঢ় সত্তা। সে-বস্তু তাহার দেহ নয়, প্রাণ নয়, মনও নয়। তাই দেহ-প্রাণ-মনের পূর্ণতা কখন তাহার আত্মোপলব্ধির মাপকাঠি হইতে পারে না। এই নিম্ন তত্ত্বত্রয় আত্মনেরই প্রকাশ বটে, কিন্তু মানুষের যথার্থ স্বরূপ নয়, সে যাহা হইতে চায় তাহাও নয়। তবে এই পরম সত্য মানব-জাতির অজ্ঞাত, যদিচ ব্যক্তিগত মুনি ঋষি মহাপুরুষ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। সমগ্র জাতির অভিব্যক্তি আজও এতদূর পৌঁছায় নাই। ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বহুস্থলে বহুবার লিখিয়াছেন। এখানে বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। জড়পদার্থ হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পোকামাকড় পশুপক্ষী, পশু হইতে অব-মানব, অব-মানব হইতে বুদ্ধিজীবী

পূর্ণমানব, এইভাবে জীবজগৎ অগ্রসর হইয়াছে। একথা সকলেই অবগত আছেন। তবে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হয় এই ক্রমোত্তরণের সম্পর্কে। আজ কলিকাতার রাস্তায় মোটর রথও আছে, মানুষে-ঠেলা গাড়ীও আছে। অর্থাৎ কলিকাতা মোটরত্বে উন্নীত হইলেও ঠেলা গাড়ীকে বর্জন করিতে পারে নাই। মানব জাতিরও তাই। মানুষ জীবের মধ্যে সর্বাগ্রগামী হইলেও পূর্বাবস্থাকে পুরাপুরি ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই তাহার মধ্যে পদার্থের জড়তা, উদ্ভিদের মাটিতে শিকড় গাড়া প্রবৃত্তি, হিংসাদি শ্বাপদপশুভাব, গড্ডলিকা প্রবাহাদি মেষভাব, অব-মানবের অপূর্ণ বৃত্তিসমূহ, আজও তাহার নানা কার্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই মানুষের স্থিতিস্থাপকত্ব, অগ্রগমনে আলস্য, গতানুগতিকের দাসত্ব, অতিমানবের গোলামী স্বীকার ইত্যাদি দোষ আজও বলবৎ। ফলে, তাহার পক্ষে পশু-মানবত্বে পতন যতটা সহজ, দেব-মানবত্বে উত্থানও ততটাই কঠিন। তথাপি, স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠাই ত বিবর্তনের ধারা! মনোময় মানবকে একদিন তাহার মনকে, ছাড়িয়া নয় ছাড়াইয়া, উর্ধ্বে উঠিতেই হইবে। সেইজন্য তাহার জানা আবশ্যক যে ঠিক কোন্ পথ ধরিয়া সে মানবত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এককালে লোকে দেহ ও প্রাণকেই আপন যথার্থ স্বরূপ বলিয়া ভাবিত, জানিত। সেই কালকে আমরা বলি পূর্ণ বর্বরযুগ। আজ মানব যেখানে উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানে আর এরূপ ভাবা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কেন না জীবনে মনই তাহার প্রধান সহায়। মনোবুদ্ধির বলেই সে আজ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে দাসী বাঁদী করিয়াছে, গায়ের জোরে নয়। দেহের উৎকর্ষ, দৈহিক বল, সিংহের মত পরাক্রম এইগুলিই যে মানবের যথার্থ কাম্য, বুদ্ধিচর্চা জ্ঞানানুশীলন ইত্যাদি অবজ্ঞার বস্তু, এ শুধু বর্বরেই ভাবিতে পারে। তবে সুসভ্য সমাজেও কৈশোরে এই দেহ-পূজার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, কেন না বালকের জগৎ খুব সংকীর্ণ, মনের শক্তির সন্ধান সে তখনও পায়

নাই। তবে এভাব বেশি দিন টিকে না, টিকিতে পারেও না। আধুনিক জীবনের নানা দাবি-দাওয়ার মাঝে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি ক্রমশ বেশি ফিরিতেছে অর্থনীতিক ব্যাপারের দিকে। রোজগার-ধান্দা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, এই সবই তাহার নজরে বড় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। দেহকে সে যে বাতিল করিয়াছে তাহা নয়, বরং স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তির চর্চা সে এখন বুঝিয়া সুঝিয়া বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সমঞ্জস ভাবে করিতে শিখিতেছে। সভ্য মানুষকে রোজগার করিতে হইবে, বিদ্যাচর্চা করিতে হইবে, শিল্পানুশীলন করিতে হইবে, আরও কত কি করিতে হইবে! সেজন্য সুস্থ সবল দেহেরও আবশ্যক। এই সমস্ত কাজ মানুষ যখন মানাইয়া করিতে শিখিল, তখন বর্বর যুগের অবসান হইল।

আধুনিক যুগের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন যে মানুষ আজও "আত্মানং বিদ্ধি" এই ঋষিবাক্য গ্রহণ করে নাই, তবে "বিদ্যাচর্চা কর" এই মনীষী-নির্দেশ মানিয়া লইয়াছে। সে ইহাও বুঝিয়াছে যে শুধু বিদ্যালাভ করিলেই হইল না, লব্ধবিদ্যা অপরকে দানও করিতে হইবে। অর্থাৎ সাধারণকে শেখান হইতেছে "মনই তোমার প্রধান সহায়, মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে যত্নবান হও!" মানুষ আর তাই বর্বরযুগের মত দেহকেই মুখ্য সাধন বলিয়া মনে করে না। শিক্ষা অর্থে লোকে আজ বুঝিতেছে মনোবৃত্তির মার্জন। তবে ইহার পিছনে নীতিজ্ঞান এবং সৌন্দর্যবোধও কতকটা জাগিয়াছে। আজিকার সভ্য শিক্ষিত মানুষ ইতিহাস জানে, জগদ্ব্যাপার বোঝে, ন্যায় অন্যায়ের ভেদ বোঝে, নিজেকে সংস্কৃত করিতে পারে, বুদ্ধিবলে আপন ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই সভ্যতাকে অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীসীয় আদর্শেরই বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার বলা যায়; কিন্তু হেলেনীয় সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচি এখনও ইহাদের জীবনে আসে নাই। তবে গুরুবর বলিতেছেন যে এ অবস্থা থাকিবে না,

বৈশ্যবৃত্তির প্রাধান্য চলিয়া গেলেই মনোময় মানবের জীবন পূর্ণতর হইবে।

একটা কথা ভাবিবার আছে। গ্রীসীয়-রোমকদের সভ্যতা ডুবিল কেন? দুই কারণে। এক ত, তাহাদের সমাজের সকল স্তর সমান সভ্য হয় নাই, ঊর্ধ্বস্তর ও নিম্নস্তরের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির তারতম্য বিস্তর ছিল। পরস্পর দরদও বিশেষ ছিল না। গ্রীসের হেলট বা রোমের প্লিবিয়ানেরা কতকটা সভ্য রাজ্যে বাস করার সুবিধা পাইত বটে; কিন্তু সে কতটুকু! নাগরিক ও ইতর জন, ইহারা কখনই আইনের চক্ষে সমান ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, গ্রীসীয় ও রোমক রাষ্ট্রগুলি চতুর্দিকে এমন সমস্ত শক্তিশালী পরাক্রান্ত বর্বর জাতিসমূহের দ্বারা পরিবৃত ছিল, যাহারা শিক্ষা, সংস্কার, মার্জিত রুচি ও বিকশিত বুদ্ধির কোন পরোয়াই করিত না, সভ্য জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। এ অবস্থায়, গ্রীস-রোমের শাসক সম্প্রদায়ের শারীরিক ও মানসিক বল যতদিন অক্ষুণ্ণ রহিল, ততদিন তাহাদের প্রভাব ও রাজ্য কারবার চলিল। তার পর রাজ্য যখন একবার ডুবিতে আরম্ভ করিল, তখন একেবারে ডুবিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অশিক্ষিত ও রাজ্যের প্রতি মমতাশূন্য, তাহারা কিছু করিলও না, করিবার শক্তিও তাহাদের ছিল না। চারিদিকের বর্বর জাতিসমূহ শকুনির মত আসিয়া পড়িল, রাষ্ট্র অচিরে ধ্বংস পথে গেল।

অবসন্ন মুমূর্ষু রোমক এই বিজেতা বর্বর জাতিসমূহকে সভ্যতার আলোক দিতে পারিল না। সে আলোক তাহারা পাইল নবীন খৃষ্টধর্ম হইতে। খৃষ্টধর্ম প্রধানত প্রেমধর্ম। অজ্ঞ মূর্খ গোঁয়ার টিউটনেরা দলে-দলে পোপের সিংহাসনতলে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। পোপ তাহাদিগকে পোষ মানাইলেন, ধর্মাধর্ম ন্যায়ান্যায়ের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু রোম-গ্রীসের মানসিক উৎকর্ষ অতল জলে ডুব দিল। পোপের শাসনে স্বাধীন চিন্তার, অজ্ঞেয়বাদের, নিরীশ্বরবাদের স্থান ছিল না। তাই দীর্ঘ অন্ধকার মধ্যযুগে

দর্শন বিজ্ঞানাদির অনুশীলন চলিয়া গেল আরব ও ইহুদীদের হস্তে। তাহারাই হইল পদার্থবিৎ, রাসায়নিক, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিৎ। সুক্রাত, আফ্লাতুন, আরিস্তুর স্বাধীন চিন্তাবলী তাহারাই বাঁচাইয়া রাখিল এবং কাল আগত হইলে ফিরাইয়া দিল ইউরোপকে। অর্ধ বর্বর ইউরোপ তখন আবার স্বাধীন চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া সভ্যতা সংস্কৃতিকে নূতন পথে চালিত করিল। Reformation ও Renascence গোঁড়া খৃষ্টীয় আচারবাদকে অপসারিত করিলে ইউরোপ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। পরম উৎসাহে জ্ঞানচর্চা আরম্ভ করিল।

সুসভ্য রোমের যে বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা বর্তমান জগতে ঘটিতে পারে না। কেন না আজ সভ্যতা মানেই জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানচর্চা মানেই পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা। এই দুই বিদ্যা মানুষের হাতে এমন সমস্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছে, সংঘটনের বা যুদ্ধবিগ্রহের জন্য, যাহা বর্বর জাতির স্বপ্নেরও অগোচর। অর্থাৎ যতদিন তাহারা বর্বর থাকিবে ততদিন কলকব্জা, কারখানা, গোলাবারুদ, জাহাজ, তোপগাড়ী, বিমানের তাহারা কি জানিবে? না জানিলে তাহাদের হাতে আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসও অসম্ভব। হাবসীরা ইতালীয়দের চেয়ে শৌর্য-বীর্যে অনেক শ্রেষ্ঠ, অথচ যুদ্ধে হারিয়া গেল প্রধানত অশিক্ষিত জাতি বলিয়া, পদার্থবিদ্যা রসায়নের জ্ঞান ছিল না বলিয়া। এখন হয়ত তাহারা জ্ঞানচর্চা আরম্ভ করিয়া, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখিয়া, দুর্ধর্ষ জাতি হইবে। কিন্তু তখন তাহারা আর বর্বর জাতি থাকিবে না, বর্বরের জয় হইল কেহ বলিতে পারিবে না। জনসাধারণের শিক্ষা ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। যাহা একটু বাধা কোথাও-কোথাও আছে, তাহা রাষ্ট্রনীতিক বা অর্থনীতিক কারণে। বেশি দিন থাকিবে না। বিজ্ঞান চিরদিনের জন্য মানব-বুদ্ধির ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত করিয়া দিয়াছে; মানুষের বুদ্ধি প্রখর হইয়াছে, তাহার গভীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর কখনও তাহাকে পিছু হটিতে হইবে না।

অবশ্য বুদ্ধির গণ্ডী এখনও জড়জগৎ ও জড়দেহকে ছাড়াইয়া বেশি দূরে যাইতে পারে নাই। তবে এই যুক্তিপ্রণোদিত জড়বাদের সহিত বর্বরের দেহসর্বস্ব ভাবের প্রভেদ অনেক। ইহার মধ্যে খুঁত যাহাই থাকুক না কেন, ইহার ভিত্তি মন ও বুদ্ধি। বিজ্ঞান মানেই মনের ক্রিয়া, মন তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়াছে দেহের দিকে, আবেষ্টনের দিকে, জড়জগৎকে জয় করিবে বলিয়া। মনীষী মানব জড়শক্তিকে আপন কার্যে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক বিধানসমূহের রহস্য আলোচনা করিতেছে। এই আলোচনা করিতে-করিতে অবশেষে সূক্ষ্ম ব্যাপারও আসিয়া পড়িতে বাধ্য। ভৌতিক প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে জানিতে হইলে অতিভৌতিক প্রকৃতির বিধানাবলীও বোঝা চাই। তাই মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, আধুনিক ও প্রাচীন, একদিন মানুষের গবেষণার বিষয় হইবেই। গুরুবর বলিতেছেন যে এই নূতন গবেষণার যুগ ধীরে-ধীরে আসিয়া পড়িতেছে। ভিত্তিস্বরূপ জড়বিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল বলিয়াই মানুষের মন প্রথমে প্রধানত সেইদিকে ধাবিত হইয়াছিল।

গোঁড়া বৈজ্ঞানিক কিন্তু দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, সাহিত্য ও কলাচর্চাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, ধর্মের ত কোন ধারই ধারিতেন না। তিনি সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন জড়বস্তুকে, বাস্তবকে। যাহা প্রত্যক্ষ মানুষের কোন কাজে লাগিবে না, তাহাকে তিনি বাতিল করিয়াছেন। এই মনোভাবেরও প্রয়োজন ছিল জগতে। কেন না তখন বাস্তবের সহিত, বাহ্যজগতের সহিত, কাব্য দর্শন চিত্রকলা ও ধর্মের যোগ নিতান্তই শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। ইহাদের যে প্রধান কাজ, মানুষের চোখের সম্মুখে চরম সত্যকে তুলিয়া ধরা, তাহা ইহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাই একটা তীব্র প্রতিবাদের দরকার হইয়াছিল। এই প্রতিবাদের ফলে ইহাদিগকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইল আপনার অন্তরে, পুনরাবিষ্কার করিতে হইল অন্তর্নিহিত চিরন্তন তত্ত্বকে।

জড়বিজ্ঞানের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ইহারা জড়বিজ্ঞানের প্রধান অস্ত্র হাতে ধরিয়াছে, বুঝিয়াছে যে সত্যই জীবনের ও শক্তির রহস্য।

এইরূপে জড়বিজ্ঞান জগতে একটা গভীরতর বিস্তৃততর সংস্কৃতির যুগের আবাহন করিয়াছে। শুধু তাই নয়। মানবসমাজে প্রাচীন বর্বর মনোভাবের পুনরুত্থানের সকল সম্ভাবনাও ঘুচাইয়াছে। এটা ত গেল ভালর দিক। তবে একটা মন্দের দিকও আছে, যাহার সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন থাকিতে হইবে। পুরাতন বর্বরযুগ গিয়াছে বটে, কিন্তু একটা নূতন রকমের বর্বরতা সমাজে দেখা দিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্বরতা বলিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটা বিকৃত বৈশ্যবৃত্তি—অর্থসঞ্চয়, ভোগ, পরস্বাপহরণের প্রেরণা। আদিম বর্বরের দৃষ্টি দেহসর্বস্ব ছিল, ইহাদের দৃষ্টি প্রাণসর্বস্ব। তাই ইহারা শিক্ষা ধর্ম শিল্প কাব্য সাহিত্য সবই দেখে লাভ লোকসানের নজরে। ভোগ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কলাবোধ বা সৌন্দর্যবোধ নাই। শিক্ষা আছে, কিন্তু তাহার মূল্য রোজগার ধান্দার সহায় বলিয়া। ধর্মও সেইরূপ অন্তঃসারহীন, শিষ্টতা সৌজন্যের অঙ্গ মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে ভোগমাত্রই ত দূষণীয় নয়, বরং নগ্ন কুৎসিত দৈন্যই বর্জনীয় বস্তু। তবে সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ত বাঞ্ছনীয়। আসল কথা, জীবন সুন্দর হওয়া চাই, তাহার মধ্যে সত্যের উপলব্ধি থাকা চাই। আধুনিক বর্বরজীবনে সত্য সুন্দরের একান্ত অভাব। লক্ষপতি ক্রোড়পতি, ধনেশ্বরেরাই আজিকার অতিমানব, সমাজের নিয়ন্তা। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে এই বর্বর-সভ্যতার পরিণাম বড় শোচনীয় হইবে। হয় ফুলিতে ফুলিতে ফাটিয়া মরিবে নয় আপনার ভারে ভূমিসাৎ হইবে। উপনিষদের যে দুই উপদেশ—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এবং "মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং"—ত্যাগ ও নির্লোভ, দুইটিই এই বৈশ্যযুগে বর্জিত হইয়াছে।

নবম

মনোময় মানবের পরিণতি

ভৌতিক জগৎ আরম্ভ হইয়াছিল জড়পিণ্ড হইতে। তার পর সেই জড়ে জাগ্রত হইল সুপ্ত প্রাণশক্তি, প্রাণবন্ত জীবের উদ্ভব হইল। ক্রমশ সেই প্রাণবন্ত জীবের অন্তরে মুক্ত হইল মনোবৃত্তি—যদিচ তখনও অতি স্থূল অবস্থায়। তারপর সেই জাগ্রত মন আপনার স্বরূপ জানিতে চাহিল, দেহপ্রাণের রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইল। মন ভাল করিয়া বুঝিতে চাহিল দেহপ্রাণমনরূপ ত্রয়ীতত্ত্ব, তাহাদের বিধান, তাহাদের ক্রিয়া, তাহাদের চরম পরিণতি। জীব-মানসের উৎকৃষ্টতম অভিব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি এই বৃত্তি স্ফূর্ত হইল পূর্ণ-মানবের মধ্যে, যে মানবের নাম বিজ্ঞান দিয়াছে Homo Sapiens, বুদ্ধিজীবী নর। পূর্বতন প্রাণিগণের মনোবৃত্তি ছিল কতকটা যন্ত্রবৎ, তাহাদের আত্মজ্ঞান ছিল না, আত্মনিয়মনের শক্তিও ছিল না। জ্ঞান, যুক্তি, বিচার, সংকল্প মিলিয়া গড়িয়া তুলিল প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব, মনোময় মানবকে। তথাপি মনোময় জীবনই তাহার চরম অভিব্যক্তি নয়। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বজননীর একটা বৃহত্তর মহত্তর কাজ চলিয়াছে। সেই কাজ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষের মনকে ফেরান তাহার দেহ ও প্রাণের দিকে। প্রথম-প্রথম তাহার দৃষ্টি থাকে সংকীর্ণ এবং সে ঠিক বোঝে না কি করিতেছে। কিন্তু যেমন-যেমন তাহার বুদ্ধিশক্তি বাড়ে, তেমন-তেমন আপন দেহপ্রাণকে দেখিতে শেখে ব্যাপকভাবে, উদারভাবে, সংস্কৃতির দিক হইতে এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিক পরিণতির দিক হইতে।

মানসিক উৎকর্ষ, মনোময় জীবনের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি, এই হইল মানুষের প্রধান লক্ষ্য। জন্মমৃত্যু, বিবাহ, বংশবৃদ্ধি, খাদ্যসঞ্চয়, এ সকল তাহার মুখ্য

করণীয় নয়। তাহার বড় কাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, শিল্পকলার চর্চা, মনস্তত্ত্বের আলোচনা, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার, পারত্রিক সমস্যাসমূহের সমাধান। এই সব মনন ক্রিয়ার বলেই ত সে মানব।

প্রকৃতি মানুষকে দুই কাজের শিক্ষা দিয়াছেন, নিয়মন ও বিসৃজন। আপনার দেহপ্রাণমনের নিয়মন, তাহাদিগকে নব-নব রূপ দান ও শৃঙ্খলা-বিধান, এমন কি, নূতন-নূতন আবেষ্টনের সৃষ্টি ও তাহার নিয়মন। মানুষ এই কাজ করিয়াছে চিরদিন। মনকে ফিরাইয়াছে শুধু মনের দিকে নয়, দেহপ্রাণের দিকে, পরিবেশের দিকে। তবে প্রশ্ন উঠে যে মানবের এই প্রসার, ইহা কি শুধু বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী, ঊর্ধ্বমুখী নয়? অবশ্যই ঊর্ধ্বমুখী। প্রকৃতির অভিব্যক্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়। নিশ্চেতনাকে সে অতিক্রম করিয়াছে, অবচেতনাকে অতিক্রম করিয়াছে, চেতনার নিম্নতর প্রকাশকে ছাড়াইয়া সে এখন উচ্চতর লোকে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে সে থামিবে কেন, পরাচেতনার গণ্ডীর মধ্যে সে উঠিবেই! শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, মানব ও বিশ্বের মধ্যে দেবতাকে উপলব্ধি করিবে এই তাহার সত্তার আসল অর্থ, হয়ত ধীরে-ধীরে দেবত্বে উত্থানও তাহার লক্ষ্য। তবে যদি এতটা সে এখনই না ধরিতে পারে, তথাপি পার্থিব জীবনের পরিপূর্ণতা যে তাহার উদ্দেশ্য একথা সে ভালরূপেই জানে। এইভাবেই সে তাহার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। দুটি প্রেরণা তাহার মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, সমগ্রের অনুভূতি এবং তাহার বর্তমান সত্তাকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সত্তাতে উত্তরণ।

মানব-সংস্কৃতি বলিলে বোঝায় মনোময় জীবনের অনুধাবন, সেই জীবনকে সে চায় বলিয়াই। এই যে সংস্কৃতি, ইহা সংকীর্ণও হইতে পারে, উদারও হইতে পারে, কেন না মন অতি জটিল ব্যাপার, সে কাজ

করে বহু দিকে ও বহু স্তরে। সর্বনিম্ন স্তর প্রাণশক্তির নিকটতম। এখানে মনের কাজ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-অনুভূতি, হৃদয়ের আবেগ ইত্যাদির সহিত জড়িত। তদূর্ধ্বে কর্ম ও ব্যবহারের ক্ষেত্র। তাহারও উপরে আবার একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের প্রেরণা ও নৈতিক জীবন, অপর দিকে সৌন্দর্যবোধ ও সুন্দরের উপলব্ধি। সর্বোপরি বুদ্ধি, মনোময় মানবের রথের সারথি। এই বুদ্ধি আপন যুক্তি বিচারের ক্ষমতা এবং সংকল্প-শক্তি দ্বারা মনের নিম্নস্তরের ক্রিয়াসমূহকে সংযত করিতেছে। তবে মানবের বুদ্ধিও ত সর্বথা যুক্তিবিচারের দ্বারা চালিত নয়। তর্ক-বিতর্কের অতীত একটা গভীরতর দীপ্তি ও শক্তি মানুষের মনে মাঝে মাঝে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিকে আলোকিত করে। এই বোধিকে একটা বিশিষ্ট নাম দেওয়া কঠিন। ইহা কোন নিয়মের অধীন নয়, খুব স্পষ্ট নয়, ক্ষণিক চমকের মত আলো দিয়া অন্তর্হিত হয়। আলো দেয় মনের সকল স্তরে। এই দীপ্তি রহস্যময়। ইহার সূক্ষ্ম ক্রিয়া আমাদের সত্য, সুনীতি ও সুন্দরের উপলব্ধি ; ইন্দ্রিয়, দেহ ও প্রাণ, সবের উপরেই ইহা একটা দিব্য আধ্যাত্মিক আলোকপাত করে। তবে আমাদের নানা ধর্মমত ও ক্রিয়াকর্মের আধ-আঁধারের মধ্যে এই আলোক অতি সামান্য কাল মাত্র স্থায়ী হয় এবং নানা বিকৃত রূপ ধারণ করে। যাহা প্রবেশ করে খাঁটি সোনারূপে, তাহা হইয়া যায় গিলটিমাত্র। তথাপি একটা কিছু থাকিয়া যায়, একটা দীপ্তির রেশ থাকে যাহা মানুষকে আত্মসন্ধানের পথ দেখাইয়া দেয়।

মানবমনের এই জটিলতা তাহার পরমজ্ঞান লাভের পথে প্রধান বাধা। একটা মূল-তত্ত্ব নাই যাহা মন ও বুদ্ধিকে অবিকম্পিত রাখিবে, যাহা সহস্র বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সংশয়, অনুকৃতি, বিকৃতির কুঁয়াসার মাঝে সোজা পথ দেখাইবে। মানুষের যুক্তিবুদ্ধি বিচারাসনে বসিয়া তাহাকে নানা বিরোধী হুকুম দেয়, এমন কি ঘুষ খাইয়াও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করে। তাহার সংকল্প-শক্তি অনুচরবর্গের বিদ্রোহের ফলে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে না।

তবু এত গোলযোগ সত্ত্বেও মানুষ সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি কল্পনা করিয়া লইয়াছে, মনোময় জীবন সম্বন্ধে তাহার একটা ধারণা জন্মিয়াছে। সমঞ্জসভাবে একটা লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে সে চেষ্টা করিতেছে।

এই হইতেই প্রভেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে অসভ্য ও সভ্য জীবনের মধ্যে। সাধারণত সভ্য বলিলে এমন সংগঠিত সমাজ বোঝায়, যাহার শাসনব্যবস্থা আছে, পুলিশ প্রহরী আছে, শিক্ষায়তন আছে, যন্ত্রতন্ত্র উপকরণাদি আছে। অসভ্য মানে যাহার এসব সুবিধা কিছু নাই। তবে আদিম মার্কিনী, আফ্রিকার বাসুতো, ভারতের কোল-ভীল প্রভৃতি যাহাদিগকে অসভ্য বলা হয় তাহাদেরও সাদাসিধে একটা সমাজ-সংঘটন আছে, আইনকানুন আছে, ন্যায়ান্যায়বোধ আছে, ধর্ম আছে, উপরন্তু এমন কতকগুলি গুণও আছে যাহার তথাকথিত সভ্য জাতির মধ্যে একান্ত অভাব। তবু তাহাদিগকে আমরা বর্বর জাতিই বলি। কেন না তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ, যন্ত্রপাতি একেবারে মোটামাঠা আদিম, সমাজগঠন যাহা আছে তাহা নিতান্ত মৌলিক। এদের চেয়ে আর একটু পরিণত জাতিসমূহ পরস্পরকে বলে অর্ধসভ্য বা অর্ধবর্বর। তবে সেটা হইল গালাগালির ভাষা। কাফের, ম্লেচ্ছ, ইত্যাদি শব্দ এই মনোভাব হইতে উদ্ভূত। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে সভ্যতা কথাটা তুলনামূলক, অনেকাংশে অর্থহীন। ইহার সাধারণ অর্থ আমাদের এই আলোচনাতে অগ্রাহ্য। আমরা বর্বর বলিব সেই জাতিকে যাহারা আপন দেহপ্রাণ লইয়াই মশগুল, যাহারা মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে চায়ও না জানেও না, আপন ধ্রুব স্বার্থ সম্বন্ধে যাহারা অন্ধ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইহাদের যেটুকু আছে তাহা অত্যন্ত কাঁচা রকমের, এবং তাহার প্রেরণা দেহপ্রাণের দাবি মেটান মাত্র। অপরপক্ষে আমরা সভ্য বলিব সেই সব জাতিকে যাহাদের জীবন প্রধানত মনোময়, যাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাকা রকমের এবং তাহার প্রেরণা জোগায় মন ও বুদ্ধি। ইহাদের

জীবনের সকল দিক সকল সময়ে সমান পরিণত নাও হইতে পারে, হয়ত কোন-কোন বিষয়ে কখন একটা দিক একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। তথাপি এ সমাজ সভ্য সমাজ, কেন না ইহা মনোবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য এটা বুঝিতে হইবে যে বর্বর সমাজেও বহু সময়ে দেখা যায় যে সভ্যতার ক্ষীণ সূত্রপাত হইয়াছে, আবার সভ্য সমাজেও দেখা যায় বর্বরতার বহু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। এই দিক হইতে দেখিলে সব সমাজই অর্ধসভ্য বা অর্ধবর্বর। এই যে আমাদের আজিকার সুসভ্য জীবন, ইহাকেই হয়ত ভবিষ্যৎ মানব অর্ধবর্বর বলিবে। মোট কথা, সভ্য সমাজ প্রধানত মনের দ্বারা চালিত, মন সেখানে একটা জীবন্ত সক্রিয় বৃত্তি, জীবনধারা উচ্চতর মনের কল্পনা ও ভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তথাপি সভ্যতামাত্রই সংস্কৃতি নয়। সভ্যজীবনের লক্ষণ বলিতে আজ আমরা মোটামুটি বুঝি বাড়ী-গাড়ী, সাজ-পোষাক, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ইস্কুল-কলেজ ইত্যাদি। এগুলি, দেখা যায়, সকল সভ্য দেশেই আছে। সেই-সেই দেশের লোকের কাছে এ সমস্ত সুবিধাই সহজলভ্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের জীবনকে ঠিক মনোময় জীবন বলা চলে কি? আরও উন্নত পরিণত কিছুর অভাব তখনও তাহার মনে রহিয়াছে, নয় কি? সেকালে ফিলিস্ত, Philistine, নামক এক জাতি ছিল যাহাদিগকে ইহুদীরা অবজ্ঞার চোখে দেখিত এইজন্য যে তাহাদের ভোগের সকল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, অর্থবল লোকবল থাকা সত্ত্বেও, তাহারা যথার্থ মানুষ ছিল না, তাহাদের মানবত্বের আদর্শ হীন ও ক্ষুদ্র ছিল, সুন্দরের উপলব্ধি ছিল না। এই ফিলিস্টাইন প্রকৃতির লোক উনিশ শতকের ইউরোপে বিস্তর দেখা যাইত। আজও বিস্তর আছে, তবে তাহাদের রাজত্বের অবসান হইয়াছে। এই যে মানুষ, যাহাদের মতামত আছে, সংস্কার আছে, ভালমন্দ জ্ঞান অছে, অথচ জীবন্ত স্বাধীন বুদ্ধি নাই, সুন্দর ও শিল্পকলার বোধ নাই,—ধর্ম, নীতি, সাহিত্য যাহা চোর

তাহাকেই পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে—ইহাদিগকে গুরুবর বলিতেছেন আধুনিক সভ্য বর্বর। মনোময় বর্বর, অর্থাৎ ইহাদের মনের ক্রিয়া নিম্নস্তরের। ইহারা দেহপ্রাণের প্রভাবকে ঠিক কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। দেহ, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, হৃদয়ের আবেগ, কর্মধারা—ইহাদের এই বৃত্তিসমূহ উচ্চতর আলোকে আলোকিত হয় না, এই বৃত্তিগুলিকে ইহারা উর্ধ্বে উন্নীত করিতে জানে না। বরং উচ্চতম বৃত্তিসমূহকে টানিয়া নামাইয়া আনে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নিম্নস্তরে। ইহাদের সৌন্দর্যবোধ অতি সামান্য, সৌন্দর্য ও শিল্পকলাকে দেখে শুধু একটা স্থূল ব্যাবহারিক নজরে। নীতিজ্ঞান খুবই আছে, কিন্তু তাহা নিরর্থক শুচিবায়ুগ্রস্ত—আচার, গতানুগতিক ও সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কি সুনীতি, কি দুর্নীতি তাহা অভ্যাসের দ্বারা নির্ণীত। ইহারা যুক্তিতর্ক করিয়া থাকে, বাহ্যত মনে হয় বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত এবং আবেষ্টনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেটুকু বা বুদ্ধি আছে, তাহার সহিত স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন সংকল্পের সম্বন্ধ অতি অল্পই।

এই ফিলিষ্টাইনদের প্রভাব গিয়াছে। যথার্থ সংস্কৃতির পুত্রগণ দেখা দিয়াছে। তাহারা বোঝে যে উচ্চতর বৃত্তিগুলির সাহায্যে চিন্তাধারাকে জাগাইতে হইবে, সার্থক করিতে হইবে। নব-নব তথ্য সংগ্রহ, নূতন কল্পনা, নবীন ভাবনাধারা, নূতন কর্মধারা, তাহাদের মনের অর্গল খুলিয়া দিয়াছে। গতানুগতিকের দাস আর তাহারা নাই, কিন্তু তথাপি এখনও নবলব্ধ বস্তুসমূহকে গোছ করিয়া ঘরে তুলিতে শেখে নাই। নবাগত আদর্শকে গ্রহণ করার উৎসাহ তাহাদের আছে, তাহাকে কার্যে পরিণত করার উত্তম আছে, প্রয়োজন পড়িলে তাহার জন্য প্রাণ দিবার সাহসও আছে। তাহারা জানে যে ধর্ম, নীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তা করিতে হইবে। নূতন-নূতন ছাঁদের কাব্য-উপন্যাসাদির তাহারা পাঠক, অন্তত পৃষ্ঠপোষক ত বটেই! ললিতকলা সম্বন্ধে তাহাদের পরিষ্কার ধারণা নাই

সত্য, তথাপি তাহারা শুনিয়াছে যে মানবজীবনে ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বিশালকায় মানবের ছায়া পড়িয়াছে সর্বত্র। পুস্তক, পত্রিকা, খবরের কাগজ, সবই ইহাদের ; উপন্যাস, কাব্য, ললিতকলা, ইহাদের মনকে খোরাক জোগাইতেছে ; চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ ইহাদের চিত্তবিনোদন করিতেছে ; পদার্থবিদ্যা তাহার নব নব আবিষ্কারের দ্বারা ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতেছে, রাষ্ট্রনীতি ইহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়াছে। নারীর মুক্তি, শ্রমিকের স্বাতন্ত্র্য, নানা নবীন মতবাদ, অকস্মাৎ দেশব্যাপী রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লব, সবই এই নবজাগ্রত অথচ কথঞ্চিৎ অস্থিরবুদ্ধি মানবের কীর্তি। ইহারাই জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজের প্রথম সূত্রপাত করিয়াছে। সূত্রপাত মন্দ হয় নাই, তবে ভাবুক সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না এইটুকুতে। এখনও মূলে গোল রহিয়াছে। বাহ্যত দেখিলে শিক্ষা-সংস্কৃতি সার্বজনিক হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি সূত্র রহিয়াছে তাহাদেরই হাতে যাহারা মানবের সর্বস্তরে শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন দেখে না। সভ্যতার মূলে আজও রহিয়াছে পণ্যজীবীর বুদ্ধি। কর্মস্রোত আজও মূলত দেহের দাবি ও ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা প্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত। তবে তফাৎ এই হইয়াছে যে আধুনিক শিক্ষা মানুষকে একটা মানসিক প্রেরণা দিয়াছে, বুদ্ধিকে কতকটা জাগাইয়াছে, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধ তাহাকে নাড়া দিয়াছে। মনের কল্পনা, মনের আদর্শকে অনুসরণ করিতে সে চায়। চায়, কিন্তু পুরাপুরি পারে না। গ্রন্থকারের দল তাহার জন্য গ্রন্থ লিখিতেছেন, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের তথ্য সহজ-গ্রাহ্য করিয়া পরিবেশন করিতেছেন, কেন না তাহার সর্ববিষয়ে কুতূহল জাগিয়াছে। সে যাহা শিখিতেছে তাহা কাজেও লাগাইতেছে। আপন সুবিধার জন্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য। পর্বত-প্রমাণ ইমারত তুলিতেছে, যাতায়াতের জন্য রেলগাড়ী, ষ্টিমার নির্মাণ করিতেছে, বড় বড় কল কারখানা স্থাপিত করিতেছে। তবে তাহার টুকরা-টুকরা লব্ধবিদ্যাকে জ্ঞানের একটা

বড় পটভূমির উপর সমঞ্জস ভাবে দেখিতে সে জানে না। সাহিত্য ও শিল্পকলাকে সে খেলো করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিভার কোন আদর নাই প্রতিভা বলিয়া। যে লেখক কবি চিত্রকর জনসাধারণের চিত্তবিনোদ করিতে জানে তাহারই কদর, অপরের নাই। উর্দ্ধতন মনোময় জীবন জনগণের খর্পরে পড়িয়া সার্বজনিক হইয়াছে বটে, তবে সেই সঙ্গে তাহার অধোগতিও হইয়াছে যথেষ্ট। ইহার ফল ভালমন্দ দুই দেখা যাইতেছে। একটা মস্ত রকমের পরিবর্তনের স্থত্রপাত হইয়াছে। গভীরতর জ্ঞান ও চিন্তার দাবিদাওয়া লোকে অন্তত কানে শুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুন্দর এখনও উপলব্ধ হইতেছে না বটে, তবে একদিন হইবে। শিক্ষাদানের নবীন প্রণালী, সমাজ-গঠনের নূতন ধারা সম্বন্ধে লোকে ভাবিতেছে, হয়ত একদিন ফল পাইবে। সেইদিন জগতে যথার্থ মনোময় মানবের জন্ম হইবে, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

দশম

নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ

আমরা দেখিয়াছি যে সংস্কৃতি বলিলে মোটামুটি বোঝায় মনোময় জীবন। তবে এই জীবন উদার ও সংকীর্ণ, দুই হইতে পারে। মন জিনিসটাই জটিল, তার ক্রিয়ার ক্ষেত্র নীচে জড়দেহ হইতে উপরে অতীন্দ্রিয় বুদ্ধি অবধি বিস্তৃত।

সংস্কৃতি কি, শুধু তাহারই নির্দেশ না করিয়া, কি নয়, তাহা বলিলে অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। শুধু দেহসর্বস্ব জীবন যে বর্বরতা তাহা বেশ বোঝা যায়। প্রাণসর্বস্ব জীবন,—শুধু খাদ্যসংগ্রহ, অর্থসঞ্চয়, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদিতে আবদ্ধ,—যাহা উচ্চতর চিন্তার ধার ধারে না, তাহাও সংস্কৃতি নয়। তাহাকে শ্রীঅরবিন্দ বর্বরতারই আলম্বন বলিয়াছেন। এরকম লোক হয়ত সভ্য সমাজে বাস করে, ট্রামে চড়ে, ট্রেনে যাতায়াত করে, ইমারৎ তোলে, শহর-বাজার, ইস্কুল-কলেজ বসায়। তথাপি তাহারা যথার্থ মনোময় জীবনের গণ্ডীর বাহিরে। এমন কি, যেখানে বিদ্যাচর্চা ও শিল্পবিজ্ঞানাদির অনুশীলন প্রচলিত হইয়াছে, অথচ মানুষের সাধারণ লক্ষ্য স্বার্থানুসন্ধান, বেচাকেনা বা ভোগের উপকরণ সংগ্রহ, যেখানে মানুষের জীবন বা চিন্তার ধারা সত্য ও সুন্দরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সেখানেও সংস্কৃতি আসিয়াছে বলা যায় না। তাই আমরা উনিশ শতকের ইউরোপকে সুসংস্কৃত সমাজ বলি না। শিল্পে, বিজ্ঞানে, দ্রব্যোৎপাদনে, অনেকদূর অগ্রগামী হইলেও লোকে সমস্ত উদ্যম, সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছিল ব্যবসাদারী বুদ্ধি লইয়া। কিসে নিজে দু পয়সা করিব, নাম কিনিব, পাঁচ জনের একজন হইব, এই ছিল মানুষের ধ্যান। এদিক দিয়া দেখিলে পুরাতন আথেন্স, ষোড়শ শতকের ইতালী বা প্রাচীন ভারতের মত দেশ অনেক অগ্রসর হইয়াছিল। কার্যকরী বিদ্যার চর্চা, বাহ্য সম্পদ, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদিতে ইউরোপের সমকক্ষ না হইলেও মানব

স্বভাবের পূর্ণতা, জীবনের আদর্শ, সত্য-সুন্দরের বোধ, তাহারা ঢের ভালরূপে বুঝিয়াছিল।

মনোময় জীবনের মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। শুধু চঞ্চল কর্মতৎপরতা বা ভাব-সংবেদনের রাজ্যে বাস—আচরণ আড়ষ্ট, কেন না আচারানুসারী—জীবন আবেষ্টন-প্রভাবে প্রভাবান্বিত—মনের মুক্ত ক্রিয়া নাই—না ভাবিয়া চিন্তিয়া বহুমতানুযায়ী জীবন যাপন, তার মধ্যে সুন্দরের উপলব্ধি নাই,—এ ধারা সংস্কৃতির বিপরীত। এরূপ মানুষের বাহিরটা সভ্য হইতে পারে, ব্যবহারে সভ্যতার ধরনধারন থাকিতে পারে, কিন্তু সে পূর্ণপরিণত মানব নয়। এরূপ সমাজ শক্তিমান, সুসবদ্ধ, ভব্য হইতে পারে, ধর্ম ও সুনীতির খোলসও ইহার থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাকে ফিলিস্টাইনের বেশি বলা চলে না। এ কারাগার মানবাত্মাকে ভাঙ্গিতেই হইবে। যতদিন আত্মা এই গারদঘরে আছে, ততদিন তাহার মনের প্রসার বা যথার্থ প্রেরণা থাকিবে না। এখানে ইন্দ্রিয়াশ্রিত অধস্তন মন কাজ করিতেছে, উচ্চতর বৃত্তি প্রসুপ্ত। এ কয়েদখানাতে দুইটা একটা জানালা ফুটাইলে চলিবে না; ঐটুকু হাওয়া বা আলোতে কাজ হইবে না। ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মুক্ত বায়ুতে, পূর্ণ আলোকে বাস করিতে হইবে। যথার্থ সংস্কৃতি বলিতে প্রধানত বোঝায় অধস্তন মনের ভাবকে ছাড়াইয়া উঠিয়া জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ। দীপ্তবুদ্ধি, উদার জ্ঞানপিপাসা, সত্য-সুন্দরের উপলব্ধি, প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি, উচ্চ নৈতিক আদর্শ, বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র, এই সব ইহার লক্ষণ।

সংস্কৃতি কাহাকে বলে এবং কাহাকে বলা চলে না, এ কথা একরকম বোঝা গেল। তথাপি মনোময় জীবনের ঊর্ধ্বতন স্তরে একটু গোলযোগ বাধিতে পারে। আগে, সংস্কৃতি ও আচরণ, এই দুই বস্তর মধ্যে প্রভেদ করা হইত। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে আচরণ সংস্কৃত জীবনের একটা অঙ্গ, নৈতিক আদর্শ সুসংস্কৃত মানবের একটা মুখ্য প্রেরণা। মানবের পূর্ণ-অভিব্যক্তির দিক

হইতে এই দুই বস্তুকে অসম্বদ্ধ বিবেচনা করা যায় না। জ্ঞানচর্চা ও সৌন্দর্যচর্চাকে এক কোঠাতে এবং চরিত্র-আচরণাদি আর এক কোঠাতে ফেলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। তথাপি এরূপ পৃথকীকরণ মানবমনের স্বাভাবিক ক্রিয়া। ইহাতে গোলযোগও যথেষ্ট ঘটিয়াছে। বিখ্যাত মনীষী আর্ণল্ড এই ভেদের নাম দিয়াছিলেন ইহুদীধর্ম ও গ্রীসীয়ধর্ম। বাইবেলের প্রাচীন খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই ইহুদীদের কিরূপ কঠোর নৈতিক আদর্শ ছিল। এই কঠোরতার (প্রায় বর্বরতার) পরাকাষ্ঠা মুসার বিধানে আমরা দেখি। কিন্তু ক্রমশ সে নির্মমতা দূর হইল। "Prophets"-এর পরিচ্ছেদে ইহার নিদর্শন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ধীরে-ধীরে ইহুদীধর্ম উচ্চ নৈতিক স্তরে উঠিল, এবং পরে এই চিন্তাধারার মধ্যেই বিকশিত হইল খৃষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার কমনীয় কুসুম। তথাপি, একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে এই ভাবধারার মধ্যে ধর্ম-কৃত্য, উচ্চ নৈতিক আদর্শ, পুণ্যের পুরস্কার ইত্যাদি থাকিলেও বিজ্ঞান, দর্শন, শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, সুন্দরের অনুভূতির স্থান ছিল না। অপরপক্ষে হেলেনীয় মন যুক্তিবুদ্ধিকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিল, সৌন্দর্য উপলব্ধির মর্ম বুঝিয়াছিল, এবং ধর্মে কর্মে চিন্তায় সৃজনী-প্রতিভায় সর্বত্র সুন্দরকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সুন্দরের অনুভূতি গ্রীসীয় মনে এতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তাহার আচরণ ও নীতি পর্যন্ত, ভালমন্দ বোধ পর্যন্ত ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। দেবতাকেও সে চিনিয়াছিল পরম সুন্দর বলিয়া। এই দুই বিরোধী ধারা, ইহুদী ও হেলেনীয় ইউরোপের সংস্কৃতির উপর আপন-আপন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

মানুষের মনোবৃত্তির দুইটি স্বতন্ত্র দিক আছে। মনের মধ্যে সংকল্প, আচরণ ও চরিত্রের একটি ধারা আছে যাহা হইতে উদ্ভব নীতিবাদী মানবের। কিন্তু মনের আর এক দিক আছে, সুন্দরের অনুভূতি, যাহার পরিণতি শিল্পকলা ও সৌন্দর্যের চর্চা। অতএব সংস্কৃতিও দুই প্রকারের হইতে পারে—একটি

প্রধানত নৈতিকবোধের উপর, অপরটি সৌন্দর্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে সংস্কৃতির দুইটি স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে আড়াআড়ি, অবিশ্বাস ও বিরোধ বিস্তর। যে সুন্দরের উপাসক, সে নীতির কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করে। তাহার বিশ্বাস যে এই কঠিন শাসন মানবের অভিব্যক্তির পথে বড় অন্তরায়। শুধু তাই নয়। সৌন্দর্য ও আনন্দ যায় এক সাথে। যে-মানুষ যথার্থ কলাবন্ত, সে আনন্দেরও উপাসক। সে সুনীতিকে গ্রহণ করিতে পারে যদি সুনীতি সুন্দর হয়, অথবা যদি সুনীতিকে ভিত্তি করিয়া সে সুন্দরের সৃষ্টি করিতে পারে। নহিলে নয়। কবির মন, চিত্রকরের মন, সঙ্গীতজ্ঞের মন, নীতির এমন কি ধর্মের দিকে যায় তখনই, যখন সে নীতির বা ধর্মের মধ্যে সুন্দরের প্রকাশ দেখিতে পায়। তাই জগতে এত সুন্দর সুন্দর দেবায়তন, মনোহর শ্রীমূর্তি, উচ্চতম কবিত্বের ও সঙ্গীতের আদর্শ যারা অনুপ্রাণিত স্তব-স্তোত্র ভজন-কীর্তন। শিল্পী ধর্মের ও নীতির খাতিরে এই সমস্ত অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করে নাই। করিয়াছে শুধু আনন্দের প্রেরণায়।

নীতিবাদীও শিল্পীর অবজ্ঞা সুদসুদ্ধ শোধ করিতে ছাড়ে না। চারুকলা ও সৌন্দর্যবোধকে সে অবিশ্বাস করে। বলে যে উহারা সংযমের মূল উচ্ছেদ করে, শুধু হৃদয়ের আবেগকেই প্রশ্রয় দেয় ও মানুষের চরিত্রে বিশৃঙ্খলতা ও ঢিলেপনা লইয়া আসে। বলে যে শিল্পী ও কলাবন্ত কেবল ভোগের ও সুখের সন্ধানী, সে-ভোগ সুনীতির সহিত সমঞ্জস হোক বা না হোক। গোঁড়া Puritan নীতিবাদী কোন রকমের ভোগ সুখকেই দেখিতে পারে না। তাহার চক্ষে এ সমস্তই শয়তানের প্রলোভন। এই যে পরস্পরবিরোধী দুই ভাবধারা ইহারও প্রয়োজন ছিল মানবের অভিব্যক্তির জন্য; শুধু প্রয়োজন কেন, এই দ্বন্দ্বেরই মধ্য দিয়া মানুষ তার পূর্ণতায় পৌঁছিবে।

সমষ্টিকে ব্যষ্টিরই পরিণতি বলা যায়। তাই এই ব্যক্তিগত বিরোধ সমাজে-সমাজে, জাতিতে-জাতিতে, বৈষম্য আনিয়া দিয়াছে, মানব-সমাজের

ক্রমবিকাশে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ এই দুই প্রকার মনোবৃত্তির নানা উদাহরণ দিয়াছেন ইতিহাস হইতে। উনিশ শতকের ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে সংকীর্ণ মনোভাব আমরা দেখিয়াছি তাহাকে ঠিক নীতিবাদ বলা যায় না। কেন না তাহাদের মধ্যে একটা সংকীর্ণ আচারবাদী ধর্মবিশ্বাস থাকিলেও তাহাদের সংস্কৃতি মূলত সুনীতি প্রণোদিত ছিল না। সর্বকালেই একটা সংকীর্ণ অনুদার ভব্যতার উপাসকের দল পাওয়া যায়, যাহারা ফিলিস্টাইনেরই সমধর্মী। উনিশ শতকের ইংরেজ গৃহস্থ সেই দলেরই ছিল। তেমনই দ্বিতীয় চার্লস-এর কালে লণ্ডনে, অথবা জাতীয় অধঃপতনের নানাযুগে পারিস শহরে যে একটা উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-সুখ সন্ধানীর দল উঠিয়াছিল, তাহাদিগকেও সুন্দরের উপাসক নাম দেওয়া যায় না, কেন না তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নীতির বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অবাধ আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ। শ্রীঅরবিন্দ ইহাদিগের বৃত্তিকে bastard æstheticism বা বিকৃত সৌন্দর্যবোধ বলিয়াছেন। তেমনই আবার, ক্রমওয়েলের যুগের ইংরাজ সমাজকে নীতিবাদী বলিলে অত্যুক্তি হয়। কেননা তথায় সুনীতি ও শুচিবায়ুর আড়ম্বর বিস্তর থাকিলেও মূল প্রেরণা ছিল একটা গোঁড়া সংকীর্ণ ধর্মমত। ধর্ম একটা আলাদা জিনিস। নীতিবাদ বা সৌন্দর্যবাদের সঙ্গে তার বিচার করা যায় না। এই দুই ধারার সংস্কৃতির বিশুদ্ধ আদর্শ খুঁজিতে হইলে আমাদের যাইতে হয় প্রাচীন গ্রীস ও রোমে।

গণতান্ত্রিক রোমে, গ্রীসীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে জাতীয় মনোবৃত্তির এক অপরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল। রোমকেরা 'সার বুঝিয়াছিল জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন ও সেই সাম্রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, আইনকানুনের বিধান। এ সমস্ত কাজ করিতে হইলে বিশেষ প্রয়োজন চরিত্রবল ও আত্মসংযমের। তাই তৎকালীন রোমে চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। সে-শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনে সৌন্দর্যচর্চার বালাই ছিল না,

যুক্তিবিচারের বিশেষ স্থান ছিল না, ধর্মের প্রেরণাও ছিল না। সে-রোমে ধর্ম যাহা ছিল, তাহা কুসংস্কার ও আচারবাদ, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রভাব ছিল না সভ্যতা সংস্কৃতির উপর। মোট কথা, একটা কঠিন নীতিবাদের সম্মুখে রোম আনন্দে বলি দিয়াছিল তাহার যুক্তিবুদ্ধি, ধর্ম, জ্ঞান ও সৌন্দর্য বোধ। তবে এই প্রকার নীতিবাদের সঙ্গে শুচিবাই-এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। পুরানো রোমে বা গ্রীসের স্পার্তারাজ্যে যাহাকে আমরা দুর্নীতি কদাচার বলি তাহা বিস্তর ছিল। তাহাদের নীতিবাদে সার পদার্থ ছিল সংকল্প, চরিত্র, আত্মসংযম আত্মকর্তৃত্ব। সকল সাম্রাজ্যবাদেই এই লক্ষণগুলি দেখা যায়। রোম যতদিন পারিল গ্রীসীয় প্রভাবকে ঠেকাইয়া রাখিল, গ্রীসীয় কলাচর্চা ও দার্শনিক গবেষণাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অবশেষে হার মানিতে হইল। পরবর্তী যুগের রোমে সৌন্দর্যবোধও যথেষ্ট বিকশিত হইল, কাব্য দর্শনাদির আলোচনাও অনেক বাড়িয়া উঠিল।

স্পার্তার লোক জাতিতে হেলেনীয় হইলেও কাঠখোট্টা মানুষ ছিল। তাহাদের শিক্ষা সংস্কৃতির মধ্যে ললিতকলার একমাত্র নিদর্শন ছিল সামরিক কবিতা ও সঙ্গীত। তাহারও শিক্ষক আনাইতে হইত আথেন্স হইতে। মানবের ইতিহাসে শুদ্ধ নীতিবাদী সংস্কৃতিগুলির পরিণামও আশ্চর্য ! তাহারা টিকিতে পারে নাই কোথাও। হয় তাহারা সময় ফুরাইলে স্পার্তার মত নিঃশেষে নির্মূল হইয়া গিয়াছে, নয়ত প্রাচীন রোমের মত পরবর্তী যুগের যথেচ্ছাচারের তাণ্ডবের মধ্যে পড়িয়া তলাইয়া গিয়াছে। মানব মন চায় চিন্তা করিতে, অনুভব করিতে, ভোগ করিতে। সে চায় বৃদ্ধি ও প্রসার। দড়ি-দড়া সে মানিয়া লয় শুধু তাহার আপন প্রসার ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, তাহার দিগ্‌দর্শনের জন্য। মানুষের যথার্থ প্রয়োজন স্বাধীন বুদ্ধিবিকাশের। সে এমন কোন সমাজকে সুসংস্কৃত বলিয়া মানিবে না

যেখানে এ বস্তু নাই, যতই কেন তাহার কঠিন নৈতিক বন্ধন থাকুক, যতই কেন তাহার অবিমিশ্র সুন্দরের অনুভূতি থাকুক।

তাই, শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, আমরা পূর্ণসংস্কৃত নাম দিই সেই সমস্ত যুগের বা সেই সমস্ত সভ্যতার যেখানে অপর শতদোষ সত্ত্বেও মানবের স্বাধীন অভিব্যক্তি অব্যাহত থাকে, এবং প্রাচীন আথেন্সের মত যেখানে গভীর চিন্তা, অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য-বোধ ও আনন্দময় জীবনধারা হয় মানুষের লক্ষ্য। কিন্তু এই আথেন্সেও দুটি বিভিন্ন যুগে মানব-সভ্যতা দুই রকমে সার্থক হইয়াছিল। প্রথম যুগে, সৌন্দর্যের চর্চা ও ললিতকলার অনুশীলন—দ্বিতীয় যুগে, দার্শনিক গবেষণা ও গভীর মননশীলতা।

প্রথম যুগের লক্ষণ ছিল সুন্দরের উপলব্ধি, স্বাতন্ত্র্য ও ভোগসুখ। এই যুগের অথেনীয়েরা যে চিন্তা করিত না তা নয়, তবে তাহাদের চিন্তার বিষয় ছিল কাব্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, স্থাপত্য, মূর্তিগঠন ও সুন্দর কল্পনার অনুধাবন। নৈতিক ব্যবস্থা ছিল, তবে তাহার পশ্চাতে একটা যথার্থ সুনীতির প্রেরণা বা আদর্শ ছিল না। সুনীতি-দুর্নীতি নির্ধারিত হইত আচার বা প্রথা অনুসারে, সৌন্দর্যবোধের নির্দেশে। তাই ইহাদের ধর্মের মূলেও ছিল আনন্দ ও সুন্দরের উপভোগ, শুষ্ক নীরস ন্যায়ান্যায় বোধ নয়। ক্রিয়া-কর্ম উৎসবাদি যা পরিকল্পিত হইয়াছিল, সবই ছিল মনোরম, আনন্দের ও ভোগের অনুকূল। কিন্তু চরিত্রবল ও দৃঢ় শৃঙ্খলাবন্ধন নহিলে কোন সংস্কৃতি ত টিকিতে পারে না। আথেন্সেরও তাই হইল। একটি শতাব্দীর অপূর্ব সুন্দর জীবনের পরেই আসিল অবসাদ,—আর শক্তি রহিল না, সংকল্প রহিল না, সৃজনী প্রতিভা লোপ পাইল। আথেনীয় সভ্যতা কিছুকাল বাঁচিয়া রহিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শকে আশ্রয় করিয়া। সৌন্দর্য ও ভোগচর্চার স্থান লইল সত্যের অন্বেষণ এবং মনস্তত্ত্ব ও নীতিবিজ্ঞানের নীরস অনুশীলন। কিন্তু তাও ভাবন-মননেই আবদ্ধ রহিল, কার্যত জীবনযাত্রাতে কোনরূপ

বিধিব্যবস্থা বা শৃঙ্খলা-বন্ধন আনিতে পারিল না। তথাপি এই পতনোন্মুখ গ্রীসের স্তোইক দুঃখবাদী চিন্তাধারা ও তাহার কঠোর সংযমই পরে রোমক-দিগকে বাঁচাইয়া রাখিল তাহাদের সাম্রাজ্য-যুগে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে।

শুধু রসচর্চা বা ভোগের দিক হইতে জীবনটাকে দেখিলে যে জীবনের সার্থকতা আসে না, তাহা বেশ বোঝা যায় ইতালীর নবজন্ম-যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে। এই নবজন্মকে জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন বলা হয় বটে, কিন্তু বস্তুত ইতালীতে ইহার প্রকৃত স্বরূপ ছিল চারুশিল্প ও কাব্যকলার অনুশীলন, ভোগের চর্চা, সুন্দরের অনুভূতি। এই যুগের ইতালীয়েরা সুনীতি-দুর্নীতির ধার ধারিত না, বরং তাহাদের চালচলন প্রথম শতকের বাদশাহী আমলের মতই নীতিবিরোধী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চা যে ইহাদের ছিল না তা নয়, তবে সে-স্পৃহা ও সে-চর্চা গ্রীসের মত যথার্থ সত্যানুসন্ধান ও উন্নত যুক্তিতর্কের কোঠায় উঠিতে পারে নাই। তথাপি এই মনোভাব হইতেই ধীরে-ধীরে উদ্ভূত হইল টিউটন জাতিগণের মধ্যে ধর্ম-সংস্কারের প্রবল প্রবৃত্তি, পোপের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ধর্মসম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ঘোষণা। এই ধর্মসংস্কারের মূলে যুক্তিবিচারের বিদ্রোহ ততটা ছিল না, যতটা ছিল নীতিবাদ ও সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধি। সংস্কৃতির নবজন্ম বা ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা কোনটাই পতনোন্মুখ ইতালীর কোন উপকার করিতে পারিল না। যেখানে সংযম, শৃঙ্খলা, চরিত্রবল নাই, সেখানে ধ্বংস অনিবার্য। দুর্ভাগ্য, ইতালীকে অপেক্ষা করিতে হইল তিন শতাব্দী সেই দিনের জন্য, যেদিন মনীষী মাৎসিনি আসিয়া ইতালীয়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন কঠোর আত্মসংযম ও দৃঢ় সংকল্পের আদর্শ।

শুদ্ধ নীতিজ্ঞান কি শুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ, এর কোনটাই মানুষকে করিয়া তুলিতে পারে না পূর্ণ মানুষ। একটাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণতা লাভ সম্ভব নয়। দুইটারই প্রয়োজন আছে মানবের অভিব্যক্তির পথে। শুদ্ধ নীতি-

পরায়ণতাকে জীবনব্যাপারের বায়ো আনা ভাগও বলা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, যে-সংযম, যে-সংকল্প, যে-চরিত্রবল নীতিজ্ঞানের সার বস্তু, তার একান্ত আবশ্যক আছে মানবজীবনে। অপর পক্ষে তেমনই মানবের জীবনে বিস্তর প্রয়োজন আছে সৌন্দর্যবোধের, কেন না সত্য সুন্দর ও আনন্দের সন্ধান না পাইলে মানব-স্বভাব পূর্ণ হইবে কিরূপে? নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ দুইয়েরই সমান আবশ্যক মানবের অভিব্যক্তিতে। এক দিকে সুন্দর ও আনন্দের উপলব্ধি নীতিবোধকে নীরস সংকীর্ণতার হাত হইতে বাঁচাইতে পারে, উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। অপর দিকে তেমনই ভোগময় ও আনন্দময় জীবন সংকল্প তথা আত্মসংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে বিশুদ্ধ থাকিবে, দৃঢ় হইবে, স্থায়ী হইবে। আমাদের মনোময় সত্তার দুই তত্ত্ব—তপস্ ও আনন্দ—এইরূপে পরস্পরের সহায়তা করিতে পারিবে; এক তত্ত্ব দিবে মহত্ত্ব, অপর দিবে বৈচিত্র্য। তবে এই সাহায্য, এই বোঝাপড়া আসিতে পারে যদি উভয়েই মানিয়া লয় এক উচ্চতর তৃতীয় তত্ত্বকে, যদি উভয়েই অনুপ্রাণিত হয় এই উন্নততর তত্ত্বের দ্বারা। মানবের সূক্ষ্মবুদ্ধি, তার যুক্তিবিচার, এই তৃতীয় তত্ত্বের সন্ধান জানে ও মানবকে তাহা বলিয়া দিতে পারে।

একাদশ

বুদ্ধিবৃত্তি (১)

বর্তমান মানবের সর্বোচ্চ বৃত্তি তাহার যুক্তিবুদ্ধি। অপর জীবের সহিত তাহার প্রভেদই এইখানে। এই বৃত্তির সাহায্যে সে তাহার সত্তার ও তাহার জীবনধারার বিধান, তাহার ক্রমোন্নতির তত্ত্ব নিয়ত অনুসন্ধান করিতেছে। ইতর প্রাণীর জীবন চালিত হয় অভ্যাসবশে, সহজাত বুদ্ধির প্রেরণায়, অনেকটা যান্ত্রিক ভাবে। তাহাদের ক্রমবিকাশ সমষ্টিগত। কোন পশু, পক্ষী বা কীট ভাবিয়া চিন্তিয়া আপন ক্রমোত্তরণের অনুকূল বা প্রতিকূল কোন কাজ করে না, তাহারা প্রকৃতির আজ্ঞাধীন দাস। অপর পক্ষে মানুষ চায় স্বাধীন হইতে, সে চায় আপন জীবনের নিয়ন্তা হইতে, প্রকৃতির প্রভু হইতে। অবশ্য এও তাহার প্রকৃতির অনুযায়ী, এই তাহার মানবত্বের গূঢ় মর্ম। প্রকৃতি ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া আপনাকে জানিতে, সংশোধন করিতে, গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতেছেন। যাহা জড়ে, উদ্ভিদে, নিম্নপ্রাণীতে সুপ্ত ছিল, তাহা এখন জাগিয়াছে। অবশ্য, সবের পশ্চাতে যে আত্মা আছে সে আজও প্রসুপ্ত। ক্রমবিকাশের পথে সেও একদিন প্রকট হইবে। তবে পথ সুদীর্ঘ, যদিচ নিয়তি-নির্দিষ্ট।

আপাতত মানুষ বুদ্ধিবলে আপন জীবনকে গড়িয়া তুলিতেছে। তথাপি এই বুদ্ধিবৃত্তি তাহার একমাত্র জ্ঞানার্জনের উপায় নয়। তাহার অনুভূতি, কল্পনা, প্রেরণা, সংকল্প, কর্ম, সবেরই মধ্যে একটা সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তি আছে, যদিচ প্রত্যেকটির বিধান ও প্রণালী স্বতন্ত্র এবং সে-বিধান বা সে-প্রণালী যুক্তিবুদ্ধি প্রণোদিত নয়। তবে বুদ্ধি ইহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কেন না সে ক্রিয়ার বাহিরে নির্বিকার দাঁড়াইয়া ক্রিয়ার তত্ত্ব ও প্রণালীর বিচার করিতে পারে। কল্পনা-প্রেরণাদি তাহা কখন পারে না, তাহারা

আপন ক্রিয়ার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে দেখিতেই পায় না, অগ্রপশ্চাৎ তাহাদের নজর চলে না। সহজাত বুদ্ধির কথা কতকটা স্বতন্ত্র, কেন না তাহার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আছে, আবেষ্টনের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা আছে, যাহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। তবে ইহাদের কোনটাই মানুষের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিবে না, কারণ আত্মার জাগৃতি বা বিকাশের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই। মানুষ চায় তাহার মুক্ত বুদ্ধির বলে চিন্ময় আত্মশক্তির ক্রিয়াসমূহের নিরীক্ষণ, সামঞ্জস্য বিধান ও তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার।

বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষত্ব এই যে সে তাহার আপন ক্রিয়ার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় না, ক্রিয়ার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার বিচার করে—কখন গ্রহণ করে, কখন করে না—অদলবদল করে, সংশোধন করে—কোথাও রাশ টানিয়া ধরে, কোথাও ছাড়িয়া দেয়। এই সবের মধ্য দিয়া ধীশক্তি মানুষকে লইয়া চলিয়াছে তাহার ঈপ্সিত সুচিন্তিত সুশৃঙ্খল পূর্ণতার দিকে। মানবের এই বৃত্তিকে বিজ্ঞানও বলা যায়, চারুকলাও বলা যায়, উদ্ভাবনও বলা যায়। ইহার কাজ একদিকে যেমন ক্রিয়াকলাপের নিরীক্ষণ, তাহার বিধিবিধানের অনুধাবন, অপরদিকে তেমনই অনুমান ও কল্পনার আবাহন ও তাহার সাহায্যে জ্ঞানের প্রসার ও প্রগতি। ধীশক্তি বাহ্যরূপের অন্তরালে অবস্থিত সত্যকে প্রকট করে, ব্যাবহারিক উপযোগিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ সত্যকে দেখে। তাই ইহাকে মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলা হয়।

আধুনিক কালে কিন্তু বুদ্ধির এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে। ধীশক্তি যেন আপনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, যেন সে মানব সত্তার অধস্তন শক্তিগুলিকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইতেছে। এতদিন তাহার নানারূপ ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ছিল রাজা, মালিক, বিধাতা। এক প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার ছিল ধর্ম, অনেক সময়ে যুক্তিবুদ্ধিকে মাথা

নত করিতে হইত ধর্মবিশ্বাসের সম্মুখে। কিন্তু তাহা চলিল না, ক্রমশ মানুষ ধর্মের নির্দেশকেও বুদ্ধি দিয়া যাচাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। কল্পনা, আবেগ, সুনীতি, ললিতকলা, ইহারাও কতকটা স্বাধীনতার দাবি করিত। কিন্তু তাহাদের দাবিও পুরাপুরি টিকিল না। তাহারাও বুদ্ধিকে বিচারক বলিয়া মানিয়া লইল, অংশত তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। আজ কিন্তু ধীমান মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে বার-বার, যে এই বিরাট, গভীর, জটিল, রহস্যময় জীবনকে কি তাহার ধীশক্তি পূর্ণভাবে ধরিতে পারে? তাহার মনে হইতেছে যেন বুদ্ধি অপেক্ষাও বড় দেবতা কেউ আছেন।

কাহারও-কাহারও মতে প্রাণশক্তি কি প্রাণের গূঢ় সংকল্পই এই দেবতা। তাঁহারা বলেন যে বুদ্ধির কাজ এই সংকল্পের আজ্ঞানুবর্তন মাত্র; আবার একথাও বলা হয় যে যুক্তিবুদ্ধি তাহার সংকীর্ণ বিশ্লেষণ, তাহার কঠিন শ্রেণী-বন্ধনের দ্বারা জীবনকে মিথ্যা করিয়া তোলে। বুদ্ধি অপেক্ষা বিশালতর গভীরতর এমন সব জ্ঞানশক্তি আছে, বোধির মত, যাহারা মানবজীবনকে তাহার নিগূঢ় সংকল্পের, বিরাট সত্যের সহিত সুসমঞ্জস ভাবে চালাইতে পারে। বস্তুত মানুষের অন্তর্মুখী মন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাহার জীবনের যথার্থ দেবতা, যথার্থ প্রভু তাহার আত্মন্,—যুক্তিবুদ্ধি তাহার অমাত্য হইতে পারে, প্রভু হইতে পারে না।

ধীশক্তির উচ্চতম কাজ শুদ্ধ জ্ঞানের অনুশীলন। জ্ঞানকে যদি শুধু তাহার আপনার জন্য অনুধাবন করা যায়, যদি গৌণ উদ্দেশ্য কিছু না থাকে, তবেই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পরে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগান যাইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে যদি প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় ত তার ফল হয় লব্ধজ্ঞানের সসীমতা, অপূর্ণতা, সত্যের বিকৃতি। তবে এরূপ করিলে কার্যত একটা সীমার মধ্যে খুব ফল পাওয়া যাইতে পারে বটে। কিন্তু সেই সীমার বাহিরে সে-জ্ঞান উপযোগী হইবে না। পশুপক্ষীর সহজাতবুদ্ধির খেলাতে এই সসীমতা বেশ

দেখা যায়। সত্য বলিতে, সাধারণ মানুষ এইভাবের বুদ্ধি প্রয়োগ করে, একটা বিশিষ্ট কার্য সাধনের জন্য। ধীমান ভাবুক মানুষও সাধারণত তার বুদ্ধিকে লাগায় কতকগুলি বিশিষ্ট কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য। সেই গণ্ডীর বাহিরে সে সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়া চলে, যতটুকু লইতে বাধ্য হয় শুধু সেইটুকু গ্রহণ করে। মোটামুটি মনোময় মানবের যুক্তিবুদ্ধির এই সীমা। সে কয়েকটা মাত্র কাম্য বস্তুর অনুধাবন করে; তাহার সঙ্গে অসমঞ্জস যাহা কিছু সত্য—জীবনের, সত্তার, নীতির, সুষমার, যুক্তির, এমন কি আত্মার পর্যন্ত—তাহা সে পদতলে দলিয়া চলে, কি একপাশে ঠেলিয়া ফেলে। যদি স্বীকার করে ত বড় জোর নামে মাত্র। এই তাহার জীবনের গোঁজামিল।

কিন্তু যে-মানুষ জানে যে তাহার কর্তব্য স্পষ্টভাবে আপনার এবং সর্বভূতের সত্যকে ও ধ্রুবতত্ত্বকে জীবনে ব্যক্ত করা, এবং সেজন্য সে সদা চেষ্টিত, সেও বড় একটা পারে না তাহার বুদ্ধিকে পূর্ণরূপে ও স্পষ্টরূপে কাজে লাগাইতে। কেন না সেও তাহার আপন মানসকল্পনার দাস। এই কল্পনাসমূহ হইয়া দাঁড়ায় তাহার স্বার্থ, তাহার আসক্তি, তাহার সংস্কার, তাহার বন্ধন। সে স্বাধীনভাবে তাহাদের কথা ভাবিতে পারে না, তাহাদের সসীমতা দেখিতে পায় না, অপরের কল্পনা ও আদর্শের মূল্য বুঝিতে সে অক্ষম। এই ভাবে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, অন্ধ সংঘর্ষ বাধিয়া যায়, বংশপরম্পরায় চলিতে থাকে, সত্য কোথায় দূরে পালাইয়া যায়। কিছুদিনের জন্য এ জয়ী হয়, বা ও জয়ী হয়, কিন্তু ফলে আসে শুধু নৈরাশ্য, ভুল্ল ভাঙা। এই আংশিক ও অপূর্ণ কল্পনাসমূহ, ইহাদের সাফল্যও লইয়া আসিতে বাধ্য নৈরাশ্য। কেন না ইহাদের পশ্চাতে ত সমগ্র সত্যের অনুভূতি নাই। ইহাদের বিধিবিধান জীবনকে বাঁধিতে পারে না। এই কারণে মানুষের সকল সংঘটন, সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হইয়াছে। তাহার যুক্তিবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বা সুশৃঙ্খলভাবে জীবনকে

ধরিতে পারে নাই! আপন আদর্শ ও আপন কল্পনাকেই সে জীবনের সমগ্র সত্য বলিয়া দাবি করিতে গিয়াছে, গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, পরিশেষে সব চুরমার করিয়াছে। একটার পর একটা নূতন চেষ্টা ও পরীক্ষা-প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে সফলতার মোহে, কিন্তু সবই বিফল হইয়াছে। তথাপি এই সমস্ত বিফলতার পিছনে নিহিত আছে একটা বিশ্বাস যে যুক্তিবুদ্ধি একদিন জয়ী হইবে, শুদ্ধ হইবে, বৃহত্তর হইবে, অবশেষে জীবনকে বশে আনিবে। বাসনা-কল্পনার সমস্ত ঝুটোপুটির মাঝে সর্বদা রহিয়াছে পণ্ডিতজনের শুদ্ধ জ্ঞানপিপাসা, সত্যের অনুধাবন, বস্তুর বিশ্লেষণ, ঘটনাবলীর গূঢ়বিধানের অনুসন্ধান। ইহারই পরিণাম গণিত বিজ্ঞান দর্শনাদি নানাবিদ্যার অনুশীলন। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই অনুশীলনের বহুল ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, মানুষ জীবনের ও জড়প্রকৃতির তত্ত্ব ও বিধানের নির্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অনেক কিছু করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল বস্তু পায় নাই। ভিতরের রহস্য এখনও অজ্ঞাত। যে গভীর সত্য অজানা রহিয়াছে, তাহার মধ্যেই বিশ্বব্যাপারের নিগূঢ় উৎস, সকল রহস্যের মূলাধার। বুদ্ধি তাহার সন্ধান দিতে পারিবে কিরূপে! ধীশক্তি আপন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, সে জীবনের জটিলতা, বৈশাল্য ও গভীরতার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম। সমগ্রকে সে খণ্ড-খণ্ড করিয়া, কৃত্রিম শ্রেণীনিবদ্ধ করিয়া. তবে দেখিতে পায়। মনে হয় যেন দুটি বিভিন্ন জগৎ রহিয়াছে, বুদ্ধিগম্য ও বুদ্ধির অগম্য। এই দুই জগতের মধ্যে সেতু বাঁধা বুদ্ধির সাধ্যের অতীত। তাই তাহাকে নানারকমের জোড়াতালি মিটমাট করিয়া যাইতে হয়। বুদ্ধি অবশ্য শক্তির সহিত এই ঝুটোপুটি ছাড়িয়া দিয়া জীবনের পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করিতে পারে। তখন তাহার কাজ হইবে জীবনের স্বার্থ, আসক্তি, সংস্কারের তরফে ওকালতি করা, আসক্তি-সংস্কারকে যুক্তির সাজে সজ্জিত করা। অথবা সে পারে নানা নিয়ম বাঁধিয়া জীবনকে সাবধান করিয়া দিতে যাহাতে তাহার সংস্কার-আসক্তি খুব

বড় রকমের ভুলচুক না করিয়া বসে। কিন্তু এ ত বুদ্ধির স্থায্য কাজে ইস্তফা দেওয়া হইল! আবার মানুষ এরূপও করিতে পারে যে আপন বুদ্ধিকে জীবনের বাস্তবের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনধারার ঘটনা, তত্ত্ব ও প্রণালী সমূহকে পর্যবেক্ষণ করিবে, কিন্তু বাস্তব ছাড়িয়া তাহাকে বেশী ঊর্ধ্বে উঠিতে দিবে না, অজানা প্রদেশে বেশিদূর অগ্রসর হইতে দিবে না। এও বুদ্ধির স্থায্য অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কেন না এরূপে মানুষ তাহার idealism ছাড়িয়া দিল; সে চিরদিনের জন্য মাটির মানুষ রহিয়া গেল, ঊর্ধ্বলোকের সত্য আর তাহার মনের মধ্যে অবতরণ করিবে না। তবে এ অবস্থায় মানব দীর্ঘকাল তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার স্বভাবই তাহাকে বাস্তব ছাড়িয়া উপর পানে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে। কল্পনারাজ্যের বাহিরে সে পড়িয়া থাকিতে চাহিবে না। তাহার প্রকৃতিই এই যে সে আপনাকে অতিক্রম করিয়া আপাত-অসম্ভব অজ্ঞাতের দিকে অগ্রসর হইবে।

অপরপক্ষে, ধীশক্তি যখন ঊর্ধ্বে ওঠে তখন সে বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। পক্ষপাতহীন আসক্তিহীন জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ এত উচ্চে উঠিয়া যায় যে তাহার আর কার্যকরী বুদ্ধি থাকে না, ইহজগতের ব্যাপারে আর সে যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারে না। মানবের বুদ্ধি স্বরচিত বিধিবিধানের নাগপাশে বাঁধা পড়ে। ভাবরাজ্যে আটক হইয়া যায়, জটিল বাস্তব জীবন বাহিরে পড়িয়া থাকে। দার্শনিক, ভাবুক, কবি, চারুশিল্পী, সবাই এই গোল বাধায়। তাহাদের স্বকল্পিত ধারায় জীবন চালাইতে গিয়া মানুষকে অগাধ জলে ডোবায়। ইহাদের প্রভাব যথেষ্ট আছে বটে, তবে সে প্রভাব পরোক্ষ। যাহাদের আমরা practical, কাজের লোক বলি, তাঁহাদের নির্দেশকেও জীবন-সংকল্প গড়িয়া পিটিয়া লয়, ইচ্ছামত রূপদান করে। Practical কর্তা ভাবেন এক, ফল হয় অন্যরূপ।

মানব-সমাজে ভাব ও ভাবুকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ভাব, কল্পনা,

আদর্শই ত জীবনের রস, ইহারাই মানব জীবনকে ঊর্ধ্বমুখী করে। কিন্তু মানসিকে প্রণালী-পদ্ধতির নিগড়ে বাঁধিলেই গোলযোগ। জীবন বাঁধন ফসকাইয়া পালায়, পালাইয়া এমন রূপ ধারণ করে যে তাহাকে মন আর চিনিতেও পারে না। ইহার কারণ বোঝা কঠিন নয়। মূল কারণ এই যে জীবনের ভিত্তি এমন এক শাশ্বত সত্তা যাঁহাকে বুদ্ধি কখন ধরিতে পারে না। সকল বস্তুর পিছনেই রহিয়াছেন এই সত্তা, বস্তু যাঁহাকে আপন রীতিতে খুঁজিতেছে। সসীম সব কিছু ব্যক্ত করিতেছে সেই অসীমকে, যাহা তাহার চরম ও নিগূঢ় সত্য। অনন্ত নিরালম্ব আপনাকে নানা ব্যক্তিতে, নানা শ্রেণীতে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাকে সসীম বুদ্ধি কেমন করিয়া ধরিবে?

এই গোলযোগ চরমে উঠিয়াছে মানুষে। কেন না ব্যক্তিগত মানুষ বলিলে শুধু সমগ্র জাতির একজন মাত্র বোঝায় না। সে তাহার অন্তরস্থ অনন্ত অসীমেরও অভিব্যক্তি। বুদ্ধিগত সংকল্প আজিকার অবস্থায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ করণ হইলেও সে অন্তঃপুরুষের মালিক ত নয়! তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি তাহার মন্ত্রী বা উপদেষ্টা বা মধ্যস্থ হইতে পারে, একাধিপতি হইতে পারে না। মানবের চেতনা যখন আপন ধীশক্তিকে ছাড়াইয়া উঠিবে, যখন মালিককে চিনিবে, তখনই সে স্বাধীন হইবে, প্রভু হইবে।

দ্বাদশ

বুদ্ধিবৃত্তি (২)

আমাদের যুক্তিবুদ্ধি যখন আমাদের একচ্ছত্র রাজা নয়, মন্ত্রীমাত্র, তখন সে আমাদের দেহপ্রাণাদি অধস্তন তত্ত্বগুলির সর্বেসর্বা নিয়ন্তা হইতে পারে না। তবে এই তত্ত্বসমূহের ঊর্ধ্বতন স্তরে উত্তরণের পথ সুগম করিবার জন্য যে সব সাময়িক বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা সে অবশ্য করিয়া থাকে। যথার্থ সর্বনিয়ন্তা মানুষের আত্মন—তাহার বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক গভীর তত্ত্ব। সেই পারে মনোবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে সর্বথা পূর্ণ করিতে।

ইতিমধ্যে বুদ্ধি আপন কাজ করিতেছে—মানুষকে লইয়া চলিয়াছে উচ্চতর আত্ম-চেতনার সিংহদ্বারের পানে। সেখানে পৌছিলে তাহার চোখের বাঁধন খসিয়া পড়িবে, জ্যোতির্ময় দেবদূত তাহাকে হাতে ধরিয়া মন্দিরের ভিতরে লইয়া যাইবে না। মানুষের অধস্তন শক্তি-বৃত্তিগুলি প্রত্যেকে আপন-আপন কাজ লইয়া মশগুল—প্রত্যেকে আপন প্রেরণা অনুযায়ী কলের মত কাজ করিয়া চলিয়াছে। বুদ্ধি তাহাদিগকে শেখায় নিজেকে বুঝিতে, নিজের মধ্যের শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচকে জানিতে, আপন গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পরস্পরকে চিনিতে, একটা দীপ্ততর জ্যোতির পানে চাহিতে। সে সুন্দরের অনুভূতিকে সুনীতির সংস্পর্শে আনিয়া তাহাকে সশক্ত ও সংযত করে; শুষ্ক নীতিবাদকে সুন্দরের সংস্পর্শে আনিয়া তাহাতে মধুর রস সঞ্চারিত করে। এইরূপে কত রকমে মানুষের বুদ্ধি তাহার নানামুখী কর্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুসঙ্গত সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছে! কিছুকাল পরে কিন্তু মানুষের মন বুঝিতে পারে যে নিয়মের বড় বাঁধাবাঁধি হইতেছে, বিধিবিধানের ডোরে আবদ্ধ হইয়া তাহার মানবত্ব যেন খর্ব হইতেছে। তখন সেই ধীশক্তিই আবার লাগিয়া যায় মানুষের বন্ধন মোচন করিতে। মনের মধ্যে তাহার বিভিন্ন বৃত্তিসমূহের বিদ্রোহ জাগিয়া

ওঠে, সংশয় আসে। ইহাতে প্রথমটা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে বটে! কিন্তু কল্পনা, অন্তর্দৃষ্টি, আত্মজ্ঞান ইত্যাদির প্রভাবে ধীরে-ধীরে পুরাতন ধারা চলিয়া গিয়া নূতন-নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধির এই দুই-মুখী ভাঙাগড়ার কাজ চিরকাল চলিয়াছে—একবার নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দেওয়া, আবার সেই নিয়ম বাতিল করা, ইহারই মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি অগ্রসর হইতেছে।

তবে ধীশক্তির কাজ শুধু বহির্মুখী ও অধোমুখী নয়, তাহার ঊর্ধ্বমুখী ও অন্তর্মুখী গতিও আছে। ঊর্ধ্বলোকের সত্যের দিকে তাহার দৃষ্টি সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেখানে সে দেখিতে পায় মানবসত্তার বিশ্বগত রূপ, বুঝিতে পারে তাহার অভিব্যক্তির যথার্থ লক্ষ্য। যাহা সে সেখানে দেখে, বোঝে, তাহাকে সে তখন বুদ্ধিগম্য রূপ দেয়। এইভাবে মানুষ পায় তাহার বড়-বড় কল্পনা ও আদর্শ, যাহারা আপন শক্তিবলে তাহার জীবনকে গড়িয়া তোলে। এই সব বিরাট ভাবনা-কল্পনাগুলির রূপ বুদ্ধিগঠিত হইলেও ইহারা সত্যের ঊর্ধ্বলোক হইতে অবতীর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহারা মানবমনের আধ-আঁধারে অবতীর্ণ হইয়া যে মূর্তি ধারণ করে, তাহার পরিণাম হইয়া দাঁড়ায় বিপরীত রকমের। কল্পনায়-কল্পনায়, আদর্শে-আদর্শে, এমন বিরোধ সংঘর্ষ লাগিয়া যায় যে কোনরূপ সঙ্গতিসাধন কঠিন হইয়া পড়ে। মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে, মানবের সত্তাতে, কর্মে, সর্বত্র বুদ্ধি এইরূপ নানা অসমঞ্জস আদর্শ ও তত্ত্ব আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। ব্যক্তিবাদ ও রাষ্ট্রবাদ—স্বাতন্ত্র্য ও শৃঙ্খলা—সুনীতি ও সুষমা—ত্যাগ ও ভোগ, ইহার প্রত্যেকটিকেই মানুষ গ্রহণ করিয়াছে, সার্থক করিতে চাহিয়াছে, পারে নাই, ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি আদর্শ ছাড়িয়াছে, আর একটিকে ধরিয়াছে, করিতে পারে নাই জীবনসমস্যার সমাধান। সামঞ্জস্য সাধিতে চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। পারিবে কেমন করিয়া, সঙ্গতিসাধন করিতে হইলে যে তাহাকে বৃহত্তর

উচ্চতর চেতনাতে উঠিতে হইবে! তথাপি একথা নিশ্চিত যে এইরূপে বিরোধ-ভঞ্জনের একাগ্র চেষ্টা করিতে-করিতে সমগ্র মানবজাতি সেই বিশালতর চেতনার অভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে।

তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে যে ব্যষ্টি তথা সমষ্টিগত মানব যেমন একদিকে ঊর্ধ্বলোক হইতে দীপ্তির আবাহন করিতেছে, অপরদিকে তেমনই সেই দীপ্তির প্রকাশকে সুসঙ্গত করিবার জন্ম সদাই চেষ্টা করিতেছে। তাহার আত্মন ও তাহার বাহ্য কর্ম দুইয়ের মাঝে ক্রিয়মান তাহার ধীশক্তি ও সংকল্প। মানুষ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল অতি সামান্য প্রাণীরূপে, তাহার সহজাত বুদ্ধি ও প্রেরণা লইয়া। ক্রমশ সে নিজেকে বুঝিল, চিনিল, নিজেকে সংযত করিতে শিখিল। সহজাত বুদ্ধির স্থানে আসিল কল্পনা-ভাবনা-শক্তি, পাশব প্রেরণার স্থানে জাগ্রত হইল যুক্তিবুদ্ধিচালিত সংকল্প। কিন্তু সমগ্রবুদ্ধি তাহার নাই, সমগ্রভাবে কাজ করার ক্ষমতাও তাহার নাই। তাই তাহার প্রগতি চলিয়াছে খণ্ড-খণ্ড ভাবে, আগু-পিছু হটিতে-হটিতে, নানা বৃত্তির যথাসাধ্য সামঞ্জস্য সাধন করিতে-করিতে। মানুষকে যে শুধু তাহার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরস্পরসঙ্গতি সাধিতে হয় তাহা ত নয়, প্রত্যেক ক্ষেত্রের মধ্যে আবার ছোট-ছোট বিরোধ মিটাইয়া শৃঙ্খলা আনিতে হয়। জীবনকে সুনীতিসঙ্গত করিবার জন্য তাহাকে নানা বিরোধী-প্রেরণা বিচার করিতে হয়। ত্যাগ না ভোগ, প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি. কর্ম না নৈষ্কর্ম্য, এইরূপ কত কি নৈতিক প্রেরণার মাঝে সে নিয়ত দোল খাইতেছে! তাহার রাষ্ট্রনীতিক প্রগতি নির্ভর করিয়া আসিয়াছে বহু বিরোধী আদর্শের উপর—রাজতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, বণিকতন্ত্র, সেনানীতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, গণতন্ত্র—ব্যক্তিবাদ, সমষ্টিবাদ, মধ্যবিত্ত-প্রাধান্য—অদূরে নৈরাজ্যবাদ। সবের পশ্চাতেই জটিল মানবপ্রকৃতির কোন-না-কোন সত্য রহিয়াছে, মানুষের কোন শক্তি বা ভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা খুঁজিতেছে। এই নানা তন্ত্র মানুষের মধ্যে

ফুটাইয়া তুলিতেছে নানা স্বরূপ, স্বভাব ও চরিত্র—নানা পদ্ধতি, প্রণালী ও সংঘটন। আত্মজ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ আত্ম-সংঘটনের নানা পরীক্ষা করিতেছে। সে ক্রমাগত পুরাতন আদর্শ ভাঙিতেছে, নূতন গড়িতেছে। এই ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়া মানবজাতি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে।

এই দিক দিয়া দেখিলে আমরা বুদ্ধির ক্রিয়া বেশ বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে বুদ্ধিবৃত্তির দুইটি গতি আছে—অনাসক্ত ও আসক্ত। একটি শুদ্ধ অহেতুক জ্ঞানের ও সত্যের সন্ধান। অপরটি লব্ধজ্ঞানের ও উপলব্ধ সত্যের স্বার্থসাধনার্থে প্রয়োগ। মানবের সকল বৃত্তির মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান, কেন না নিম্ন-বৃত্তিগুলি আপন-আপন ক্রিয়াতেই নিমগ্ন, কিন্তু বুদ্ধি সকল বৃত্তির, সকল ক্রিয়ার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে, সকল ক্রিয়ার নিয়মন ও সামঞ্জস্য বিধান করে। জ্ঞানার্জন ত মানুষের একমাত্র কাজ নয়, তাহার প্রধান কাজ জীবনযাত্রা। সে জ্ঞান লাভ করিতে চায় প্রধানত জীবনে কাজে লাগিবে বলিয়া, শুধু জ্ঞানসঞ্চয়ের আনন্দের জন্য নয়। কিন্তু গোলযোগে বাধে এই জ্ঞানের প্রয়োগে; এইখানেই মানববুদ্ধির অপূর্ণতা তাহাকে বিরোধ ও অসঙ্গতির মাঝে লইয়া যায়। এরূপ ঘটিবার কারণ এই যে মানুষের বুদ্ধি কর্মে প্রবৃত্ত হইলে স্বার্থপর ও আসক্ত হইয়া পড়ে, আর শুদ্ধ জ্ঞানের আজ্ঞাকারী থাকে না। মন ত কখনও সম্পূর্ণ স্বার্থহীন অনাসক্ত হইতে পারে না। যতটা সম্ভব ততটাও যদি আরম্ভে থাকে, তবু তার জ্ঞানকে কার্যে প্রয়োগ করিতে গেলেই সে নানা অজানা দুর্দম শক্তির খেলায় বশ হইয়া পড়ে। যুক্তি তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। আজিকার দিনে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অপপ্রয়োগের ফলে ভয়ানক-ভয়ানক মারণ যন্ত্রসমূহের আবিষ্কার দেখিয়া এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বিরাট বিশাল সব সংঘটন আজ সম্ভবপর হইয়াছে, যাহার দ্বারা একদিকে জাতিসমূহের বিপুল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতেছে, অপরদিকে অমানুষিক অত্যাচার অনাচার কাটাকাটি চলিতেছে।

একই সঙ্গে ভূতদয়া ও নির্মম অহমিকা দুই পুষ্ট হইতেছে। একদিকে সমগ্র মানবজাতি শুধু মৈত্রী নয়, একত্বের আশায় আশান্বিত হইতেছে, অপরদিকে সেই আশা স্বার্থপর বণিকবৃত্তির ভারে বিচূর্ণ হইতেছে। দার্শনিক গবেষণা ও আদর্শবাদ মানুষকে ভালমন্দ দুইদিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ধর্মের মত বস্তুও মারামারি হানাহানির উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সত্য বলিতে, মানবের ধীশক্তি স্বভাবত অপূর্ণ জ্যোতি; সে জীবন ও কর্মকে বিশুদ্ধ দীপ্তিতে দীপ্ত করিতে পারে না। যে-সমস্ত শক্তি সে নিয়ন্ত্রিত করিতে যায় তাহাদের জালে সে আপনই জড়াইয়া পড়ে। জীবনের, সমাজের, রাষ্ট্রের সকল বিরোধী অসমঞ্জস আদর্শ ও মতবাদকেই এই যুক্তিবুদ্ধি সমর্থন করে—সকল ধর্মবিশ্বাস, সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। ভোগবাদ, নীতিবাদ, সুন্দরের অনুধাবন, সবেরই পশ্চাতে কাজ করিতেছে এই বৃত্তি।

বুদ্ধিজীবীর কাছে সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে দুই কারণে। প্রথম, সে ধরিয়া লয় যে তাহার আপন যুক্তিই অভ্রান্ত, প্রতিপক্ষের যুক্তি ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, সে স্থির করিয়াছে সে আজ ব্যক্তির বুদ্ধি যতই অপূর্ণ হউক না কেন, একদিন সমষ্টির বিচার বুদ্ধি মানুষের ভাবনা ও জীবনকে শুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত করিবে। প্রথম বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে অহমিকা ও দম্ভ। তথাপি, গুরুবর বলিতেছেন, ইহারও প্রয়োজন আছে মানবের অভিব্যক্তিতে। তাহার বুদ্ধি সমগ্র সত্যকে ধরিতে না পারিলেও কতকটা ধরে এবং যতটুকু ধরে তাহাকে কাজে লাগায়। সমস্তটা এখনই ধরিতে পারা বিধাতার অভিপ্রেত নয়। মানবকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রসার সাধিতে হইবে, এই তাহার নিয়তি। বুদ্ধিবৃত্তি এই অভিজ্ঞতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিশ্বাস ও ভরসা দিতেছে। বর্তমানের অনুভূতি, অতীতের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের স্বপ্ন, সবেরই কারণ তাহাকে জোগাইয়া দিতেছে। এইরূপে বিচিত্র উপলব্ধি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া মানুষ সত্যের অসীমতার দিকে

চলিয়াছে, তাহার ধীশক্তি তাহাকে সাহায্য করিতেছে ভাঙিতে, গড়িতে, রূপান্তর সাধিতে।

দ্বিতীয় কারণ যাহা উপরে বলা হইয়াছে তাহাও ভ্রান্ত, কিন্তু তাহার মধ্যেও কিছু সত্য আছে। যুক্তিবুদ্ধি চরম সত্যে কিরূপে পৌঁছিবে! সে যে-বস্তুর মূলে যাইতে পারে না, তাহার গভীরতম রহস্যাবলীও সে বোঝে না। সে ব্যক্তিকে পূর্ণ জীবন দিতে পারে না, নিখুঁত সমাজও গড়িতে জানে না। সর্বথা যুক্তিচালিত জীবনের স্বরূপ হইবে স্থাণু, অচল, নির্জীব। পরিপূর্ণ জীবন রাজা দিতে পারেন, মন্ত্রী পারেন না—আত্মন্ দিতে পারে, বুদ্ধি পারে না। জীবনের মূল শক্তি হয় যুক্তিবুদ্ধির নিম্নে অবস্থিত, infra-rational, নয় উর্ধ্বে উত্থিত, supra-rational.

ধীশক্তির কাজ শেষ হইবে যখন সে মানুষকে বলিতে পারিবে, "বিশ্বের তথা ব্যক্তির অন্তরে সদা প্রচ্ছন্ন আছেন আত্মন্, ঈশ্বর। তাঁহারই মন্ত্রারূপে আমি তোমার চোখ খুলিয়া দিয়াছি। এখন তোমার ও তাঁহার মধ্যে আছে শুধু আমার-আপন জ্যোতির্ময় পরদা। তাহাকে সরাইয়া দাও, দেখিবে যে মানবাত্মা ও দিব্যসত্তা এক অভিন্ন বস্তু। তখন তুমি নিজেকে চিনিবে, আপন জীবন-বিধান বুঝিবে, আমা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান ও সংকল্পের অধিকারী হইবে, জীবনের পরম রহস্য ভেদ করিবে।"

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যুক্তিবুদ্ধি ও সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে মানুষের জীবন ইতর জীবের মতই দুই মুখ্য প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীবমাত্রেই বাঁচিতে চায়, বংশবৃদ্ধি করিতে চায়—মানুষও চায়, অপর জীবও চায়। কিন্তু এ হইল মানবজীবনের কেবল একটা দিক। মানুষ এ ছাড়া আরও অনেক কিছু চায়। তাহার দেহপ্রাণ ত আছেই, উপরন্তু দেহপ্রাণকে অতিক্রম করিয়া একটা মনোবৃত্তি আছে। আর, সে-মন ইতরপ্রাণী বা পশুর অনুরূপ মন নয়; কেন না তাহার মাঝে নিরন্তর কাজ করিতেছে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, যুক্তিবুদ্ধি। তাই সে কার্য-কারণ পরম্পরা বোঝে, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করিতে পারে। তথাপি আমরা জানি যে এও তাহার চরম পরিণতি নয়। তাহার ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, সুন্দরের উপলব্ধি আছে। আবার তার চেয়েও বড় জিনিসের সে অধিকারী; কেন না সে দিব্য সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিরন্তর সেই পরম তত্ত্বের অনুধাবন করিতেছে। মানবের সুদীর্ঘ জীবনে ধীরে-ধীরে এই সমস্ত বৃত্তি তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান তিন পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ বিচার করিতেছেন যে মানুষের মনোবুদ্ধি কতদূর তাহার সহায় এই সত্যং শিবং সুন্দরং-এর সন্ধানে। বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মানব ব্যাবহারিক জীবনে অনেক কিছু করিতে পারে, করিয়াছেও। কিন্তু যে-তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত, তাহাকে বুদ্ধি কেমন করিয়া আনিয়া দিবে! তাই মানুষের বৃত্তিগুলির মধ্যে যুক্তিবুদ্ধিকে গুরুবর বলিয়াছেন মন্ত্রী, মন্ত্রীমাত্র, রাজা নয়। রাজা মানুষের আত্মন্; এই আত্মন্‌ই তাহাকে ভেদের অতীত অভেদের সন্ধান দিতেছে, বহুর অতীত এককে চিনাইতেছে, বিকারী নামরূপের পশ্চাতে অবস্থিত নির্বিকারের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছে।

তাহা হইলে নরের চরম লক্ষ্য যখন দিব্যসত্যের উপলব্ধি ও সেই সত্যের আলোকে নব জীবন গঠন, তখন প্রাচীন গ্রীসীয় বা আধুনিক ইউরোপীয় কোন আদর্শই তাহার কাছে শেষ কথা নয়। গ্রীসের মন্ত্র ছিল, সুস্থ দেহে সুস্থ মন। গ্রীসীয় মানব সুস্থ জীবন বলিতে সুন্দর সুসমঞ্জস জীবন বুঝিত। তাহার কাম্য ছিল সুস্থ সুন্দর দেহ, সুশিক্ষিত মন, মার্জিত বুদ্ধি,—গোঁড়ামি-বর্জিত ও নমনীয়। আধুনিক সভ্যতা সুন্দরের বড় একটা ধার ধারে না। তাহার লক্ষ্য ব্যক্তির ও সমাজের জীবনকে সুসংস্কৃত, সুনিয়ন্ত্রিত ও কার্যকরী করিয়া তোলা। সেই জন্যই আধুনিক মানবের অর্থতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের চর্চা। সে এই সমস্ত বিদ্যাকে কাজে লাগাইয়া আপন স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে চায়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন গ্রীক ও আধুনিক ইউরোপীয় দুজনাই ব্যক্তির জীবনকে জানিয়াছে মনোময় বলিয়া, দুজনারই কাম্য নিখুঁত সংস্কৃতি ও যুক্তিবুদ্ধিসঙ্গত সমবেত জীবন।

আজ বিশ শতকে মানুষের অন্তর্মুখী মন কিন্তু তাহাকে একটা অতি পুরাতন আদর্শের দিকে ফিরাইয়াছে। সে অনতিবিলম্বে জানিবে যে তাহার যথার্থ সত্তা তাহার আত্মা—যে আত্মা তাহার স্থূল দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যেও নিরন্তর আপন সার্থকতা খুঁজিতেছে,—"*The ideal of a self-illumined, self-possessing and self-mastering soul in a pure and perfect mind and body,*" মানুষ দীর্ঘকাল খুঁজিয়া ফিরিয়াছে পরিপূর্ণ সংস্কৃতি ও বুদ্ধিচালিত সমাজ; আজ তাহার সম্মুখে প্রকট হইতেছে সেই প্রাচীন আদর্শ—অন্তরে স্বর্গরাজ্য ও মর্ত্যলোকে ভগবানের পুণ্যপুরীর প্রতিষ্ঠা।

এখন, আত্মা যদি আমাদের বৃত্তিসমূহের অধিপতি হন ত তাঁহার একটা উচ্চতর বিধান, উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সংকল্প থাকিবেই। আত্মার সার্থকতার মানেই আমাদের অন্তরে ও জীবনে পরম দেবতার জাগরণ। নহিলে আমাদের প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী পুরাতন typal বর্ণগত সমাজে। Typal

সমাজের মূলে থাকে এই কল্পনা যে প্রত্যেক ব্যক্তির একটা বিশিষ্ট স্বভাব বা স্বধর্ম আছে যাহাতে ভাগবত স্বভাবের এক একটা দিক প্রতিফলিত হয়—সেই স্বভাবের চৌহদ্দির ভিতরেই তাহার শিক্ষা, চরিত্রগঠন, জীবনধারা ও ভবিষ্যৎ পরিণতি। প্রাচীন ভারতের চাতুর্বর্ণ্যের মূলেও ছিল এই কল্পনা। এক-এক বর্ণ সৃষ্টিকর্তার এক-এক ভাবের প্রতীক; তাদের সমষ্টি, অর্থাৎ সমগ্র সমাজ, ভগবানের সমগ্র ভাবের প্রতিচ্ছবি। জাতিবিভাগ মূলত ছিল প্রতীকগত ও আদর্শগত। কিন্তু কালে তাহা হইয়া দাঁড়াইল অন্ধ আচার ও সংস্কার মাত্র। এ বিষয় শ্রীঅরবিন্দ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন প্রথম পরিচ্ছেদে, পাঠকের মনে থাকিতে পারে। এখন, বুঝিবার কথা এই যে আদর্শবাদই পূর্ণ পরিণত জনসমাজের প্রকৃষ্টতম নীতি নয়। হিন্দুমতেও জাতিবিভাগ চিরন্তন সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই, সে ব্রাহ্মণই হোক বা শূদ্রই হোক, দেবত্বের বীজ আছে—তাহার দেবপদে উত্থান সম্ভবপর। সত্যযুগে, আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষমাত্রেরই মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক সঙ্গতি ছিল। মানুষমাত্রেরই পক্ষে সহজ ছিল আপন সমগ্র সত্যের উপলব্ধি। তেমনই আবার কলিযুগে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি সমস্তই ঘোটমণ্ডল, অন্তরে নৈরাশ্য, তারই মধ্য দিয়া মানব হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর হইতেছে একটা নূতন বিধানের পানে। বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা তাহা হইলে মধ্যবর্তী ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে উপযোগী ছিল। তাও, ত্রেতাতে ইহা নির্ভর করিত মুখ্যত মানুষের সংকল্প ও চরিত্রবলের উপর। দ্বাপরেই প্রয়োজন পড়িল কড়া বিধানের—আচারবাদের সূত্রপাত হইল। আসল কথা, মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত বিধিবিধানের লৌহশৃঙ্খল আমাদের সর্বোত্তম যুগের, কৃত যুগের, ব্যাপার নয়। যখন দরকার পড়িয়াছিল তখন সমাজ সংরক্ষণের জন্য নানারকম কড়া ব্যবস্থা হইয়াছিল। আজ কলিযুগে সে সব ব্যবস্থাও নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানবের ক্রমোত্তরণ অবশ্যম্ভাবী, তবে

আচারব্যাদের কারাগারের পথে সে উত্তরণ ঘটিবে না। আজ যাহার প্রয়োজন তাহা অন্তঃপুরুষের জাগরণ,—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মনের সহিত পরিচয়—যে আত্মন্ আমাদের যথার্থ সত্তা, মালিক। এখন প্রশ্ন এই যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধির সহিত এই জাগরণের কি সম্পর্ক? যাহা যুক্তির অতীত তাহার সন্ধান ত যুক্তি দিতে পারিবে না! তবে দিবে কে? উপরে বলা হইয়াছে যে আত্মাপুরুষের আপন উচ্চতর বিধান, জ্ঞান ও সংকল্প আছে। মানুষ যখন তার আত্মাপুরুষকে ঈশ্বর সন্ধানের ভার দিবে তখন স্বভবত এই উচ্চতর বৃত্তিসমূহ বুদ্ধির স্থান অধিকার করিবে।

যুক্তিবুদ্ধি একটা মধ্যবর্তী অবস্থা জীবজগতের ক্রমবিকাশে। তাহার নিম্নে সহজাত বুদ্ধির মত সব অধস্তন অবস্থা আছে; আবার উপরে মনোবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মতর উচ্চতর অবস্থা আছে। বিবর্তনের পথে মানুষ নীচের অবস্থা হইতে যুক্তিতর্কের স্তরে, মনোবুদ্ধির রাজ্যে পৌঁছিয়াছে। এখানে তাহার কারবার আপেক্ষিকের সহিত, ভিন্ন-ভিন্ন নানাবস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ-বন্ধনের সহিত। কিন্তু যখন সেই সমস্ত বন্ধন ছাড়াইয়া নিরপেক্ষ নিরালম্বের মুক্ত অবস্থায় উঠিবে তখন তাহাকে স্বভাববশেই বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর তত্ত্বে উঠিতে হইবে। এইরূপে চেতনারও ক্রমোত্তরণ ধারা আছে; জড় উদ্ভিদের নিশ্চেতনা ও অবচেতনা হইতে উত্থান আমাদের সাধারণ চেতনাতে, আবার এখান হইতে আরোহণ পরাচেতনাতে যেখানে যুক্তিবুদ্ধির বালাই নাই। তাহা হইলে আমাদের এত সাধের মনোবুদ্ধি কি একটা অকেজো বৃত্তি? মোটেই না,, অভিব্যক্তির পথে অকেজো কিছুই নয়, কেন না অধস্তনের মধ্য দিয়াই ঊর্ধ্বতনে উঠিতে হয়। বুদ্ধিই ত নানা অস্পষ্ট বিশৃঙ্খল নিম্নবৃত্তিচয়কে আপন দীপ্তিতে দীপ্ত করিয়া গোছগাছ করিয়া দেয়। আবার সেই ত তাকাইয়া দেখে ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত নিরপেক্ষ অসীমের পানে,—সবটা বুঝিতে পারে না বটে, তথাপি পথ দেখাইয়া দেয়

মানুষকে; তাই ত শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন। তবে স্বয়ং রাজাকে না ডাকিলে চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, ইহাও ধ্রুব।

বুদ্ধির কতটা দৌড় তাহা বেশ বোঝা যায় আমাদের সূক্ষ্মতর অনুভূতির সম্পর্কে। মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, জীবনধারার উপর তাহাদের প্রভাব, ইহার ভাষা অবধি বুদ্ধি বোঝে না। স্বর্গরাজ্যের নেটিবদের বুলি পার্থিব বুদ্ধি, যতই মার্জিত হোক না কেন, বুঝিবে কেমন করিয়া? সে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু কৃতকার্য হইবে না যতক্ষণ না সে আপন ধারা ছাড়িয়া সেই নেটিবদের ধারা ধরিয়াছে। ততদিন পর্যন্ত বুদ্ধি তাহার উচ্চাসনে বসিয়া ধর্মের ভাষার কদর্থ করিবে, ধর্মের বাহ্য খোলসটা মাত্র দেখিবে, বড় জোর মুরুব্বীর মত তাহার পিঠ চাপড়াইবে। সাধারণ বুদ্ধি দুই-ভাবে দেখে ধর্মজীবনকে। দুই ভাবই ভ্রান্ত, দাম্ভিকতা প্রসূত। হয় বলে, ধর্ম অর্থহীন অন্ধ কুসংস্কার, বর্বর যুগের জের, অতএব সর্বথা বর্জনীয়—নয়ত মুরুব্বীর মত ধর্মের ভুল ভ্রান্তি গলদ ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাহার শুদ্ধি করিতে যায়—কখন বা মানিয়া লয় যে বস্তুটা নৈতিক হিসাবে মন্দ নয়, ছোটলোকদের জীবনে শৃঙ্খলা আনে বটে। আজ বিশ শতকে মানুষের এতটুকু সত্যকার বুদ্ধি-সুদ্ধি হইয়াছে যে আর সে ধর্মকে একেবারে বাতিল করিয়া দিতে চায় না। তবে সে এখনও চায় তাহাকে যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে। ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই, কারণ বুদ্ধির স্বভাবই এই যে যাহা সে বোঝে না তাহাকে অর্থহীন বা অসংস্কৃত বা বর্বরোচিত বলিয়া থাকে। ইতিহাসে ইউরোপ ও আশিয়ায় যেখানেই সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, সেই-খানেই আমরা এই ব্যাপার দেখিয়াছি। বুদ্ধি কেবলই বলিতেছে ধর্মকে, তোমার চালচলন সম্বন্ধে আমি কৈফিয়ৎ চাই, আমাকে বুঝাইয়া দাও যে তোমার কথা ও কাজ যুক্তিসঙ্গত। এ যেন ইউরোপ আশিয়াকে শাসাইতেছে, তুমি সাহেব সাজ, ইংরেজী বল, তবে তোমার কথা শুনিব। কোথাও

কোথাও বা বুদ্ধিজীবী মানুষ খুব মুরুব্বীয়ানা করিয়া যুক্তিসঙ্গত ধর্ম, বিজ্ঞান-সম্মত ধর্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার জগাখিচুড়ী রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু এ-জাতীয় প্রচেষ্টা সব বারবার ছিন্নাভ্রের মতই বিনষ্ট হইয়াছে। ধর্মের মূল সত্য ভগবানের সন্ধান ও তাঁহার উপলব্ধি। ধর্মজীবনের যথার্থ কাম্য ঈশ্বরের সহিত মানুষের যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তাহারই উপর মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁহার সত্যে মানবের উত্থান, মানবের ইহজীবনে তাঁহার সত্যকে নামাইয়া আনা, জীবনে তাঁহার পরমানন্দের উপলব্ধি। এ সমস্ত ব্যাপারই যুক্তিবুদ্ধির অতীত, যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রহ্ম-বিষয়ে দার্শনিক গবেষণা, হঠযোগাদি জটিল সাধনপন্থার জটিল প্রণালী, মনে হইতে পারে যেন এ সব যুক্তিতর্কের সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু বস্তুত ধর্মের ব্যাপারে যেখানেই আমরা পরীক্ষা প্রয়োগ দেখি তাহা কেবল উপলব্ধ সত্যের যাচাই মাত্র, কষ্টিপাথরের কাজ। উপলব্ধি যাহা আসে তাহা সরাসরি, মগজের মধ্য দিয়া নয়। ভগবৎ-প্রেম, তাঁহার শান্তি ও পরমানন্দে বাস, তাঁহার চরণে আত্মদান, এসব যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, যুক্তির গণ্ডী মানে না।

যুক্তিবুদ্ধি কি পারেনা, তাহা ত বোঝা গেল। এখন দেখা যাক, সে কি পারে; ভগবৎ-সন্ধান বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয় কি কাজ করিবেন? উত্তর সোজা—তিনি রাজার কথা প্রজার ভাষায় প্রজাকে বোঝাইবেন। প্রজা এই উপদেশের যতটুকু ধরিতে পারে, ধরিবে। বাকিটা সে নিজে জানিয়া লইবে—লইতেই হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে দার্শনিক গ্রন্থাদিতে যুক্তিতর্কের অভাব নাই, তবে এই তর্কবিতর্ককে শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থের weakest part বলিতেছেন, কেন না বিতর্কের দ্বারা প্রমাণ কিছুই হয় না। আগে হইতে যাহার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই যুক্তি মানিয়া লয়, আর কেহ লয় না। বুদ্ধির আসল কাজ অনুভূতিচয়কে, উপলব্ধ সত্যকে শ্রেণীবদ্ধ করা, তাহাকে রূপ ও ভাষা দেওয়া। বুদ্ধি বলিবে, "আমি চেষ্টা করিলাম সত্যকে তোমার বোধগম্য করিতে। এখন

তোমার ইচ্ছা হয় তুমি অপর উপায়ে যথার্থ জ্ঞান আহরণ কর।" তবে যুক্তিবুদ্ধির আর এক প্রকার কাজ আছে। আমাদের মধ্যে সহজাত বুদ্ধি, সহজ প্রেরণা ইত্যাদি যেসব অধস্তন বৃত্তি কাজ করে তাহাদের অনেক গলদ আছে, নানা প্রকার অজ্ঞান অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে তাহারা মিশ্রিত থাকে। বুদ্ধি এইখানে সোনায় সোহাগার মত শোধনের কার্য করিতে পারে; খাদ জ্বালাইয়া দিয়া সোনাকে খাঁটি করিতে পারে। তথাপি এও ত প্রধান কাজ নয়; বুদ্ধির অতীত উর্ধ্বলোকে না উঠিলে পরম সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটে না। তবে যখন সত্য ধর্মের অধঃপতন হয়, সত্য যখন আচারের নাগপাশে জড়াইয়া পড়ে, তখনই আসে যুক্তিবুদ্ধির প্রধান উপকারিতা। এরূপ ব্যাপার বার-বার সংসারে ঘটিয়াছে। কিন্তু বার-বার এও দেখা গিয়াছে যে মানুষের কুশাগ্র বুদ্ধি আগাছা কাটিতে গিয়া শস্যকেও নির্মূল করিয়াছে। তাই তথাকথিত ধর্মসংস্কার হইতে মানবজাতি বিশেষ কিছু লাভ করে নাই। আরও এক গোলযোগ থাকে এইরূপ ধর্মসংশোধনে। নূতন ধর্মকেও ত নির্ভর করিতে হয় অহৈতুক বিশ্বাসের উপর। ইউরোপে ষোড়শ শতকে যখন অনেক দেশ পোপের আনুগত্য ছাড়িয়া দিল, তখন তাহারা যে যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইল, তাহা ত নয়। এক রকমের অন্ধ বিশ্বাসের বদলে আরেক রকমের অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণ করিল মাত্র। ক্রমওয়েল-এর দলকে যুক্তিবুদ্ধির অনুগামী কে বলিবে! তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে তাহারা পোপের কবল হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য, ভগবৎ-প্রেম, ও ভগবৎ-জ্যোতিকে বেশী চিনিল। তবে এ ত যুক্তিবাদের কথা নয়, এ যে বুদ্ধির অতীত ব্যাপার। যুক্তিবুদ্ধি যে লোকাচার দেশাচারকে সংশোধিত করিতে পারে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে যে ভগবানের সন্ধান দিতে পারে না, ইহাও ধ্রুব।

তবে বিবর্তনের পথে মনোবুদ্ধি ত যেখানকার সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে না। ভাগবত সত্যের অবতরণের সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধিরও রূপান্তর ঘটিতে থাকিবে।

পরম জ্যোতিতে দীপ্ত বুদ্ধি আর সাধারণ বুদ্ধি থাকে না। মন্ত্রী ও রাজা যখন একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন, তখন উপলব্ধির পথও পরিষ্কার হইয়াছে। যথার্থ পরমার্থ-সাধনা মানুষের কোনও কর্ম বা বৃত্তিকে বর্জন করে না; বরং তাহাকে ভাগবত জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দে শুদ্ধ বুদ্ধ দীপ্ত করিয়া লয়।

* * * *

ধর্ম যুক্তির অতীত অধ্যাত্ম সত্তার সন্ধান, অতএব সেখানে বুদ্ধি বড় একটা সহায়তা করিতে পারে না। তবে এমন মনে হইতে পারে যে মানবের সাধারণ কর্মক্ষেত্রে, তাহার সাধারণ গতিবিধিতে, বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি—বিজ্ঞান-দর্শনাদি সসীম পার্থিব জ্ঞানের চর্চাতে বুদ্ধিরই একাধিপত্য। কিন্তু বস্তুত ইহাও বলা চলে না, কেন না, যুক্তিবুদ্ধির স্থান সকল সময়েই মধ্যবর্তী, নীচে সহজাত-বুদ্ধির ও প্রাণশক্তির তাড়না—উর্ধ্বে মানবসত্তার যথার্থ অধিপতির, তাহার নিগূঢ় আত্মাপুরুষের প্রেরণা। মানুষের ন্যায়ান্যায় বোধে এবং তাহার সৌন্দর্যবোধে, অর্থাৎ তাহার শিবং এবং সুন্দরং-এর সন্ধানে, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। সভ্য মানবের সুন্দরের উপলব্ধি প্রকাশ পায় তাহার কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলাতে, তাহার তক্ষণ মূর্তিগঠন ও স্থাপত্য শিল্পে। তবে এও তাহার শুধু একটা দিক; সুন্দরের পূর্ণ উপলব্ধি যাহার আছে, সে তাহার সমগ্র সত্তা, সমস্ত জীবনকে সুষ্ঠু সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলে। এই সমগ্র উপলব্ধি ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুইকেই আনিয়া দেয় নিখুঁত পূর্ণতা। তথাপি সুন্দরের সন্ধান জাগ্রত মানবের বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাপার নয়। ইহার আরম্ভ অনেক নীচে, অধস্তন মন ও প্রাণশক্তির খেলাতে। ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল মোটামাঠা ভাবে, পরে জাগ্রত বুদ্ধি তাহাকে ধীরে-ধীরে উন্নত, সংস্কৃত ও দীপ্ত করিয়া তুলিল; নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দিল। যাহা ছিল অপূর্ণ ও অস্পষ্ট, তাহা হইল পূর্ণ ও স্পষ্ট,—বুদ্ধির আলোকে কলাবোধ জাগিয়া উঠিল, সৃজনী প্রতিভা উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিতে লাগিল। এই

সম্পর্কে আমাদের মনে আসে যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আদিম মানব আল্‌তামিরা গুহাতে ও অন্যান্য স্থানে এমন সব চিত্র ও তক্ষণ শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে যাহা দেখিলে কোন সংশয় থাকে না যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যখন অর্ধ-মগ্ন তখনও তাহার সৌন্দর্যবোধ বেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। হয়ত ইহাদের কাজ এলোমেলো বিশৃঙ্খল, হয়ত তাহা ঠিক বুদ্ধিচালিত ছিল না, কিন্তু অন্তরে নিশ্চয়ই জাগিয়াছিল সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনী প্রেরণা। পরে সভ্যযুগ আনিয়া দিল বিচারযুক্তি, আস্তে-আস্তে মূল প্রেরণা বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল, প্রেরণার সহিত কারিগরি বুদ্ধির মিলন ঘটিল।

তবে আসল কথা এই যে আজিকার দিনেও যেখানে মানুষ শিল্পকলার ক্ষেত্রে একটা বড় কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে সে যুক্তিবিচারকে অতিক্রম করিয়াছে, পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আজও আমাদের মধ্যে যে যথার্থ কবি চিত্রকর বা সুন্দরের স্রষ্টা আছে, বাস্তবিক সে বুদ্ধিদ্বারা চালিত নয়। বুদ্ধির অতীত ঊর্ধ্বলোকের জ্যোতি বোধিরূপে, কি অলৌকিক দর্শনরূপে, মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সুন্দরকে ব্যক্ত করে, এই তাহার সৃজনী প্রতিভা; আমরা ইহাকে ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা বলি, ইউরোপ ইহাকে বলে genius. বুদ্ধি এই জ্যোতিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বটে, কিন্তু যতই সে হাত দিতে যাইবে ইহার মধ্যে, অন্তরের প্রেরণা ততই ব্যাহত হইবে, নীচে নামিয়া যাইবে। আর একপ্রকার উৎকর্ষ আছে যাহা বুদ্ধিদত্ত, ইংরেজিতে যাহাকে বলে talent, আমরা চাতুর্য বলিতে পারি। প্রতিভা ও এই চাতুর্যে প্রভেদ অনেক; প্রতিভা মৌলিক বস্তু সৃষ্টি করে, চাতুর্য মৌলিক কিছু সৃষ্টি করে না, অনুকরণ করে, অথবা প্রতিভার হুকুম তামিল করে। যথার্থ art বা শিল্পকলা বলিতে যা-কিছু, তাহার পশ্চাতে থাকে সূক্ষ্ম-প্রেরণা, প্রতিভা; সাধারণ, তথাকথিত art—নাটক বা কাব্য, সঙ্গীত বা চিত্র, ভাস্কর্য বা স্থাপত্য

—অনুকৃতি মাত্র, তাহার পশ্চাতে থাকে বুদ্ধির প্রেরণা ও চাতুর্য। কলাবিৎ চতুর হইলে নকল হয় ভাল; নহিলে সেটুকুও হয় না, হয় শুধু বিকৃতি। যথার্থ প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী বা ভাস্করও যদি যুক্তিবুদ্ধির কাছে দাসখৎ লিখিয়া দেয় ত তাহার চিত্র বা মূর্তির কাজ যত নিখুঁতই হোক না কেন, তাহার প্রাণ থাকে না। আসল কথা, বস্তুর স্বরূপ ও স্বভাব না ফুটিয়া উঠিলে art, ললিতকলা, হইল না।

মানুষের ইতিহাসে এমন যুগ আসে যখন যুক্তিবিচারই চারুকলার নিয়ামক হয়। সেই সব যুগে হয়ত উৎকৃষ্ট কাব্য লেখা হইয়াছে, উৎকৃষ্ট চিত্র আঁকা হইয়াছে; কিন্তু সে উৎকর্ষ যান্ত্রিক,—হাতের, চোখের ও বুদ্ধির কৌশল মাত্র। কাব্যে মার্জিত ছন্দ ও ভঙ্গী, বা চিত্রে নিখুঁত রেখা ও বর্ণ, কম জিনিস নয় বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস কলাসৃষ্টিতে সূক্ষ্মবোধির প্রেরণা ফুটিয়া ওঠা। যথার্থ শিল্পী কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না বস্তুর বাহ্য সৌন্দর্যটুকুকে, তাহার বাহ্য সত্যটুকুকে, ব্যক্ত করিয়া। তাহার কাজ বস্তুর আন্তর সত্যকে, তাহার অন্তরাত্মাকে টানিয়া বাহিরে আনা। অন্তরাত্মার সৌন্দর্য ত সাধারণের দৃষ্টিগোচর নয়। দ্রষ্টাই সে জিনিস দেখিতে পান ও তাহাকে সর্বজনের সমক্ষে প্রকট করেন—এই দ্রষ্টা ও স্রষ্টাই শিল্পী। তিনি বস্তুর সত্যস্বরূপ দেখিতে পান অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা। উর্ধ্বতন লোকের শক্তি ও জ্যোতির প্রবাহই তাঁহার প্রতিভা।

শিল্পের যাচাই ও গুণবিচারের কাজ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অনেকটা করে বটে, তবে সেখানেও সে সর্বপ্রধান বিচারক নয়। কেন না সে কবিতার বা গানের বা ছবির বা মূর্তির বাহিরের দিকটা বিশ্লেষণ করিতে পারে, নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিভিন্ন ভাগের পরস্পরসম্বন্ধ নির্ধারিত করিতে জানে, কিন্তু ভিতরের মহত্তম গভীরতম সত্য সে ধরিতে পারে না। সেটা ধরিবার জন্য যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা তাহার এলাকার বাহিরে। বুদ্ধি অধস্তন মনের

মোটামাঠা নিরীক্ষণ বিশ্লেষণাদিকে ঠিকপথ দেখাইতে পারে, কিন্তু যথার্থ গুণবিচার করার জন্য তাহার নিজেরই অভ্যাস করিতে হয় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তঃপুরুষের ডাকে সাড়া দেওয়া। ইহা অভ্যাস না করিলে তাহার বিচার হয় বাহ্য ও যান্ত্রিক, যুক্তির খেলা মাত্র। কিছুদিন হয়ত এইরূপ বাহ্য যান্ত্রিক বিচার চলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিল্পী স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া শিল্পকলার নূতন-নূতন ধারা প্রবর্তিত করে। ধীরে-ধীরে আবার নূতন ভিত্তিতে শিল্পের গুণবিচার আরম্ভ হয়, সত্যের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, যুক্তিতর্ক পিছনে পড়িয়া থাকে। আর্ট-এর যথার্থ উপলব্ধি মানে আমাদের অন্তরস্থ সুন্দরের অভিন্ন মিলন। বুদ্ধিবৃত্তির বোধ তখনই হয় পরিপূর্ণ ও নিখুঁত, যখন তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলে সূক্ষ্ম অন্তর্বোধি। তাহা নহিলে, বস্তুর অন্তরাত্মাকে না ধরিতে পারিলে শিল্পী তাহার যথার্থ প্রতিকৃতি রচিবে কিরূপে? আবার, যাহার আত্মা বস্তুর আত্মাকে না চিনিল, সে প্রতিকৃতির বিচারই বা করিবে কিরূপে? সুন্দরের যথার্থ স্রষ্টা ও বিচারক দুজনাকেই দেখিতে হইবে, ধরিতে হইবে বস্তুবিশেষের মধ্যে, বা ধ্বনি-বিশেষের মধ্যে, বা রেখা ও বর্ণবিশেষের মধ্যে, পরমসুন্দরের শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রকাশ। তবেই সত্যকার কাব্য, সঙ্গীত বা শিল্পকলা। নহিলে শুধু বুদ্ধির চালনায় চলিলে সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া দাঁড়ায় স্থূল, বাহ্য ও যান্ত্রিক—সত্য দূরে পড়িয়া থাকে। এসব কথা চিত্রাদি সম্বন্ধে যতটা খাটে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধেও ততটাই খাটে। শরতের নীলাকাশ, উষার অরুণ আভা, নব দূর্বাদলের শ্যামল রাগ ইত্যাদি প্রকৃতির সুন্দর-সুন্দর বস্তুর যথার্থ সুষমা কি বাহিরে না তাহার অন্তরে? অন্তরের সুষমা না দেখিতে পাইলে সুন্দরের উপলব্ধি হইল না। এই উপলব্ধির অবশ্য সূত্রপাত হইয়াছিল অধস্তন মনে ও প্রাণে, বুদ্ধিবিকাশের পূর্বে। আমরা দেখিতে পাই, অবোধ শিশু ফুলপাতার বর্ণ উপভোগ করে ও সঙ্গীতের ছন্দে মোহিত হয়, সাপ বাঁশীর সুরে তাল দেয়, ঘোড়া বাজনার সঙ্গে নাচিয়া-নাচিয়া

চলে। তবে অধস্তন মনের উপলব্ধি অস্পষ্ট ও অপূর্ণ, বুদ্ধিযোগে তাহা স্পষ্টতর, পূর্ণতর হয়। হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিও তাহাকে সত্যের পূর্ণতম আলোকে দীপ্ত করিতে পারে না। সে কাজ অন্তর্বোধির, বুদ্ধির অতীত সূক্ষ্মতর তত্ত্বের। আত্মাই আমাদিগকে লইয়া যায় পরমসুন্দরের চিরন্তন সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে,—প্রথমে ব্যষ্টিতে, তারপর সমষ্টিতে, তারপর বিশ্বাতীতে।

* * * *

উপরের আলোচনা হইতে আমরা একটি সাধারণ তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যাহা মানুষের সকল গতিবিধি সম্বন্ধে প্রযুজ্য। তাহা এই যে, মানবের সকল কর্মই মূলত পরমপুরুষের সন্ধান—ধর্মের মধ্য দিয়া আমরা যে সত্যের উপলব্ধি করি তাহাই সমগ্র জীবনধারার পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছে।

আর, এই যে পরমাত্মনের অনুধাবন, ইহা আমাদের উচ্চতম, সত্যতম, পূর্ণতম, আত্মনের সন্ধান—অর্থাৎ যে-সত্য জীবনের ভাঙ্গাচোরা অপূর্ণ অসমঞ্জস বাহ্য রূপের পিছনে লুকাইয়া আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা। ইহা সম্ভব হইতে পারে শুধু সেই এক অনাদি অনন্তের অনুভূতি দ্বারা, সসীমের মাঝে অসীমের দর্শন দ্বারা, আপেক্ষিকের মাঝে নিরপেক্ষ কেবলের উপলব্ধি দ্বারা। চারিদিকের অসংখ্য রূপ ও শক্তি, অগণিত কামনা ভাবনা প্রেরণা, ইহাদের পরস্পর ভেদ বিরোধ অসঙ্গতি, তাহার মধ্যে অখণ্ড অনন্ত একের সন্ধান, এই ত জ্ঞানে অজ্ঞানে সকলেই করিতেছে! যাহার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় নাই সে অন্ধভাবে, যাহার বুদ্ধি ফুটিয়াছে সে বুদ্ধির আলোকে, আর যে বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়াছে সে পরম সত্যের দিব্য জ্যোতিতে। সত্য ও সুন্দরের অনুধাবনে আমরা এই রহস্য সহজেই বুঝিতে পারি, কেননা সেখানে ত আমাদের অধস্তন সত্তার ক্ষণিক ও খামখেয়ালী দাবিদাওয়ার সঙ্গে মিটমাট করিতে হয় না! আমরা সেখানে কতকটা নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাই, পরম সত্যের খোঁজ করিতে পারি,—কার্যকরী বুদ্ধিকে পাশ কাটাইয়া উচ্চতর

সূক্ষ্মতর তত্ত্বের সংস্পর্শে আসিতে পারি। ধর্ম বা কাব্য বা ললিতকলার মূল্যই এইখানে। এতটা হয়ত আমরা মানিয়া লই; কিন্তু যাহাকে আমরা মূর্খের মত *practical* বা কাজের জীবন বলি, সেখানে আমরা দিব্যসত্যকে আমল দিতে চাই না। শুধু ক্ষণিক বা আংশিক বা খামখেয়ালী বাহ্য প্রয়োজনের দাবিস্বীকার করিয়া চলি। কিন্তু এ ভাব ত টিকে না, পরিশেষে আমরা বুঝি যে আমাদের দৈনন্দিন বাহ্যজীবন এবং সূক্ষ্মপ্রেরণানুসারী আন্তর জীবন বস্তুত একই জিনিস। এই বাহ্যজীবনের মধ্যেই দেখিতে হইবে, সার্থক করিতে হইবে, পরম সত্যকে। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের এই পরম চরম সত্য নীতিবোধের দিক হইতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। অবশ্য বুদ্ধিমান মানুষ এই নীতিজ্ঞানকে, ভালমন্দ বোধকে যুক্তিতর্কের নাগপাশে বাঁধিয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু বাঁধিয়া ফেলিতে পারে নাই, পারিবেও না কখন। তবে বাগ্-জালে তাহাকে এমনই আবদ্ধ করিয়াছে যে মনে হয় যেন ভাল-মন্দ, শিব-অশিব যুক্তিতর্কেরই ব্যাপার। উনিশ শতকের বুদ্ধিচালিত নীতিজ্ঞানকে গুরুবর *utilitarian ethics* বলিয়াছেন। আমাদের কর্মের যথার্থ প্রেরণা কোথায় তাহা না বুঝিয়া ঐ যুগের পণ্ডিতগণ কূটতর্কের আশ্রয় লইয়াছিলেন। নৈতিক গণিতের ভেল্‌কি লাগাইয়া ন্যায়ান্যায়ের নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তেমনই কেহ-কেহ আবার ভোগবাদের নজীর আনিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে শিব মানে যাহা সুখ-আরাম দেয়, অশিব মানে যাহা অসুখ-অস্বস্তি দেয়। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আবার সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া ন্যায়ান্যায় স্থির করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আসলে এ সমস্তই উন্মার্গগামী যুক্তি-বুদ্ধির কল্পনা। শিব-অশিব, ন্যায়ান্যায় জ্ঞান একটা শাশ্বত বস্তু, অন্তরের জিনিস, তাহার একটা আপন বিধান আছে। বাস্তবিক সে-জ্ঞান ঊর্ধ্বলোক হইতে অবতীর্ণ জ্যোতি বই আর কিছু নয়।

তবে এই যে ইহার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে এত ভুলভ্রান্তি, জল্পনাকল্পনা, ইহার

মধ্যেও সত্য নিহিত আছে। ব্যাবহারিক ও লৌকিক দিক হইতে স্নীতি বলিতে মানুষে বোঝে কার্যকরী বা উপযোগী নীতি। কিন্তু উপযোগী মানে ত শুধু বাহ্য বা অধস্তন জীবনের উপযোগী নয়; উচ্চতম কল্যাণ ও উচ্চতম উপযোগিতা একই কথা। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, যুগে-যুগে, উপযোগিতার ভিন্ন-ভিন্ন মাপকাঠি লইয়াছে, কিন্তু ভাল যাহা, তাহা সর্ব অবস্থাতেই ভাল—নিরপেক্ষ। নীতিজ্ঞানের এই সার কথা। মানুষের অন্তরস্থ নিগূঢ় নীতিজ্ঞান এই নিরপেক্ষ ভালরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে চিরদিন, বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণের পূর্ব হইতেই। আজও দেখিতে পাই যে বুদ্ধিহীন মানব শিশু এই সহজ প্রেরণাবশেই কাজ করিতেছে—মধুচক্রের নির্বুদ্ধি মক্ষিকা ও বল্মীকের অজ্ঞান পিপীলিকা নির্বিবাদে আপন-আপন মঙ্গল কার্য করিয়া যাইতেছে। বিধাতার মঙ্গল বিধানকে অনুসরণ করিতেছে। যথার্থ ভাল কাজের কোন হিসাব বা আইনকানুন নাই; শিবম্-এর সন্ধানী হয় তাহার সহজাত প্রেরণা, নয় তাহার অন্তর্বোধি অনুযায়ী কাজ করিবে, অপর কোন নিয়ম নাই। ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু সে ঠিক পথ ধরিয়াছে। তাহার ভয় নাই। নৈতিক মানবের ধর্ম শিবম্-এর অন্বেষণ, উপকারিতার নয়। উপকারিতা খোঁজে ব্যাবহারিক লৌকিক বুদ্ধি।

তেমনই সুখ বা তুষ্টির সন্ধান নৈতিক মানবের ধর্ম নয়। অবশ্য এখানে সুখ মানে ঐহিক, ক্ষণিক, আংশিক সুখ। পরম আনন্দে ও পরম শিবে কোন প্রভেদ নাই, আনন্দই শিব। আসল কথা এই যে সুনীতির বা শিবম্-এর সন্ধান অন্তরের ডাক, মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানেরই একটা রূপ। মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রথমটা মনে হইতে পারে যে সুনীতি একটা সামাজিক কর্তব্য। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখিলেই বোঝা যাইবে যে ভালমন্দের সহিত সমাজের বা আবেষ্টনের যথার্থ কোন সম্পর্ক নাই। পরস্ব অপহরণ ও পরকীয়াতে আসক্তিকে আমরা সামাজিক মানুষ বলি দুর্নীতি।

শুধু দুর্নীতি নয়, রাজার আইনেও বাধে। কিন্তু যে-সমাজে বা যে-রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই, বা বিবাহবিধি নাই, সেখানে পরস্ব বা পরকীয়া কথাই অর্থহীন। তারপর এও অনেকবার দেখা গিয়াছে যে মানুষ অন্তরের সুনীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সমাজবিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে; শুধু দাঁড়াইয়াছে তা নয়, অবশেষে সেই বিদ্রোহীরই জয়জয়কার হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে বিদ্রোহীর অন্তরে সুনীতির প্রেরণা আসিল কোথা হইতে? কোন সন্দেহই নাই যে তাহার আপন অন্তরের অন্তর তাহাকে এই আদেশ দিয়াছিল। শিবম্ তাহা হইলে বাহিরের বিধান নয়, অন্তরতম আদর্শ, *the urge of the Divine in him.*

পুরাকালে ধারণা এই ছিল যে ন্যায়ান্যায় দেবগণের শাশ্বত বিধান। একালের যুক্তিবাদী এই ধারণাকে উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু উড়াইয়া দিলেও নিঃসংশয় ইহার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের ন্যায় ও কর্তব্যের আদর্শ যুগে-যুগে বদলাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনের মূলে একটা চিরন্তন ধ্রুব সত্য আছে যাহা মানুষের আপন প্রকৃতির তথা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত জড়িত। আরম্ভে নীতিবোধ ছিল সুপ্ত এবং পরিণামী বুদ্ধি তখনও জাগে নাই। তারপরে বুদ্ধি জাগিল, মানবের যুগে আসিল, মানুষ বুদ্ধি খরচ করিয়া সুপ্ত নীতিবোধকে যুক্তির পায়ার উপর বসাইল। মরলোকের কাজ চলিল, কিন্তু এখানেই ত বিবর্তনের শেষ নয়! ইহারও উপরে আছে পরাবুদ্ধি ও অতিমানসের জাগরণ; তখন নীতিবোধও যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে, মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান মানুষের অন্তরে স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে। মানুষ তাহার প্রথম অবস্থার সহজাত অস্পষ্ট অপূর্ণ প্রেরণাকে বুদ্ধির আলোকে স্পষ্ট ও পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিল, ন্যায়ান্যায় বোধকে বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাকে একটা ভাষা দিয়াছিল। তথাপি তখনও তাহার এই বোধ ভাঙা-চোরা ছিল, যিনি বুদ্ধির

অতীত সেই শিবম্-এর সন্ধান না পাইলে, তাঁহার দিব্যজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত না হইলে, তাঁহারই পরম শিবম্‌কে কেমন করিয়া ধরিবে? তথাপি ক্রমবিকাশের পথে এই যুক্তিবুদ্ধির বা বুদ্ধিচালিত ভালমন্দ বোধের ধাপও অত্যাবশ্যকীয়। এই ধাপের উপর ভর দিয়াই মানুষ উপরে উঠিবে।

কি সত্যের, কি সুন্দরের, কি শিবম্-এর সন্ধানে, মানুষকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে হইবে বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া ভগবানের পানে, শাশ্বত কেবলের পানে। মনকে অন্তর্মুখী করিয়া আন্তর সত্তার সহিত অনন্ত সত্য-শিব-সুন্দরের যোগ সংঘটিত করিতে হইবে, আর তাঁহারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতে কর্ম করিতে হইবে। এই পরম নীতিরই অনুসরণ করিতেছে নৈতিক মানব, এই পথেই তাহার সত্তা সার্থক হইবে।

নীতিবোধ তাহা হইলে মূলত ভালমন্দের হিসাব নয়, জগতের চক্ষে নির্দোষ হইবার চেষ্টাও নয়, বস্তুত ইহা মানবের ভাগবত প্রকৃতিতে উত্তরণ। ইহার শুচিতা দিব্য শুচিতার অভীপ্সা, ইহার সত্য ও ন্যায় দিব্যসত্য ও দিব্যসংকল্পের শাশ্বত বিধানের অনুধাবন, ইহার ভূতদয়া সর্বব্যাপী অসীম দিব্যপ্রেমের অনুসরণ, ইহার শক্তি ও বীর্য দিব্য চিৎশক্তিরই প্রকাশ। মানুষ যে-সুনীতির, যে-কল্যাণের সন্ধান করিতেছে, তাহার এই ধর্ম। মানবসত্তার দিব্যসত্তাতে রূপান্তর ঘটিলেই তাহার সন্ধান সার্থক হইবে। তখন তাহাকে আর চেষ্টা করিয়া ধর্মভীরু হইতে হইবে না, সে স্বভাবত দিব্য-স্বরূপ হইবে। আর তাহার প্রয়োজন থাকিবে না আদিম সহজাত প্রেরণার, আর প্রয়োজন থাকিবে না যুক্তিবুদ্ধির চালনার, জাগ্রত প্রদীপ্ত দিব্যজ্ঞান তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইবে চরম কাম্যের দিকে। এই ছিল প্রাচীন ঋষিগণের লক্ষ্য; যুক্তিবুদ্ধি মানুষকে পথ ভুলাইয়া বিপথে লইয়া গিয়াছে, আবার তাহাকে ধরিতে হইবে সেই পুরাতন পথ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম বা সুষমা চর্চা বা সুনীতি, তিনেরই পিছনে রহিয়াছে এক অদ্বিতীয়-সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান। চরম সার্থকতা আসিবে যখন মানুষ পরম দেবতাকে 'খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং তাঁহার দিব্য-সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে। বুদ্ধি তাহাকে লইয়া যাইবে যতদূর পারে, তার পরে কিন্তু সকল ভার তুলিয়া দিতে হইবে আপন অন্তঃপুরুষের হস্তে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পার্থিব জীবনের নিগূঢ় লক্ষ্য

একথা বলা যায় যে মানবের উচ্চতর শক্তিচয় বিশ্বে সব-কিছুর মধ্যে, অন্ধভাবে হইলেও, ঈশ্বরের সন্ধান করিতেছে। আপন উচ্চতম, বৃহত্তম, পূর্ণতম আত্মনের সন্ধান করিতে গিয়া সে দেখিতে পায় যে এই আত্মন্ সত্য-শিব-সুন্দর এক পরম আত্মনের সাথে অভিন্ন। এই পরমের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ধর্মের উদ্দেশ্য। তাঁহারই সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুভূতি মানবের নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ললিতকলা, বিজ্ঞানাদির চরম লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের নিত্যজীবনে ত আমরা এই সমস্ত উচ্চ আদর্শের অনুধাবন করি না। আমরা সদাই ব্যস্ত থাকি আমাদের দেহ-প্রাণ-মনের অভাব-অভিযোগ, তাড়না-প্রেরণা কামনা-বাসনা লইয়া। এই সমস্ত ব্যাপারই আমাদের মনে বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয়, বাকী সব বোধ হয় যেন আবছায়া মত। এই বাস্তব ব্যাপারগুলিই আমাদের নজরে একান্ত আবশ্যকীয়, বাকীগুলি যেন না হইলেও চলে। সমাজ সত্য-শিব-সুন্দরকে একটা স্থান দেয় বটে, কিন্তু সে-স্থান নিতান্ত গৌণ। সুনীতিকে মানে বটে, কিন্তু সে তার জীবনে উপকারিতার জন্য, নৈতিক বিধান না থাকিলে মানুষে-মানুষে বন্ধন দৃঢ় হইবে না বলিয়া। সুন্দরের স্থান সমাজের চক্ষে আরও গৌণ, তার প্রয়োজন অলঙ্কার হিসাবে, ভোগের উপাদান বলিয়া—চক্ষু-কর্ণকে, মনকে, তুষ্ট করে বলিয়া। ধর্মকে সমাজ স্থান দেয় মন্দিরে, গির্জাতে, নির্দিষ্ট পাল-পার্বনের দিবসে, অথবা মানুষের বৃদ্ধবয়সে। কিন্তু সমগ্র জীবনকে ধর্ম বলিয়া, ঈশ্বর সন্ধান বলিয়া গ্রহণ করা, এ হিন্দুর সমাজেও নাই যেখানে ধার্মিকতার এতটা গর্ব! সাধারণ মানুষের দর্শন বা মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ খুবই অল্প, তবে পদার্থ বিদ্যা তাহার আদরের বস্তু কেন না সে-বিদ্যা ভোগবিলাসের উপকরণ জোগায়।

কিন্তু সেখানেও দুই পাঁচজন ছাড়া সবাই মূলতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে উদাসীন। সকল বিষয়েরই তত্ত্বানুসন্ধান জনাকয়েক বিশেষজ্ঞের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ মানুষ যাহারা শিক্ষিত তাহারাও, দেহ-প্রাণের তুষ্টি, আপন দেহ-প্রাণের অভাব পূরণের লাগিয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

ইহার কারণ এই যে এখানে আমাদের সত্তার একটা অধস্তন শক্তি সর্বদা কাজ করিতেছে। সে কাহারও মানা শোনে না, আপন তুষ্টিসাধন সে করিবেই। মনকে সে চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ আদায় করে, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম কোন বৃত্তিকে সে চেনে না। এই যে আমাদের জবরদস্ত প্রাণশক্তি, ইহাই পার্থিব জীবনের ভিত্তি। মানব মূলত চায় বাঁচিয়া থাকিতে, বংশবৃদ্ধি করিতে, পৃথিবীতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে। ডারউইন-পন্থী বৈজ্ঞানিক ইহাকে বলেন বাঁচিবার চেষ্টা, কিন্তু বস্তুত মানুষ চায় শুধু বাঁচিয়া থাকিতে নয়, বাড়িয়া চলিতে, ভোগ করিতে, অধিকার বিস্তার করিতে। তাহার অন্তরে দুই প্রেরণা কাজ করিতেছে—ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ও সামাজিক অভিব্যক্তি। ব্যক্তি যেমন ব্যক্তির সহিত সদাই টক্কর দিতেছে, তেমনই আবার সে অন্যের সহিত মিলিয়া নানা সমষ্টি সমবায় গড়িয়া তুলিতেছে। প্রাণশক্তির গতিবিধির উপরই নির্ভর করিতেছে মানবসমাজের শক্তি, তাহার জীবনধারা, তাহার পরিণতি। এই প্রাণশক্তির ওজস্ কমিয়া গেলেই সবকিছু ধীরে-ধীরে ধ্বংস পথে চলিয়া যাইতে বাধ্য।

ইউরোপের সমাজ-পরিকল্পনার মূল ভিত্তি নিত্য-ক্রিয়াশীল এই প্রাণশক্তি—বিশেষত যবে হইতে টিউটন্ মানব ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রমুখস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার আদর্শ হইলে কর্মকুশল সদাচঞ্চল প্রাণময় নর। সত্যসন্ধান, সুনীতিচর্চা, সুন্দরের অনুধাবন, এ-সব তাহার জীবনের ও সংস্কৃতির সুন্দর ফুল; কিন্তু জীবন-বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও মূল তাহার রাজসিক কর্মতৎপরতা। খৃষ্টীয় ধর্মভাব ও পূর্বতন লাতিন সংস্কৃতিকে সে

একপাশে সরাইয়া দিয়াছে। সমাজবন্ধন, রাষ্ট্রসংগঠন, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থসঞ্চয়, এই সবই হইয়াছে আজিকার ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যানুশীলন, —বিজ্ঞান, দর্শন ও নীতিতত্ত্বের চর্চা,—হইয়া দাঁড়াইয়াছে জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ, অথবা সমাজের সুব্যবস্থা, তাহার সুখ-সমৃদ্ধি বর্ধনের উপায়মাত্র।

প্রাচীনদের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাহাদের লক্ষ্য ছিল সুন্দরের সন্ধান, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন, নীতিজ্ঞান ও ধর্মচর্চা। গ্রীস-রোম জোর দিয়াছিল প্রধানত প্রথম তিনটির উপর। আশিয়া ধর্মকে সর্বপ্রধান স্থান দিয়াছিল,—বুদ্ধি, নীতি ও সৌন্দর্যবোধকে ধর্মসাধনের পন্থা বা উপায় বলিয়াই জানিয়াছিল। গ্রীস ও রোমের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় আদর্শ অপেক্ষাও গৌরবের বস্তু ছিল তাহাদের ললিতকলা, দর্শন ও কাব্য চর্চা। আশিয়ার মন যে এই তিন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় নাই, এমন নয়; কিন্তু তাহার চক্ষে ধর্ম ও সমাজজীবনই ছিল মুখ্য বস্তু; তাহার কাছে শিল্পী, কবি বা দার্শনিক অপেক্ষা সাধুসন্ত ও ঈশ্বরসন্ধানীর কদর ছিল বেশী। আধুনিক যুগের মুখ্য ধ্যেয় বস্তু হইয়াছে অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান; পদার্থবিদ্যার চর্চা একটা বড় জিনিস বলিয়া গণ্য হয় বটে, কিন্তু সে তাহার উপযোগিতার দিক দিয়া—মোটর, রেল, বিমান, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনাদি মানুষের নানা সুবিধা-সুযোগের বস্তু নির্মাণ করিবার জন্য। আজ মানুষের কর্ম ও চিন্তাধারা কেজো ও অকেজো এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সে চায় যাহা তাহার কাজে লাগে শুধু সেই বস্তুকেই,—অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রাণময়ের তুষ্টিসাধন হয়, তাহাকেই। এই তুষ্টির জন্য তাহার প্রয়োজন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন, আরাম-আয়েশ, আমোদ-আহ্লাদ, ভোগবিলাস, ধনসম্পত্তি —তারপর জাতিগত সমৃদ্ধি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যাপার পরিবার বা জাতি বা সমাজ যে নামেই সাধিত হউক না কেন

ইহার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তির তুষ্টি। প্রাণের তুষ্টির জন্য যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ, এই হইল আধুনিক জড়বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

মানুষ যে পারিবারিক জীবন গড়িয়াছে তাহা তাহার তিন প্রকার মূল বাসনা মিটাইবার উদ্দেশে। সে চায় মালিক হইতে, চায় অমর হইতে, চায় সাহচর্য, মৈত্রী, ভালবাসা পাইতে। স্ত্রী-সন্তান, দাসদাসী, পয়সাকড়ি, ঘরবাড়ীর প্রভু হইয়া সে প্রথম সাধ মেটায়। পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির মধ্যে সে অমরত্ব লাভ করে। গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ ভালবাসার ভিতর দিয়া তাহার সাহচর্যের কামনা পূর্ণ করে। সামাজিক জীবন এই গার্হস্থ্য জীবনেরই বিস্তার; সমাজে মৈত্রীসাহচর্যের ক্ষেত্র প্রসার লাভ করে। রাষ্ট্রীয় জীবনে এই ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়। সেখানে প্রভুত্ব, নেতৃত্ব, প্রাধান্য, ইত্যাদি লাভ করিয়া মানুষ অধিকতর আত্মপ্রসাদ পায়। রাষ্ট্রের সমবেত শক্তি-সামর্থ্য, ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি, প্রভাব-গৌরব আবার প্রত্যেকের গর্বের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এই সব ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণময় মানবের দুটি প্রেরণা পাশাপাশি কাজ করিতেছে—মিলিয়া মিশিয়া কর্ম এবং আড়া-আড়ি করিয়া কর্ম। দুটিই আছে মানুষের প্রাণে, কিন্তু স্বভাবত আড়া-আড়ির দিকটারই জোর বেশী। আমরা এরূপ লোক বিস্তর দেখি যাহাদের নজরে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এসবই তাহার ব্যক্তিগত উন্নতির সোপানে এক-একটি ধাপ মাত্র—সে সবার উপর টেক্কা দিয়া নিজে বড় হইতে চায়। তেমনই আবার রবিন হুড কি তান্তিয়া ভীলের মত লোক থাকে যাহারা চায় না মানে না সমাজ বা রাষ্ট্রের বন্ধন; তাহারা বনে-বনে বিচরণ করে সকলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া। তবে গুরুবর বলিতেছেন যে এসব আর বেশী দিন টিকিবে না, বিদ্রোহী ভবঘুরের স্থান থাকিবে না আধুনিক সমাজে।

মানুষ তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে ধীরে ধীরে যে পরিবার কুল সমাজ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে সে সর্বদা সমবেত সমষ্টিগত জীবনের সার্থকতা

খুঁজিতেছে। এই সমস্ত সমবায়ের মধ্য দিয়া সে একটা বৃহত্তর প্রাণময় অহমিকা চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে। ভারতের প্রাচীন কুলধর্মের বা আধুনিক যৌথ পরিবারের আদর্শের পশ্চাতেও রহিয়াছে এই অহমিকারই তুষ্টি। তবে এই আদর্শকে আমরা সর্বদা হীন বলিতে পারি না, কারণ চিরদিনই ইহার মধ্যে মুখ্য বস্তু ছিল ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রেরণা। শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক স্থূল বৈশ্যধর্মী সংকীর্ণ স্বার্থসর্বস্ব ইংলণ্ডীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শের সহিত ইহার প্রভেদ করিয়া বলিতেছেন, পারিবারিক অহমিকাও প্রাণময়েরই অহমিকা, আর কিছু নয়।

ব্যক্তির মত পরিবারেরও দুই প্রকার জীবনধারা। একটি পরিবার অপর পরিবাগুলির সহিত টক্কর দিয়াও চলিতে পারে, আবার আপনাকে একটা বৃহত্তর সামাজিক সমষ্টির মধ্যে ছাড়িয়া দিতেও পারে,—সমাজের লক্ষ্য, সমাজের তুষ্টিকে আপন লক্ষ্য ও আপন তুষ্টির সহিত মিলাইয়া দিতে পারে। তথাপি এই সামাজিক তুষ্টিও একটা প্রাণময় তুষ্টি—সেই ব্যক্তির ভেদ-জ্ঞান, ব্যক্তির স্বার্থ, ব্যক্তির অহমিকারই একটা বড় সংস্করণ। আধুনিক সমাজবাদীদের আদর্শের বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমাজবন্ধন মুখ্যত অর্থনীতিক, —পারিবারিক বন্ধনের চেয়েও বেশী। তার পর, এক সমাজের সহিত আর এক সমাজের লেন-দেন, আড়া-আড়ি আরম্ভ হইলেই রাষ্ট্রনীতি আসিয়া পড়িল। কেন না এই আড়া-আড়ি টক্করের প্রবৃত্তিকে সংযত. না করিতে পারিলে, নানা বিশৃঙ্খলা ও উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষ রাষ্ট্র সংঘটন করিয়া এই সমস্ত অনর্থের মূল উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়; এবং তাহার ফলে আরও বড় একটা অহমিকার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়,— সমবেত জীবনের একটা বীভৎস আসুরিক পরিণতি সম্ভবপর হইয়া উঠে।

এখন, এই যে মানবের আধুনিক সভ্যতা ও সমবেত জীবনধারা, যাহার মূলে রহিয়াছে প্রচণ্ড অহমিকা, প্রাণের তাড়না, স্বার্থের প্রেরণা, অর্থলিপ্সা,

নির্মম রক্তপিপাসা, ইহার সহিত তাহার উর্ধ্বতন বৃত্তিসমূহের কি সম্বন্ধ? কেন-না মানুষের দিব্য বৃত্তিনিচয় ত যায় নাই, তাহারা সেই আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত সদা ক্রিয়মাণ, ধীরে-ধীরে মানবকে তাহার অজ্ঞাতে লইয়া চলিয়াছে ভাগবত প্রকৃতির পানে। প্রাণশক্তির তাড়না, যাহাকে পাশব বৃত্তি বলা যায়, তাহার সহিত অন্তরের উচ্চবৃত্তিচয়ের যে সংঘর্ষ অহরহ চলিয়াছে তাহার কিরূপ নিদর্শন আমরা জীবনে দেখিতে পাই? ধর্ম ও নীতির প্রেরণা ত মানুষের মনে আছেই, তাহারা কি বলে মানুষের ভোগবিলাস স্পৃহাকে, তাহার অর্থলালসাকে, তাহার দ্বেষ হিংসা অত্যাচার অনাচারকে? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, তাহারা বলিবে কি, খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। প্রাণময় নর চায় ঐশ্বর্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধর্ম ও নীতি বলে নগ্ন রিক্ত দারিদ্র্যকে বরণ কর। প্রাণময় বলে ভোগ কর, ধর্ম বলে ত্যাগ কর; শুধু ত্যাগ কেন, আত্ম-নিগ্রহও করা চাই। প্রাণময় চায় কর্ম, অবিরাম কর্ম; ধর্ম চায় শান্ত অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ধ্যান-ধারণা। প্রাণময় চায় শৌর্য, বীর্য, পরাক্রম; ধর্ম চায় নম্রতা, বিনয়, অহিংসা। প্রাণশক্তি চায় বংশবৃদ্ধির জন্য যৌন-সম্বন্ধ; ধর্ম চায় ব্রহ্মচর্য, বংশবৃদ্ধি সে চায় না। সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় বরণ করে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, সাধু-সন্ন্যাসী খোঁজে সংসার ত্যাগ করিয়া একান্তে বাস। কেননা সে বুঝিয়াছে প্রপঞ্চ মানেই অলীক মায়া; সেখানে ভগবানের প্রতিষ্ঠা নাই, থাকিতেও পারে না!

তবে এই যে তপস্বীর সংসারে বিরাগ, ইহা হইতেও কখন-কখন সমাজ কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। সকল প্রতিক্রিয়ারই একটা উপকারিতা আছে। কিন্তু ইহাকে বেশী দূর যাইতে দিলে সমূহ বিপদ। রাজসিক জীবনীশক্তিকে বর্জন করিলে প্রগতির পথ বন্ধ হইয়া যায়। সামাজিক জীবন কিছুদিন অচল থাকিয়া তারপর পিছু হটিতে আরম্ভ করে। মানবের উচ্চতর বৃত্তিচয়ের বিকাশের জন্যও রাজসিক উদ্যমের একান্ত আবশ্যক। কেন

না বাহ্য কর্মজীবনের সহিত যোগ না থাকিলে তাহারা ধীরে-ধীরে শুকাইয়া যায়। প্রাচীন ঋষিরা একথা বুঝিয়াছিলেন ; তাই তাঁহারা জীবনকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গে বিভক্ত করিয়াছিলেন। চারিটিই ছিল অবশ্য অনুসরণীয়, তবে তাঁহাদের চক্ষে মুখ্য কাম্য ছিল মোক্ষ ; এই ধরাতলেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ তাঁহাদের অভিমত ছিল না। জীবনের চরম পরিণতি হইবে ইহলোকে নয়, অন্যত্র, এই ছিল সুধীজনের নির্দেশ। অবশ্য এ নির্দেশ পূর্ণযোগের সাধকের গ্রহণীয় নয়।

তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখা যাক যে আমাদের এই প্রাণশক্তি ও কর্মপ্রবৃত্তি, ইহারা কি স্বভাবতঃ ঈশ্বরদ্রোহী, ইহাদের মধ্য দিয়া কি আমরা ভাগবত চেতনাতে উঠিতে পারিব না ? শ্রীঅরবিন্দ বারবার বলিতেছেন যে আমাদের সত্তার মধ্যে বর্জনীয় কিছুই নাই, এমন কি জড়দেহও বর্জনীয় নয় ; দেহ-প্রাণ-মন, এই তিনেরই রূপান্তর সাধন আমাদের কাজ। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে ক্রমবিকাশের পথে জগৎ কিরূপে ধীরে-ধীরে নিশ্চেতনা হইতে অবচেতনাতে উন্নীত হইয়াছে, জীব কিরূপে সহজাত অধস্তন প্রেরণা হইতে যুক্তিবুদ্ধিতে জাগ্রত হইয়াছে। এই বিবর্তনের পথে জীবকুলের নানা কুৎসিত কুরূপ বস্তুর দর্শন মিলিয়াছে, নানা ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই জীব সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সন্ধান করিতে-করিতে কত সুন্দর-সুন্দর বস্তুর সাক্ষাৎও তাহার ঘটিয়াছিল। মানুষ তাহার জাগ্রত বুদ্ধিবলে আজ আপন দেহ-প্রাণের নানা উৎকর্ষ সাধিয়াছে, নব উদ্ভাবিত নানা বিদ্যা, নানা শাস্ত্রকে এই কর্মে নিযুক্ত করিয়াছে। অভিব্যক্তির পথে প্রকৃতি স্থির ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মানুষের আসল কাজ যাহা, তাহা এখনও বাকী। সে কাজ তাহাকে সাধিতে হইবে যুক্তিবুদ্ধির অতীত সূক্ষ্মতর অতিমানস বৃত্তির সাহায্যে।

আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন নানামুখী, কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে প্রেরণা আছে তাহা প্রধানত প্রাণশক্তির। এই জীবনধারা তখনই ঈশ্বরমুখী হয়, যখন তাহার মধ্যে ধীরে-ধীরে দিব্য তত্ত্ব নামিয়া আসে। দিব্য তত্ত্বের অবতরণ মানে আমাদের স্বাভাবিক ভেদজ্ঞানের বিলোপ, এবং তাহার স্থানে অভেদ বোধের জাগরণ। মানুষের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির অতীত যে সূক্ষ্ম বৃত্তি আছে, সেই জাগাইতে পারে এই অভেদ বোধকে। মানবজীবনে একটা মস্ত বড় বন্ধন প্রেমের বন্ধন। সংসারে এই প্রেমকে আমরা প্রকট দেখি দাম্পত্যভাব, স্নেহ-ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, সখ্য-মৈত্রী আদি নানা সুন্দর মধুর রূপে। এই প্রেমকে মিথ্যা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন কারণ নাই, কেননা ইহাই আমাদিগকে সংকীর্ণ অহমিকার বাহিরে লইয়া যায়, ইহারই মধ্য দিয়া আমরা ধীরে-ধীরে অভেদের দিব্য সত্যে উঠিতে পারি। তাই আমরা দেখি যে নানা ধর্ম এই অলৌকিক প্রেম ভালবাসার রসের ভিতর দিয়া ভাগবত প্রেম-রস শিখাইয়াছে। পরম প্রেমের প্রকাশ বলিয়াই ত জগতের এই সমস্ত সম্বন্ধ বন্ধন এত মিষ্ট, এত সুন্দর!

তেমনই মানুষের অপর সব ব্যাপার—যেমন অর্থোপার্জন, রাষ্ট্রনীতি, দেশপ্রেম—ইহাদের মধ্যেও খাদ যতই মেশান থাকুক না কেন, খাঁটি সোনার অভাব নাই। স্বচ্ছ, সুন্দর, সুষ্ঠু জীবন, উচ্চ আদর্শ, স্বার্থত্যাগ, শৌর্য-বীর্য, শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রভুত্ব, এসবই আমরা পাই অর্থ বা রাষ্ট্র বা জাতি বা দেশ-প্রেমের অনুসরণ করিয়া। তাই গুরুবর বলিতেছেন যে সভ্য মানবের নিত্য জীবনধারা তাহাকে আস্তে-আস্তে লইয়া চলিয়াছে পূর্ণতার পানে, একতার পানে, ভাগবত শক্তি ও ভাগবত প্রভাবের পানে। আড়া-আড়ি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষের মাঝেও জগতের জাতিসমূহ আজ অনুভব করিতেছে যে একদিন তাহাদের এক হইয়া কাজ করিতেই হইবে মহামানব জীবনের সার্থকতার জন্য। অবশ্য এখনও বিরোধ অসঙ্গতি বিস্তর, মানুষ এখনও পরম সত্যকে পরিষ্কার

দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না যে তাহার সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে তাহা শুধু বাহিরের মিটমাটের দ্বারা সিদ্ধ হইবে না, অন্তরের গভীরে অখণ্ড অভেদ চাই। তথাপি সংসার ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যেমন যেমন অতিমানসের দীপ্ত আদর্শ সম্মুখে আসিবে, তেমন-তেমন জগতের অভিন্ন একত্ববোধ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। মানবের ঐক্য সাধন করিতে পারেন শুধু তাহার অন্তরের দেবতা। এই অন্তরের দেবতা তাহার যুক্তিবুদ্ধি নয়; সে-দেবতা তাহার হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত নারায়ণ, যিনি তাহার দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়-বুদ্ধি আদি বড় ছোট সব বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চিরন্তন খেলা খেলিতেছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ধর্মের প্রেরণা

সর্বভূতের, সকল ব্যষ্টির ও সমষ্টির, সমস্ত ভাবনা কর্ম ও গতির যখন নিগূঢ় লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় ভগবান—তখন মানুষের যুক্তিবুদ্ধি তাহার চরম উপদেষ্টা বা পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। বুদ্ধি কেমন করিয়া পৌছিবে তাঁহার কাছে, যিনি বুদ্ধির অতীত! সে ইহজীবন বোঝে, ইহজীবনের ব্যাপারে জোড়াতালি মিটমাট করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে পারে; তাহার দৌড় এই পর্যন্ত। তেমনই সাধারণ অর্থে আমরা কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলিলে যাহা বুঝি, তাহাও মানুষের ধ্রুবজ্যোতি হইতে পারে না। মানুষের সকল গতি-বৃত্তিতে, জীবনের সকল ধারাতে এই সংস্কৃতি তাহার পরম বিধান হইতে পারে না, সঙ্গতিও আনিতে পারে না। পরমাত্মনের সন্ধান দিতে হইলে ইহাকে নিজেকেও আধ্যাত্মিক হইতে হইবে, অর্থাৎ যুক্তিতর্ক, নীতিজ্ঞান, সৌন্দর্য-বোধ, সবকে ছাড়াইয়া উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। তাহা হইলে পথহারাকে পথ দেখাইবে কে, কে আমাদের সেই ধ্রুবতারা? আশিয়ার মন উত্তর দিয়াছে, ধর্ম। প্রথম দর্শনে কথাটা ঠিকই মনে হয়, কেন না ধর্মের সোজা লক্ষ্য ভগবান—ধর্ম মানে ঈশ্বরমুখী সংকল্প, কর্ম ও সংযম। ধর্ম ছাড়া অপর সব-কিছু মানুষকে লইয়া যায় ঘোরা-ফেরা পথে, কেন না তাহারা দেখে শুধু বস্তুর বাহিরটা। তাই, শুধু আশিয়াতে কেন, সর্বত্র, সাধারণত মানুষ এই ধর্মের প্রেরণা ও ধর্মের আদর্শকে তাহার ভাবনাতে মুখ্য স্থান দিয়াছে। মাঝে-মাঝে একটা যুগ আসিয়াছে বটে যখন সে ধর্মের নেতৃত্বে আস্থা হারাইয়া যুক্তিবুদ্ধিকে ডাকিয়া নায়কের স্থানে বসাইয়াছে। সেইরূপই একটা যুগের মধ্য দিয়া আমরা এখন চলিয়াছি, যদিচ মনে হয় যে ধীরে-ধীরে হাওয়া ফিরিতেছে, ধর্ম আবার হাল ধরিবে। ধর্মের এই প্রাধান্যের কারণ

আমাদেরই অন্তরের কোন অজানা অভাব, কোন নিগূঢ় সত্য। তাই দুদিনের জন্য আমরা এ-পথ ছাড়িতে পারি, কিন্তু আবার ফিরিতেই হইবে।

অপর পক্ষে, ধর্মবর্জিত আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা তার বহু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মানুষের জন্য অনেক কিছু করিয়াছে। ষোড়শ শতকে যখন ইউরোপে গ্রীসীয়-রোমক সংস্কৃতির পুনর্জন্ম হয়, যখন ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা প্রবর্তিত হয়, তার পর হইতে আজ পর্যন্ত ঐ মহাদেশ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের অশেষ প্রকার হিতসাধন করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, প্রচণ্ড রাজসিক কর্মধারা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, গভীরে বীজবপন, অমূল্য ফলসম্পদ এই যুগের লক্ষণ। শুধু তাহাই নয়, মধ্যযুগের সঞ্চিত অজ্ঞান, অন্ধকার, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি অনেক কিছুকে এই যুগ বিদূরিত করিয়াছে। আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এ সমস্তই সাধিত হইয়াছে—ধর্মের দ্বারা নয়—মানবের জাগ্রত বুদ্ধিশক্তি, উচ্চ আদর্শ ও ভূতদয়ার দ্বারা। তাই আজ বিদ্রোহী ইউরোপ ধর্মের প্রাধান্য ও নেতৃত্বকে বাতিল করিয়া দিয়াছে। তাহার গর্ব যে ধর্মকে সে বধ করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম ত মরে না কখনও, নবরূপ পরিগ্রহ করে মাত্র। আজ অনেক স্থলে এইরূপ হইয়াছে যে সভ্য মানব ধর্মকে, পারত্রিক ব্যাপারকে, অন্তরের এক নিরালা কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে ঐহিক ব্যাপারে কোন আমলই দিতে চায় না, এমন কি সুনীতি-দুর্নীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও নয়। মানুষ ধরিয়া লইয়াছে যে বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিকে ধর্মের অন্ধ কুসংস্কারের সংস্পর্শ হইতে দূরে না রাখিলে তাহার প্রগতি ব্যাহত হইবে; তাহার চক্ষে ধর্ম মানেই অজ্ঞান, কুসংস্কার, অত্যাচার ও অন্ধ বিধিনিষেধ। ধর্মবাদী প্রত্যুত্তর দেয়, তোমার এই জড়জগৎ বিনাশী, এখানে সব-কিছু বিকারী বিনাশী, তুমি কাহার পিছনে ছুটাছুটি করিতেছে? তোমার বিদ্যা, প্রভুত্ব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সবই ঝুটা অলীক; আমার সদা-তুষ্ট, শান্ত, অচল, নিষ্ক্রিয় অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভাল।

কিন্তু সাধারণ চিন্তাশীল মানুষ, উদার ভাবুক, ইহা মানিয়া লইতে পারে না। সে বলে, ক্রমাগত নূতন একটা কিছু কর বলিয়া দৌড়াদৌড়ি খারাপ হইতে পারে, কিন্তু অটল নিষ্ক্রিয়তাকেই বা জীবনের বিধান বলিয়া মানিয়া লইব কেন? ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত জীবনের সমগ্র সত্যকে ত খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। উপরন্তু একথাও স্বীকার করিতে হয় যে সকল ধর্মের মুখ্য কাম্য ঈশ্বরসন্ধান হইলেও এই ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে কত অনর্থ ই না সংঘটিত হইয়াছে! এক-একটি বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাহার সংকীর্ণচেতা যাজক, প্রচারক, ও টিকাকারমণ্ডলী কতযে ঘৃণ্য বীভৎস কাণ্ড জগতে ঘটাইয়াছেন তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। কতবার মানুষকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া, গোঁড়া ধর্মবাদের ভুল-ভ্রান্তি, নীচতা, অত্যাচার-অনাচারের মাথায় অঙ্কুশ মারিয়া আপনাকে বাঁচাইতে হইয়াছে।

তবে এই সমস্ত সংকীর্ণতা বা জুলুম জবরদস্তির কাহিনীর কতটা সত্য, কতটা অতিরঞ্জিত, তাহার চুল-চেরা বিচার করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। ভাল জিনিসের বিকৃতি হয় বলিয়াই ত আর ভাল জিনিসটা খারাপ হইয়া যায় না! স্বাধীনতার নামেও০ত কত অনাচার-অত্যাচার, চুরি-বাটপাড়ি, খুনখারাবী হইয়া গিয়াছে; তাই বলিয়া মানুষ কি আর স্বাধীনতার আদর্শকে ছাড়িয়া দিয়াছে, না কখনও দিবে! তবে আমাদের জানা চাই যে ঈশ্বরের নামেও এইরূপ নীচতা স্বার্থপরতা অত্যাচার অনাচারের তাণ্ডব চলে, এবং বোঝা চাই যে কেন, কি কারণে চলে। সর্বপ্রথম খৃস্টান সম্রাটের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের প্রটেস্টাণ্ট নিগ্রহ পর্যন্ত সারা মধ্যযুগ ধরিয়া ইউরোপে ধর্মের দোহাই দিয়া যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সব চলিয়ায়াছিল তাহার কারণ কি? ফরাসী দেশে দুই খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ, সেণ্ট বারথলোমিউ-এর রাত্রে নৃশংস হত্যাতাণ্ডব, ঘাতক হস্তে পরে-পরে তিন হেনরীর অপমৃত্যু,—ইংলণ্ডে মেরী

ও এলিজাবেথের আমলে দুই পক্ষের বহু বড়-বড় লোকের প্রাণবধ, স্টুয়ার্ট রাজাদের পিউরিটান সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, পিউরিটানদের আমলে আবার সেই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ,—জার্মান দেশে ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া তিরিশ বছরব্যাপী নির্মম যুদ্ধ,—স্পেনে, ইতালীতে তথাকথিত ধর্মদ্রোহীদের উপর ভীষণ জুলুম, এইরূপ কত জঘন্য ব্যাপার যে ইউরোপীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাক্‌খৃষ্টীয় সম্প্রদায় সমূহের গোঁড়ামি খৃস্টানের চেয়ে অনেক কম ছিল; কিন্তু তাহারাও ধর্ম ও নীতির নামে সক্রেতিস্‌-কে হত্যা করিয়াছিল, মিথ ও আইসিস্‌-পূজকদিগের উপর অল্পবিস্তর অত্যাচার করিয়াছিল। ভারতের হিন্দুধর্ম মূলত উদার ও সহনশীল; তথাপি এখানেও জৈন, বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পর দ্বেষ-হিংসা অত্যাচার-অবিচারের নিদর্শন আমরা ইতিহাসে অনেক কিছু দেখিতে পাই। গোঁড়া মুসলমানদিগের কথা উল্লেখ না করিয়াও বলা যায় যে জগতে সাধারণত ভগবানের নামে অশেষ জুলুম-অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে। এই সমস্ত অনাচারের জন্য অনাচারী কোন দিন লজ্জিত হয় নাই, তাহারা চিরদিন ভাবিয়াছে যে কর্তব্যপালনই করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে এই সকল ব্যাপারের মূলে যে প্রেরণা থাকে তাহা সত্যধর্মের প্রেরণা নয়, সংকীর্ণ সম্প্রদায়িক ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ এরূপ জুলুম-জবরদস্তি করে, অজ্ঞান মানব-মন তাহার আপন বিশিষ্ট বিশ্বাস বা বিশিষ্ট পন্থা বা বিশিষ্ট ক্রিয়াকর্মধারাকে ভাগবত ধর্ম বলিয়া ভুল করে।

এই জন্যই ধর্ম কখনও আমাদের সমাজের বা জীবনধারার চালক বা নিয়ামক হইতে পারে নাই। যতদিন সত্য ধর্মের জ্যোতিতে আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত না হইবে, ততদিন হইবেও না। ধর্ম মানে মানুষ বুঝিয়াছে সাম্প্রদায়িক মতবাদ, সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক বিধিবিধান, এক কথায় তাহার আপন ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকের আদেশ। এ-বস্তুকে মানুষ তাহার

লৌকিক জীবনে অভ্রান্ত দিব্যবিধান বলিয়া মানিয়া লইবে কেন? ফলে সে তাহার পারত্রিক হিতাহিতকে মাত্র যাজক-পুরোহিতদের হস্তে তুলিয়া দিয়া ঐহিক সমস্ত বিষয়ে বিদ্বন্মণ্ডলির অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে। ফলে, একদিকে পুরোহিত, অপরদিকে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, তাহাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যানুশীলনে ব্যাপৃত। যাজক ও পুরোহিত সত্যকে ভয় করে, কেন না, তাহাদের প্রতিষ্ঠা অসত্যের উপর। অতএব গালিলিও, ব্রুনোর মত নির্ভীক সত্যসন্ধানীকে না মারিলে তাহার চলিবে কেন! এক সময়ে বিজ্ঞানদর্শনের অনেক গ্রন্থই ত পোপের নিষিদ্ধপুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল! আসল কথা, ধর্ম সত্যকে ভয় করে না বটে, কিন্তু তাহার অনুচরবর্গ যথেষ্ট ভয় করে। ধ্রুব সত্যের প্রচার মানেই যে ভগবানের মহিমা প্রচার, একথা যাজকবর্গ বোঝেন না, বা বুঝিতে চাহেন না। তাই আমরা ব্যাবহারিক জগতে দেখি যে তথাকথিত ধার্মিক লোক এত সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া থাকে। সেকালের পিউরিটানেরা নাচগান, আমোদ-আহ্লাদ সব নিষেধ করিয়াছিল, কেন না তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে ধর্ম মানে সকল রকমের ভোগ বর্জিত রিক্ত নগ্ন জীবন। এরূপ বিশ্বাস অর্ধ-অন্ধ মানবমনের সংকীর্ণতা বই আর কি হইতে পারে! সত্যদর্শী যোগী জানেন যে প্রেম ও সুষমাকে বাদ দিয়া ভগবানের কল্পনা হইতে পারে না। যথার্থ ধর্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম, আত্মাতে যাহার বাস। শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম ও ধার্মিকতা, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করিয়া বলিতেছেন যে ধার্মিকতা কতকটা বাহ্য ব্যাপার, তাহার সম্পর্ক বিধিবিধান, আচার-অনুষ্ঠান, এবং ক্রিয়া-কর্মের সহিত। এই ধার্মিকতা আপন প্রভাব বৃদ্ধি করে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া নয়, রাজা বা পোপ বা যাজক-মণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া। যখন যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির হস্তে মারক-যন্ত্র হইয়া প্রজা পীড়ন করে, যেমন যেসুইট সন্ন্যাসী সম্প্রদায় করিয়াছিল ইউরোপের নানা দেশে। কখন আবার রাজার সহিতই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, যেমন বেকেট হইয়াছিল ইংলণ্ডের

দ্বিতীয় হেনরীর সহিত। কখন হয়ত সে একটা জরাজীর্ণ সমাজ ও তাহার অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উন্নতির পথ রোধ করে, যাহা আমরা ভারতে বহুবার দেখিয়াছি। একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে বুদ্ধির বা রাষ্ট্রীয় আদর্শের বা নীতিজ্ঞানের বা সৌন্দর্যবোধের যে বিদ্রোহ পৃথিবীতে যুগে-যুগে ঘটিতেছে তাহা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নয়, ভাগবত ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, বাহ্য ধার্মিকতার বিরুদ্ধে। ধর্মকে যদি সংসারের মুখ্য বস্তু করিতে হয় ত সে-ধর্ম হওয়া চাই ঈশ্বর-সন্ধান। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে ক্রিয়া-কর্ম আচার-অনুষ্ঠান, ইহারাও সর্বথা বর্জনীয় নয়; বরং ইহাদের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। আমাদের সত্তার মধ্যে বর্জনীয় কিছুই নাই। স্থূলতম তত্ত্বকেও ধীরে-ধীরে দিব্যজ্যোতির আলোকে রূপান্তরিত করিতে হইবে। ক্রিয়াকর্মেরও সেই কথা; সমাজের অধস্তন স্তরে ইহাদের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে তাহা ধর্মের সহায় হিসাবে মাত্র, মূল বস্তু বলিয়া নয়। মানুষের স্কন্ধে ইহাদিগকে অমোঘ বিধান বলিয়া চাপাইলে ক্রমবিকাশের কার্য অযথা বিলম্বিত হয়।

ধর্মের মুখ্য বস্তু তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক স্বরূপ। কিন্তু এখানেও একটু গোলযোগ আছে। এই আধ্যাত্মিকতা কি পার্থিব জীবন হইতে বিচ্যুত, তাহার সহিত অসমঞ্জস? আত্মোপলব্ধির জন্য কি দেহ-প্রাণ-মনের নিগ্রহ নিপীড়ন ও বিনাশসাধন করিতে হইবে? তাহা ত হইতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে আমাদের সত্তার প্রত্যেক তত্ত্ব তাহার আপন বিধান, আপন ধর্ম অনুযায়ী পূর্ণতা খুঁজিতেছে। গীতার কথা, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?

বাস্তবিক ধর্মের অর্থ যদি এই হয় যে পার্থিব জীবনকে বর্জন করিতে হইবে, তাহা হইলে মানুষ তাহার সমাজ-গঠন বা সমাজ-চালনায় কাছে ধর্ম হইতে কোন প্রেরণাই পাইতে পারে না। স্বর্গরাজ্য ও মর্ত্যরাজ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া

পড়ে। তাহার উপর আবার যদি সে আপন সার্থকতা খোঁজে শুধু দুঃখ-বেদনার মাঝে, তাহা হইলে ত চূড়ান্ত হইল! ইহলোকে, ইহজীবনে, আর কোন রসই রহিল না। তখন মানুষ বুঝিবে যে যত শীঘ্র এই মায়াময় জগৎকে ত্যাগ করিতে পারিব, তত শীঘ্রই আমার ব্রহ্মপদে প্রবেশ ঘটিবে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে এই প্রকার নৈরাশ্যবাদ হইল আনন্দময় ভগবানকে প্রত্যাখ্যান, তাঁহার পরম জ্ঞান এবং পরম শক্তিতে অবিশ্বাস, মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধানের অস্বীকৃতি। আধুনিক ভারতীয় হিন্দু এ মনোভাব উত্তমরূপেই চেনে, এই তাহার অশেষ দুর্গতির মূল।

অপর পক্ষে, ষোড়শ শতকের জাগরণের পর হইতে ইউরোপীয় মানবের মন চলিয়া গিয়াছে একেবারে বিপরীত দিকে। সে জগৎকে, ঐহিক জীবনকে, প্রচণ্ড রাজসিক উদ্যম সহ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু পারত্রিক জীবনকে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছে। দুই মনোভাবই সমান ভুল। সর্বময়কে এইরূপে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। তিনি বিশ্বগত, তিনি বিশ্বাতীত। সবই তাঁহাতে, তিনিই সবেতে, সবই তিনি। তাঁহার অর্ধেক গ্রহণ করিয়া অর্ধেক ত্যাগ করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়। জড়বাদী তাঁহার জড়বাদকে অনুসরণ করিয়া বাহ্য জীবনে সার্থকতা পাইতে পারেন, সন্ন্যাসী তাঁহার সন্ন্যাসের অনুধাবন করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দুইজনের কেহই মানব-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তিতে যথার্থ সহায় ও চালক হইতে পারেন না। এই দুই পথের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন ভারতের প্রাচীন ঋষি, যিনি এই মর-জীবনেই মনোবুদ্ধির অতীত আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কেনোপনিষদেরও এই কথা, ইহলোকে যদি জানিলে তবেই সত্য, ইহলোকে যদি না জানিলে ত মহতী বিনষ্টি। যে মানুষ অধস্তনের সীমাগণ্ডীকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে, আর উপরের দৃষ্টি লইয়া সব-কিছুকে দেখিতে শিখিয়াছে, সেই আমাদের যথার্থ চালক।

তাহা হইলে এক আত্মোপলব্ধির মধ্যেই আছে সেই জ্যোতি, যাহা মানুষকে পথ দেখাইয়া চলিতে পারে। ধর্ম যদি সেই আত্মনের সন্ধান ও উপলব্ধি না হয় ত সে মানুষের আর পাঁচটা বিদ্যার মধ্যে একটা বিদ্যা মাত্র হইয়া রহিল, জীবনের পরম সাথী হইতে পারিল না। অধস্তন ধর্ম মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করে, কিন্তু যথার্থ ধর্মের সার্থকতাই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্য সে দেয় আমাদের সত্তার সকল মূল তত্ত্বকে, কেন না সকল তত্ত্বের দিব্য-রূপান্তরই মানবের যথার্থ সাধনা। প্রাচীন ভারতের ধর্ম স্বাধীনতার এই রহস্য পূর্ণভাবে বুঝিয়াছিল, তাই সেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিল সকল বিদ্যা, সকল দর্শনকে। যে আত্মাকে পর্যন্ত অস্বীকার করিত, তাহারও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল আপন মত ব্যক্ত করিবার। এই অর্থে যদি আমরা আবার ধর্মকে দেখিতে শিখি ত ধর্মই আগের মত মানুষের বিশ্বস্ত চালক ও নিয়ন্তা হইবে, মানবজীবনের সকল কর্মে—তাহার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সকল বিষয়ে। মানবের সকল কর্ম দীপ্ত হইয়া উঠিবে সত্যধর্মের দিব্য জ্যোতিতে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় জীবনের অভিব্যক্তি

তাহা হইলে ব্যষ্টির ও সমষ্টির পূর্ণতা লাভের একমাত্র আশা আত্মনের আশ্রয় গ্রহণ—যে সঙ্কীর্ণ আত্মন্ আপন তুষ্টির জন্য সংসার হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় সে-আত্মন্ নয়, বরং সেই বৃহত্তর আত্মন্ যে সংসারকে স্বীকার করিয়া লয় এবং তাহাকে দীপ্ত সার্থক করে। যে-আধ্যাত্মিকতা মানুষের গতিবৃত্তি, ক্রিয়াকর্ম, কল্পনা-ধারণা, ভাব-আবেগ আদি তাহার সব-কিছুকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে, সে-আধ্যাত্মিকতা যুক্তিবুদ্ধিরও অগ্রাহ্য হইতে পারে না। মানবজীবনে আত্মার আধিপত্যকে এই অন্তর্মুখী যুগ আর উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। সামাজিক জীবনের পূর্ণপরিণতির জন্য দিব্যজ্যোতির একান্ত প্রয়োজন। সেই জ্যোতির আবাহনের দ্বারা ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপন—ভগবানের রাজত্ব, মানবের অন্তরস্থ দিব্যপুরুষের দ্বারা শাসিত —জগতে ক্রমবিকাশের লক্ষ্য। তবে এই নবীন রাজ্য স্থাপনের জন্য মানবের যে পরম রূপান্তর আবশ্যক তাহা ত সহজলভ্য নয়, অকস্মাৎ জাদুবলে তাহা আসিবে না। তথাপি সেরূপান্তর অলৌকিক বটে, কেন না তাহা আমাদের আজিকার অবস্থায় অভাবনীয়। তবে পরমেশ্বর নিত্যই অঘটনের সংঘটন করিতেছেন। বিবর্তন মানে পূর্বে যাহা কোরকরূপে ছিল তাহারই বিকাশ। কখন-কখন কিন্তু এমন হয় যে বিকাশের ঠিক পূর্বে যেন একটা বিপরীত গতি দেখা যায়। হয়ত মন অন্তর্মুখী হইয়াছে, রূপান্তর সাধনের অনুকূল, অথচ দেখা যায় যেন জীবনধারা উল্টা পথে চলিয়াছে। ইহার কারণ শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, বনিয়াদ পাকাপোক্ত নয়, মাল-মশলা যত চাই তত নাই, আরম্ভে অন্তর্দৃষ্টি অগভীর ও সংকীর্ণ। এ-বিপত্তির আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া যায় যদি প্রারম্ভে একটা স্বাধীনভাব, জ্ঞানানুশীলন ও কর্মের নানামুখী

গতি ব্যাপকভাবে থাকে। সে-অবস্থায় আশু পূর্ণ-পরিণতি লাভ না হইলেও মানুষ প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারে।

আগেই বলা হইয়াছে যে মানবসমাজের অভিব্যক্তির তিন স্তর। প্রথম, সহজাত বোধ ও সহজ প্রেরণার যুগ, যখন মানুষের যুক্তিবুদ্ধি বিকশিত হয় নাই। তারপর বুদ্ধির যুগ, যখন মানুষের জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তি তাহার সঙ্কল্প ও কর্মের ভার লইয়াছে, তাহার সবকিছুকে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সর্বশেষে আধ্যাত্মিক বা বুদ্ধির অতীত যুগ, যখন মানুষের সকল ভাবনা সকল কার্য চালিত হইবে আত্মনের নির্দেশে—লক্ষ্য ভগবান, অনুমন্তা ভগবান, রথের সারথি ভগবান। তবে ইহাও ঠিক যে আত্মনের নির্দেশপালন মানে অন্ধভাবে ধর্মযাজকের বা ধর্মগ্রন্থের বা শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্মের অনুসরণ নয়।

এই যে মানবমনের বিকাশে তিন স্তর, ইহা তাহার অন্তরের ব্যাপার, ইহা নির্ভর করে না তাহার আবেষ্টন বা বাহিরের কার্যক্রমের উপর। তিনটি একই সময়ে পৃথিবীর নানাভাগে থাকিতে পারে; আবার একই মানুষের ভিতরে—সে সভ্যই হোক বা বর্বরই হোক—তিনটিই একসাথে থাকিতে পারে। মানুষ ত পশু নয়, তাই সে বর্বর অবস্থাতেও পুরাপুরি সহজাত প্রেরণার বশীভূত হইতে পারে না। আবার সে দেবতাও নয়, তাই তাহার দিব্য রূপান্তর ঘটিলেও তাহার মধ্যে বুদ্ধিজীবী মানব ও অধস্তন-প্রেরণাচালিত পশুবৎ মানব দুই থাকিতে পারে। তেমনই মানুষ যখন পূর্ণ মনোময় জীব, যুক্তিবুদ্ধি-চালিত প্রাণী, তখনও তাহার মধ্যে দিব্য ও পাশব উভয় ভাবেরই খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এমনই জটিল প্রাণী মানুষ! তেমনই জটিল আবার মানুষের সমাজ। ব্যষ্টি বা সমষ্টি, দুইয়ের মধ্যেই মানুষ যে শুধু এক স্তরের খেলাই খেলিবে তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেতও নয়, সম্ভবপরও নয়। সব চেয়ে অধম অবস্থাতেও তাহার মনে যুক্তিতর্ক ও আধ্যাত্মিকতা দুই কিছু-কিছু আছে। অসভ্য বর্বরের মনেও ইহলোক, পরলোক, জীবন

ও ধর্ম বিষয়ে কিছু ধারণা থাকে। এ ধারণা হয়ত আজ আমাদের কাছে মনে হইবে অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে বর্বরও চিন্তা করে, ভাল-মন্দে ভেদ করে একটা সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত দাঁড় করায়। তাহার মনের গ্রহণশক্তি অল্প, তাই সে অনেকটা নির্ভর করে স্থূল প্রতীকের উপর, বাহ্য রূপের উপর। তবে মোট কথা এই যে তাহার বুদ্ধি ও আত্মা দুই তাহার দেহপ্রাণের স্থূল প্রেরণার বশবর্তী। যাহাদিগকে আমরা বর্বর জাতি বলি তাহারাই জগতের আদিমতম মানব নয়। অধস্তন সহজাত প্রেরণা-চালিত মানবও একটা সভ্যতার ধারা প্রবর্তিত করিতে পারে। তাহার ভাবনা, কল্পনা, জীবনধারা, স্থায়ী সমাজবন্ধন, ধর্মশাসন, সবই থাকিতে পারে; তবে প্রতীক পূজা ও বাহ্য ক্রিয়াকর্মই হয় তাহার ধর্মের প্রধান অঙ্গ। শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা বা শুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধি থাকে শুধু মুষ্টিমেয় লোকের অন্তরে। তবে প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এই লোকেদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে। তাই প্রগতিশীল জাতি সময়ে পৌঁছিতে পারে একটা যথার্থ যুক্তিবুদ্ধি-প্রধান যুগে, অথবা পৌঁছিতে পারে একটা ধর্মপ্রধান আধ্যাত্মিক যুগে। প্রথমটির উদাহরণ প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতা, দ্বিতীয়টির প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি। গ্রীসে প্রাধান্য ছিল চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিকের, ভারতে প্রাধান্য ছিল সাধুসন্ত সাধক ভক্তের। গ্রীসে যেমন দার্শনিকের চিন্তা ধীরে-ধীরে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ভারতে তেমনই ভক্তসাধকের সাধনা সমাজকে বিচিত্র রঙ্গে রঙ্গীন করিয়াছিল। কিন্তু এ সমস্তই ছিল নির্বুদ্ধি জনসাধারণের মনের উপর প্রথম আলোকসম্পাত। মানুষ উর্ধ্বতন প্রভাবকে ধীরে-ধীরে মানিয়া লইতেছিল, কিন্তু তখনও তাহার গূঢ়মর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই।

ভারতের বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে এই উর্ধ্বতম প্রভাব ব্যাপক হইয়া উঠিতে লাগিল। ভারতীয় সাধকমণ্ডলী যে-বীজ বপন

করিয়াছিলেন, তাহা ফল-ফুল শোভিত বৃক্ষে পরিণত হইল উপনিষদের যুগে। আর প্রাচীন গ্রীসে জনাকয়েক ভাবুক একান্তে বসিয়া যে ভাবনা ভাবিয়াছিলেন তাহাই সক্রিষ্ট-যুগে অগণন ছোটবড় লেখক, কবি, মনীষী, সাধক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের বন্যা ছুটাইল। অস্ফুটবুদ্ধি মানবেরও একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ আছে যাহা যুক্তিনিয়ত নয়। সেই বিকাশ সময়-সময় তাহার উর্ধ্বগতির পথে যুক্তিবুদ্ধিকে টপকাইয়া উপরে উঠে। ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ উল্লম্ফন সহজ, কিন্তু সমগ্র জাতির পক্ষে নয়। মনোবুদ্ধি পূর্ণপরিণত হইলে তবেই না জাতির আধ্যাত্মিকতা প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে! কিছুকালের জন্য এই প্রকার আকস্মিক পরিণতি চলিতে পারে। কিন্তু বেশী দিন তাহা টিকে না, কারণ সারা জাতি তখনও প্রস্তুত নয়। তাই মানুষ আবার পিছু হটিয়া যায়। প্রথম উদ্যমের বেগ কমিয়া গেলে নূতন দার্শনিক চিন্তাবলী যেন কেমন দানা বাঁধিয়া যায়, আধ্যাত্মিকতা চাপা পড়ে বাহ্য ক্রিয়াকর্ম-রাশির তলে। উচ্চ স্বাধীন চিন্তার ধারা আবদ্ধ হইয়া যায় শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বা সমাজের উচ্চতম স্তরে। জনসাধারণ ক্রমশ গতানুগতিক ও আচারের খর্পরে পতিত হয়। তবে বুদ্ধির উন্মেষ যখন একবার ঘটিয়াছে তখন তাহারা আর পূর্বেকার অন্ধ-প্রেরণার যুগে ফিরিতে পারে না। তথাপি সমাজকে এইরূপ অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হয় কিছুকাল, যত দিন না সবার মধ্যে সাধারণ ভাবে যুক্তিবুদ্ধি জাগিয়াছে, সবাই চিন্তা করিতে শিখিয়াছে।

কিন্তু এই জাগরণের পথে বিপত্তিও অনেক। মানুষ ধীরে-ধীরে তাহার প্রবুদ্ধ বুদ্ধিকে সহায় করিয়া বহুমুখী কর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে। তবে এই বুদ্ধি পৃথিবীর সকল সমাজে সকল জাতিতে সমান ভাবে ফুটিয়া উঠে না। যাহাদের মধ্যে উঠে তাহারাই হয় সভ্য জাতি; যেমন ইউরোপখণ্ডে গ্রীস রোম, আফ্রিকাতে মিসর, আশিয়াতে অসুর, চীন, পারস্য ও ভারত। কিন্তু এই সভ্য সমাজগুলি বরাবর পরিবেষ্টিত ছিল অস্ফুটবুদ্ধি

কিন্তু শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত বর্বর জাতিচয়ের দ্বারা। রাষ্ট্রশক্তির অবনতি হওয়ায় সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রবল বর্বর জাতিরা প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করিল। এইরূপ ধ্বংসক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল যতদিন না প্রাকৃত-বিজ্ঞান চর্চা সভ্য জাতিসমূহকে তোপ বন্দুক বিমানাদি দিয়া সজ্জিত করিয়া দিল। প্রাচীন এক-একটি সভ্যতা যেই বিনষ্ট হইল বর্বর হস্তে, অমনই প্রকৃতিদেবী আরম্ভ করিলেন তাঁহার ক্রমবিকাশের কাজ সেই বিজয়ী বর্বরদের মধ্যেই। আবার নূতনতর সভ্যতা, নূতনতর সংস্কৃতি সব গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। ইতিহাসে ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে। ফ্রাঙ্ক জাতি নবীন সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করিল শার্লমেন-এর মহান সাম্রাজ্য। শকজাতি গড়িয়া তুলিল তক্ষশিলার বৌদ্ধ সাম্রাজ্য, তৈমুরলঙ্গের বংশধরেরা গড়িল দিল্লীর বাদশাহী। কিছু লোকসান মানুষকে স্বীকার করিতে হইল বটে, কিন্তু মোটের উপর লাভ যথেষ্ট হইল।

এছাড়া অন্যরকমের বিপদ-আপদও আসিয়াছিল। প্রাচীন সভ্য দেশসমূহের ভিতরে নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। তত্রত্য সঙ্কীর্ণচেতা পুরোহিত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী জ্ঞানকে জনসাধারণের অধিগম্য করিতে গিয়া তাহাকে নানা স্থূল বাহ্য রূপ দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে গতানুগতিক, আচার ও ক্রিয়াকর্মের প্রভাব বাড়িতে থাকিল। যাহা যথার্থ বস্তু, যুক্তিবুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা, তাহা পশ্চাতে লুকাইল। জাতীয় সংস্কৃতি যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িল। যথাকালে নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অবধি অধঃপতনের সূত্রপাত হইল, তাঁহারাও স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা হারাইতে বসিলেন। সেই দুর্দিনে পূর্বতন সংস্কৃতি কোন রকমে ঐতিহ্য, অমোঘ বিধিবিধান, কঠিন সমাজবন্ধন ইত্যাদির সাহায্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিল। মাঝে-মাঝে এক-একজন মহাপুরুষ আসিতে থাকিলেন বটে, নূতন জ্ঞান, নূতন ধর্ম ও নূতন বিদ্যার প্রবর্তন করিয়া সমাজের উত্তরণের পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য। তবে সে অল্পকালের নিমিত্ত মাত্র। এক

এক নব সম্প্রদায়ের অধঃপতন হয়, আর একটির উত্থান হয়। এই ভাবে প্রকৃতি-দেবী মানবসমাজে তাঁর ক্রমবিকাশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। পরিশেষে একদিন বুদ্ধির দীপ্তি সমাজের নিম্নতম স্তর অবধি নামিয়া আসিয়া জীবনের সহিত সূক্ষ্ম ধীশক্তির সংযোগ স্থাপিত করিয়া জগতে পূর্ণ যুক্তিবুদ্ধির যুগ আনিয়া দিবে।

যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা চালিত মানব-সমবায়ের প্রগতির তিনটি বিভিন্ন স্তর লক্ষিত হয়। প্রথম—ব্যক্তিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যাহার মূলনীতি স্বাতন্ত্র্য; দ্বিতীয়—সমষ্টিবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে সমষ্টিই সর্বেসর্বা, ব্যষ্টিসত্তা লুপ্তপ্রায়, মূলনীতি সাম্য; তৃতীয়—নৈরাজ্যবাদ, রাষ্ট্র নাই, শাসন নাই, মূলনীতি মৈত্রী। এই তৃতীয় স্তরে উঠিবার সময়েই বোঝা যাইবে যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি তাহার ভেদ-অহমিকার সমস্যা মিটাইতে পারিবে, না কোন সূক্ষ্মতর উচ্চতর সমর্থতর বৃত্তির হাতে চালনার ভার তুলিয়া দিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে অন্ধ আচারবাদের যুগের পরে আসে ব্যক্তিবাদ, এবং এই ব্যক্তিবাদই প্রবেশদ্বার খুলিয়া দেয় যুক্তিবুদ্ধির যুগকে। তাহার আগেও যে ভাবুকজন সমাজসমস্যার কথা ভাবিতেন না, তাহা নয়। ভাবিতেন, তবে সে-ভাবনার ধারা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত ছিল না। তাঁহারা সকল দিক হইতে নিরীক্ষণ বিশ্লেষণ করিতেন না, যুক্তির দ্বারা একটা বড় সত্যকে ধরিয়া তাহাকে সকল বিষয়ে প্রয়োগ করিতেন না। বাস্তব জীবনধারা যেভাবে চলিতেছে তাহা নজর করিয়া দেখিতেন, এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বোধির দ্বারা তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতেন। তার পরে তিনটি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া মানুষের মনোময় জীবন গড়িয়া তুলিতেন। প্রথম প্রতীক, দ্বিতীয় আদর্শ ও তৃতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতীকের দ্বারা জীবনের সত্যকে রূপ দিতেন, আদর্শের দ্বারা তাহাকে বিধিবদ্ধ করিতেন এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তাহাকে কার্যকরী করিয়া লইতেন। যুক্তিবুদ্ধি কিন্তু জানে ও মানে শুধু একটি প্রতীক, মানস-কল্পনা। এই কল্পনার আলোতেই সে জীবনকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চায়।

জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীকে সে ইহারই সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চায়, আপন আয়ত্তে আনিতে চায়। তাহার মানস-কল্পনাকে সে জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিতে চায়। সে অবিরাম বাস্তবকে যাচাইয়া লইতেছে, কল্পনাকেও যাচাইয়া লইতেছে, দেখিতেছে দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি আছে কি না। সঙ্গতি না থাকিলে, বা নূতন কোন ঘটনা নজরে পড়িলে নূতন-নূতন কল্পনার আবাহন করিতেছে। কল্পনার পরিবর্তন করিতে সে সদাই প্রস্তুত। কেননা যাহা ঘটিতেছে বা যাহা ঘটিতে পারে, যাহা উপলব্ধ সত্য, বা যাহা কল্পিত সত্য, সবই তাহার হিসাবে আনিতে হইবে। কল্পিত সত্য, আদর্শ সত্য, এও ত তাহাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাই বলা হয় যে বুদ্ধির যুগ ও প্রগতির যুগ একই কথা।

যখন পুরানো প্রতীক, আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থহীন গতানুগতিকে পর্যবসিত হয়, তখন আর পূর্ববৎ মনোময় জীবন চলে না। শুদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসরণ কিছুদিন চলিতে পারে, চিরদিন নয়। কেন না জাগ্রত বুদ্ধি সমগ্র কার্য-কারণ না বুঝিলে তুষ্ট হইবে না। শুধু পুরানো বলিয়া ঐতিহ্যকে মানিবে না, আগে একসময়ে কাজে লাগিয়াছিল বলিলেও শুনিবে না। সে জানিতে চাহিবে এখনও ইহা জীবন্ত সত্য আছে কি না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কি না। কোন আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান, সর্বসম্মত বলিয়াই সে তাহাকে মানিয়া লইবে না। বরং আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সবাই সম্মতি দিয়া ঠিক কাজ করিয়াছে কি? কোন প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া লইবে না তাহা খানিকটা কাজে লাগে বলিয়া। জিজ্ঞাসা করিবে, নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া লইলে তাহা কি আরও পূর্ণভাবে কাজে লাগিবে না? মোট কথা, বুদ্ধির যুগ মানেই সব-কিছুর বিচার করা, সব-কিছু যাচাইয়া লওয়া, সমগ্র জীবনব্যাপারে যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ করা।

এখন, এই যে বুদ্ধির কথা বলা হইতেছে, এ কাহার বুদ্ধি? একটা বিশিষ্ট

শাসকসম্প্রদায়ের বুদ্ধি হইলেও চলিবে না। কেন না সে-বুদ্ধিকে চালক বলিয়া গ্রহণ করিলে ফল হইবে সেই সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও অধিকারকে কায়েম করা। জনাকয়েক সুধী ভাবুকের বুদ্ধি হইলেও চলিবে না। কারণ জনসাধারণ যদি অস্ফুটবুদ্ধি থাকে তাহা হইলে উক্ত সুধীজনের বুদ্ধিও কার্যত বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইবে। তাই যে-বুদ্ধি সমাজ গড়িবে, সমাজ চালাইবে, তাহা প্রত্যেকের এবং সবার বুদ্ধি হওয়া চাই। এজন্য ব্যক্তিবাদী গণতন্ত্রের প্রয়োজন, যেখানে রাষ্ট্রশাসন ও জীবনবিধান নির্ণয় বিষয়ে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। নহিলে শ্রেণীপ্রাধান্য আসিয়া পড়িবে। অবশ্য শাসক-শ্রেণী শাসিতের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা আসিল না। গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান লক্ষণ এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে, কিন্তু অপরের সেই অধিকারকে কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ করিবে না। অধিকন্তু এটাও প্রয়োজন যে প্রত্যেকের এতটুকু বুদ্ধি আছে যে তাহাকে যাহা বোঝান হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিবে, অপরের মতকে শ্রদ্ধা করিবে এবং সকলের সাথে পরামর্শ করিয়া নিজ করণীয় স্থির করিবে। দশের কাজ যাহাতে দশের মত অনুসারে চলে, সেইরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। অপরাপর বিষয়ে, অর্থাৎ তাহার নিজের কাজে, ব্যক্তি আপন বুদ্ধির নির্দেশ মানিয়া চলিবে।

কার্যত কিন্তু দেখা যায় যে এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও টিকে না বেশী দিন। সাধারণ মানবের বুদ্ধি এখনও অস্ফুট। সে কাজ করে প্রধানত সহজাত প্রেরণা ও সংস্কারের বশে, নয়ত চালিত হয় চালাক-চতুর কাজের লোকের দ্বারা। যেটুকু বুদ্ধি সে প্রয়োগ করে, তাহাও অপরের সাথে একমত হওয়ার জন্য নয়, বরং কলহ করিয়া আপন জিদ বজায় রাখিবার জন্য। কদাচ কখনও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সে সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু

সাধারণত নিজের সংস্কার-প্রেরণাকে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার কাজেই সে ব্যস্ত থাকে। ইহাতে তাহার গণতান্ত্রিক আদর্শ নিশ্চয়ই খর্ব হয়। এইরূপে মানুষ যে কেবল তাহার বুদ্ধির অপব্যবহার করে তাহা নয়, যে-স্বাতন্ত্র্য সে পাইয়াছে তাহারও অবমাননা করে। ইহাতে সমাজে সঙ্গতি বা একপ্রাণতা ত আসেই না, বরং পরস্পরের সহিত টক্কর দেওয়াটাই মুখ্য করণীয় হইয়া দাঁড়ায়। মৈত্রীর আদর্শ কোথায় পড়িয়া থাকে, শুধু দেখা যায় স্বাতন্ত্র্যের বিকৃত পরিণাম।

ব্যক্তিবাদী গণতন্ত্র ধীরে-ধীরে লইয়া আসে সংখ্যাধিক স্বল্পবুদ্ধি জনসাধারণের উপর একটা বুদ্ধিমান শক্তিমান শ্রেণীর আধিপত্য। কিন্তু এ অবস্থা ত বেশিদিন টিকিতে পারে না! একবার যখন মুক্তির হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন নির্বুদ্ধিও আর দাসসুখে সুখী হইতে পারিবে না। কপট গণতন্ত্র শেষ করিবার জন্য কোমর বাঁধিবেই। ফলে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ—কল্পনাতে-কল্পনাতে, আদর্শে-আদর্শে, স্বার্থে-স্বার্থে অবিরাম সংঘর্ষ। এই দ্বন্দ্ব, কলহ, অশান্তির জীবনকে প্রাচীন তথাকথিত অর্ধসভ্য অস্ফুট-বুদ্ধি সাম্রাজ্যসমূহের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায় কি? সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বের যখন অবসান হইবে তখন আমরা দেখিব যে যাহারা জয়লাভ করিয়াছে তাহারা দেহবলে বুদ্ধিবলে আত্মবলে যোগ্যতম মানুষ নয়। তাহারা জিতিয়াছে শুধু ভাগ্যবলে, হয়ত প্রাণশক্তির জোরে। ইহাকে ত যুক্তিবুদ্ধি-সম্মত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা যায় না! মানুষ যাহা চাহিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

তাহা হইলে উপায় কি? শিক্ষা পাইলে মানুষের বুদ্ধি খোলে। অতএব জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু এই শিক্ষার ঠিক অর্থ কি, তাহা বোঝা দরকার। মানুষকে শেখাইতে হইবে বাস্তব ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিতে, তাহার মর্ম বুঝিতে এবং তাহার বিচার করিতে—তাহাকে শেখাইতে হইবে শান্তভাবে চিন্তা করিতে এবং সর্বশেষে তাহার বিচার ও তাহার চিন্তাকে দেশের দশের কাজে লাগাইতে। আর, ততোধিক প্রয়োজন তাহার

চরিত্র গঠন করিতে, যাহাতে সে জড়ভাবশে তাহার ন্যায্য অধিকারও ছাড়িবে না এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাহার কর্তব্যও অবহেলা করিবে না। এইরূপে সাধারণ প্রজা-জন প্রস্তুত হইলে গণতন্ত্র চলিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-শিক্ষা কোথাও দেওয়া হয় না। ফলে মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, শিক্ষা ব্যর্থ, গণতন্ত্র আকাশকুসুম, সেকালই ছিল ভাল। তথাপি স্বীকার করিতে হয় যে শিক্ষা ও স্বাধীনতা মানবের অনেক কিছু করিয়াছে। ইতিহাসে আমরা মানুষকে ঋজু, কর্মঠ ও জীবন্ত এই প্রথম দেখিতেছি। এতটা যখন হইয়াছে, তখন নিরাশার কারণ নাই। যুক্তিবুদ্ধি পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক হইয়াছে। সাধারণ মানুষও চিন্তা করিতে, বুদ্ধিকে জীবনে প্রয়োগ করিতে শিখিতেছে। পাঁচটা মতবাদের একটাকে সে বাছিয়া লইতে পারিতেছে, অন্তত চাহিতেছে। শিক্ষা বা সুবিধার সাম্য আসে নাই বটে, তবু আগের চেয়ে অনেকটা সমতা আসিয়াছে। তবে এইখানে আর একটা কথা ওঠে। শিক্ষা ও সুযোগের সমতা আসিলেও তাহার পরিণাম কি হইবে? অর্ধস্ফুটবুদ্ধি মানুষ চায় ক্ষমতা ও ভোগ। আগে এগুলি ছিল জন্মগত। তাহা আর নাই, কিন্তু তাহার স্থানে অপর কোন ব্যবস্থাও আসে নাই। তাই মনে হয় যে ভবিষ্যতের অর্থের জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়া যাইবে এবং ফলে সঙ্গতির বদলে আসিবে অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, টক্কর দেওয়া, বিশাল কলকারখানার দ্রুত বিস্তার, কারখানার মালিকের অপ্রতিহত প্রভাব। গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে ধনিকতন্ত্রের আবির্ভাব।

কাজেই বিশ শতকে মানুষের মন বুদ্ধি ফিরিয়াছে সমাজতন্ত্রের পানে। এই ব্যবস্থার ভালমন্দ আমরা পরের পরিচ্ছেদে বিচার করিতেছি। ব্যক্তিবাদ যে সাম্য আনিতে পারে নাই, সমষ্টিবাদ তাহা আনিয়াছে, তবে রাষ্ট্ররূপী জগদ্দল পাথর সকলকে পিশিয়া সমান করিয়া দিতেছে।

ঊনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ পরিচ্ছেদ

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদ

আধুনিক যুগ প্রগতির যুগ। মানুষ অবিরাম খুঁজিতেছে একটা যুক্তিবুদ্ধি-সম্মত সমবেত জীবনের পাকাপোক্ত বনিয়াদ। মানবসমাজ অগ্রসর হইতে পারে দুই রকমে। হয় নব-নব কল্পনা অনুযায়ী ও নব-নব অভাব মিটাইবার জন্ত সমাজযন্ত্রটাকে, এখানে একটু, ওখানে একটু, অদল-বদল করিয়া লইতে পারে, নয়ত তাহার মূলভিত্তি ও মূলনীতিকে একেবারে উলট-পালট করিয়া দিতে পারে। বর্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই, একটার পর একটা, এই দ্বিতীয় প্রকারের আমূল পরিবর্তন।

সাধারণত পরিবর্তন ঘটে এই ভাবে। হয়ত কোন ভাবুক একটা অভিনব সমাজনীতি উপস্থাপিত করিলেন, জনসমাজ মহা শ্রদ্ধাভরে ও উৎসাহে সেটি মানিয়া লইল এবং প্রাচীন নীতিকে বাতিল করিয়া দিয়া তাহার স্থানে নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করিল। তার পর, প্রথমটা আগ্রহবশে, পরে, অভ্যাসবশে, তাহার জীবনধারা নানারূপে দ্রুত অদল-বদল করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে অদল-বদল তখনও আবেষ্টন অনুযায়ী টুকটাক পরিবর্তন মাত্র, মূলনীতির উৎপাটন নয়। কিছুকাল পর্যন্ত মূলতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা কায়েম থাকে। কিন্তু ক্রমশ এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষের জাগ্রত বুদ্ধি আর ডালপালা ছাঁটিয়া তুষ্ট থাকিতে পারে না, দেখিতে পায় যে সে একপ্রস্থ অন্ধ আচার-অনুষ্ঠানকে সরাইয়া আর একপ্রস্থকে আসনে বসাইতেছে মাত্র, সত্য বহুদূরে। তখন তাহার মন ফিরিয়া যায় অতীতের সেই সমস্ত মনীষীদের উপদেশের দিকে, যাঁহারা বহুকাল পূর্বেই অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানকালে যে "back to Aristotle" ধুয়া উঠিয়াছিল, বা ভারতে উনিশ শতকে যে "back to the Vedas" রব শোনা গিয়াছিল, তাহা এই

মনোভাবেরই নিদর্শন। সুদূর অতীতের ধীরজনের প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ মানব তখন তাহার সমবেত জীবনের আমূল পরিবর্তনে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে মানব সমাজের ক্রমোন্নতি চলে, যতদিন না তাহার বুদ্ধি তুষ্ট হয়। কিন্তু জাগ্রত যুক্তিবুদ্ধি কি কখন সন্তুষ্ট হইতে পারে, যদি না সে ঐতিহ্য কি অন্ধ আচারবাদের কুহকে ভুলিয়া থাকে, অথবা যদি না সে বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া অতিমানসের আশ্রয় গ্রহণ করত নবীন আধ্যাত্মিক যুগের আবাহন করিতে প্রস্তুত হয়?

সমাজবাদ জগতে আসিয়াছে ধনিক ও মধ্যবিত্তের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকের বিদ্রোহরূপে। তাই সে মূর্তি ধরিয়াছে শ্রেণীসংঘর্ষের, এবং সেই সংঘর্ষ প্রথমে বাধিয়াছে কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কারবারে। কিন্তু আসলে এই সংঘাতের পশ্চাতে যে তত্ত্ব রহিয়াছে তাহা আরও গভীর। বস্তুত মানুষ হায়রান হইয়াছে জনসমাজের মধ্যে অবিরাম আড়াআড়ি ঝুটাপুটিতে। সে অন্তরে চায় একটা যুক্তিসঙ্গত কায়েম ব্যবস্থা যাহার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা পৃথিবীতে চিরদিন বজায় থাকিবে। একথা বোঝা সহজ যে যতদিন মানুষে-মানুষে, জন্মগত বা কৃত্রিম একটা ভেদ ও অসমতা থাকিবে, ততদিন এরূপ কোন কায়েম বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না। সমাজে তথা রাষ্ট্রে উচ্চনীচ ভেদ দূর করিতেই হইবে, সকলকে সমান সুবিধা দিতেই হইবে আত্মোন্নতির; কিন্তু যতদিন সকলের পদ সমান নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে একজন বড়লোক ও একজন গরীব, ততদিন সাম্য আসিবে কোথা হইতে? সমাজবাদী তাই প্রথমেই বলেন যে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু থাকিবে না, সকল সম্পত্তিই হইবে সার্বজনিক। তবে এরূপ ব্যবস্থা হইলে ব্যক্তি ত আর ব্যক্তি রহিল না। সে হইল শুধু সমাজের অঙ্গ, সমাজ-শরীরের দেহাণু মাত্র। তাহার দেহ মন বুদ্ধি শ্রম কর্মকৌশল এমন কি তাহার পারিবারিক জীবন, কিছুই আর তাহার নিজের রহিল না, সবই হইল সমাজের। সমাজই হইল একমাত্র ধর্তা কর্তা

বিধাতা। সর্ববিষয়ে যাহা কিছু স্থির করিবার তাহা করিবে সমষ্টিগত মন, ব্যক্তিগত মন নয়। সমাজতন্ত্রে ইহাকেই বলে সমবেত বুদ্ধি ও সমবেত সংকল্প। এরূপে সাম্য নিশ্চয়ই আসে, তবে তাহার মূল্যস্বরূপ ধরিয়া দিতে হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। একটা প্রশ্ন উঠে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি কি সুখী হইতে পারে? জার্মানী ত বলে যে ব্যক্তিগত জার্মান ইতিপূর্বে এত সুখী কোনদিন ছিল না। তাহা যদি সত্যও হয় তবু সে-তুষ্টি, সে-সুখ কি বুদ্ধিমান মানবের সুখ। অথবা তাহা পশুর তুষ্টি, যে-পশুর বুদ্ধিশুদ্ধি জাগে নাই! তথাপি সমাজবাদী গণতান্ত্রিক মনোভাব পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। পূর্বতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের সহিত নূতন সর্বেসর্বা রাষ্ট্রশক্তির আদর্শের সঙ্গতি বিধান করিতে গিয়া সে নানা অদ্ভুত অসমঞ্জস ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছে। এসমস্ত অসঙ্গতি হয়ত একদিন দূর হইতেও পারে, তবু একটা দোষ থাকিয়াই যাইবে। মানব জীবনের কতকগুলি মূল সত্য আছে যাহা কিছুতেই অবহেলা করা চলে না। গণতন্ত্র একথা ভুলিয়া গিয়া নিজের ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। সমাজতন্ত্রের স্থানিক প্রকারভেদ যাহাই হোক না কেন, তাহারও এই দশা অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে তখন আপন সমবেত জীবনের সমস্যা মিটাইবার জন্য নৈরাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতা থাকিবে কিন্তু তাহার ভিত্তি হইবে, মুক্ত স্বতন্ত্র সমাজে মুক্ত স্বতন্ত্র মৈত্রী।

আরও একটু বিশদভাবে বিচার করা যাক এই সমাজবাদের। প্রথম দর্শনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ত বেশ লোভনীয় বলিয়াই মনে হয়। ধনী-নির্ধন উচ্চনীচের ভেদ দূর করিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা ত নিখুঁত ব্যবস্থা বলিয়াই বোধ হয়। ব্যক্তির জীবন সমষ্টিজীবনের মধ্যে মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই; কেননা দশের পক্ষে যাহা মঙ্গল তাহার পক্ষেও তাহাই মঙ্গল। আর, এই মঙ্গলবিধানের ভার যে সমগ্র সমাজের হাতে

থাকিবে, এ ব্যবস্থাও বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কেননা সেরূপ না করিলে ক্ষমতা চলিয়া যাইবে ব্যক্তি কি শ্রেণীবিশেষের হাতে এবং তাহাতে শক্তির নানা অপব্যবহার ঘটিবে। এরূপ রাষ্ট্রের মূল নীতি হইবে পরিপূর্ণ সাম্য; তাই ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট, সকলেই সমান সুযোগ পাইবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের, সকলেই সমান সুবিধা পাইবে রাষ্ট্রসেবার। এ ব্যবস্থায় যে সমাজে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সহজবোধ্য। শুধু গলদ এই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জলাঞ্জলি দিতে হইবে। সমাজবাদী কিন্তু বলেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন কোথায়? যেখানে সমগ্র সমাজ সকলের মঙ্গলের জন্য অহরহ কাজ করিতেছে সেখানে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিলে ত সে তাহার অপব্যবহার করিবে, আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইবে! ফলে সমাজে আসিবে স্বেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা, মানুষ ধীরে-ধীরে আদিম বর্বরতার দিকে হটিতে থাকিবে। এই বর্বর জীবনে পিছু হটিয়া যাওয়া হইতে মানুষকে বাঁচাইতে পারে শুধু তাহার সমবেত বুদ্ধি ও সমবেত ইচ্ছা। এইভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যষ্টিজীবন গণতন্ত্রের আড়াআড়ি ও পরস্পরের উপর টক্কর দেওয়ার জীবন অপেক্ষা ঢের বেশী সুখের হয়,—শুধু সুখের তাহাই নয়, পূর্ণতর, বেশী স্বাধীন, কার্যকরী ও বেশী সুনীতি-সঙ্গত হইয়া থাকে। অন্তত জার্মান নাৎসিরা সেইরূপ দাবি করেন। বাহির হইতে দেখিলে সুশৃঙ্খল কর্মক্ষম সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়। কিন্তু ইহাও সুস্পষ্ট যে সমাজবাদ মানবের জটিল সত্তার সর্বোত্তম বস্তুটিকেই হিসাবে আনে না। মানবসত্তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব তাহার আত্মা—যে আত্মা সদাদীপ্ত ও সদামুক্ত। এই পরম সত্যকে বাদ দিয়া আমরা যেরূপ সমাজই গড়ি না কেন, তাহার পতন অনিবার্য। যে-সমাজ ব্যক্তির আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে তাহাকে কিছুতেই পূর্ণ পরিণত বলা যায় না, কারণ সভ্য মানবের আত্মাই তাহার অধস্তন বৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই যে মানবের বুদ্ধি, যাহা তাহার এত গর্বের জিনিস, তাহাকেও ত নিগূঢ়ভাবে

চালায় তাহার আত্মা। এই কথা বুঝিয়া আত্মার হাতে সমস্ত চালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়াই তাহার অভিব্যক্তির চরম লক্ষ্য।

উপরন্তু, রাষ্ট্রের বা সমাজের কাছে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার বাস্তবিক অর্থ সেই রাষ্ট্রের বা সমাজের এক বা একাধিক শক্তিমান প্রবল ব্যক্তির কাছে বলি দেওয়া। এটাকে কোনক্রমেই মানবজীবনের প্রগতি বলা যায় না। সুবিধাবাদ হইতে পারে, প্রগতি নয়। তাহা হইলে, সমস্যার সমাধান মানুষের বুদ্ধির হাতে নয়, তাহার আত্মাপুরুষের হাতে। পূর্ণ-পরিণত সমাজের ভিত্তি হইতে পারে শুধু সার্বজনীন প্রেম ও মৈত্রী। কিন্তু এই প্রেম হওয়া চাই মানুষের যথার্থ আত্মাপুরুষের—তাহার সহজ প্রেরণার বা হৃদয়েরও নয়। মৈত্রী যাহা চাই, তাহা হইবে তাহার আধ্যাত্মিক একত্বের অভিব্যক্তি। শুধু এইরূপেই মানবের অহমিকার বিলোপসাধন সম্ভবপর। এইরূপেই ব্যষ্টি তথা সমষ্টিতে মানবজীবনের মূল একত্ব উপলব্ধ হইবে, জীবন পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া ক্রমবিকাশের শিখরে পৌঁছিবে।

সমষ্টিবাদ পারিবে না সমস্যা মিটাইতে, কেন না ইহাতে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার কোন স্থান নাই। জীবন ও কর্মের স্বাতন্ত্র্য না পাইলে মানুষ আড়ষ্ট অচল স্থাণু হইয়াই থাকিয়া যাইবে। যতদিন মনোবুদ্ধি অপরিণত, ততদিন মানুষ তুষ্ট থাকিতে পারে তাহার সমষ্টিগত জীবন লইয়া। কিন্তু বুদ্ধি যত খুলিবে ততই সে চাহিবে বড় হইতে, আত্মপ্রসারের সুযোগ খুঁজিবে, ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের দাবি করিবে, অপর ব্যক্তিকে তাহার জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না। বুদ্ধির ক্রমবিকাশের এই স্বাভাবিক গতি। শৃঙ্খলার খাতিরে, কর্ম-সৌষ্ঠবের খাতিরে, শিল্পবাণিজ্যের সুব্যবস্থার খাতিরে, লোকে কিছু কালের জন্য সমাজতন্ত্রের কড়া বাঁধন মানিয়া লইতে পারে; কিন্তু যত সময় যাইবে, যতই এই সমস্ত সুবিধা-সুযোগ সহজে তাহার ভোগে আসিবে, ততই সে উপলব্ধি করিবে যে তাহার ব্যক্তিগত অধিকার, দাবিদাওয়া সে

কতটা ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে আসিবে প্রথমে অসন্তোষ, তারপর বিদ্রোহ। এই অসন্তোষই মানুষকে লইয়া যাইবে, ধীরে-ধীরে কিন্তু স্থিরপদে নৈরাজ্যের দিকে, কেন-না নৈরাজ্য তাহাকে আনিয়া দিবে স্বাধীন বৈচিত্র্য। অবশ্য সমাজতন্ত্র মানুষের এই অভিব্যক্তির পথরোধ করিতে পারে তাহাকে ছেলেবেলা হইতে একটা কৃত্রিম শিক্ষা দিয়া, যেমন জার্মানীতে এবং হয়ত রুশিয়াতে দেওয়া হইতেছে। তেমনই সংবাদপত্র, বেতার যন্ত্র ও চলচ্চিত্র ভাড়া করিয়া তাহাদের মারফতেও সমাজবাদ প্রচার করিতে পারা যায় জনসমাজে। কিন্তু এসব ব্যবস্থা সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত অসমঞ্জস। আর হয়ত এরূপ প্রতিবিধান বা প্রতিষেধক রোগ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। মানুষের চিরমুক্ত আত্মা বিদ্রোহী হইয়া একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেই।

কোন একটা শক্তিশালী দল জোর জবরদস্তি করিয়া সমগ্র সমাজকে আপন ইচ্ছানুসারে চালাইবে ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যদি সে-দল সংখ্যালঘিষ্ঠ হয় ত কথাই নাই। কিন্তু যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তাহা হইলেও এ ব্যবস্থা দূষণীয় এবং বর্জনীয়। কেন না ব্যক্তি-সত্তাকে নিষ্পেষিত করিলে সমবেত জীবন, যতই সুশৃঙ্খল কার্যক্ষম হউক না কেন, ক্রমশ বেশী প্রাণহীন ও যান্ত্রিক হইয়া দাঁড়াইবে। নৈরাজ্যবাদী ও আধ্যাত্মিক ভাবুকের চক্ষে এই যান্ত্রিকতাই প্রধান দোষ সমস্ত অতিকর্মক্ষম রাষ্ট্রের। সচেতন মানবজীবনের গতি এবং নিশ্চেতন জড়জগতের গতি এই দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত বড় মূল প্রভেদ আছে। জড়জগৎ চলে অচল বিশ্ববিধানের নেমি অনুসরণ করিয়া। মানবের জীবন চলে তাহার শাশ্বত আত্মার ক্রমিক অভিব্যক্তির পথ ধরিয়া। নানা বিচিত্র সূক্ষ্ম অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া মানবজীবন আপন সার্থকতা লাভ করে। বুদ্ধিজীবী মানুষের কাজ এই বৈচিত্র্যের ভিতরে সঙ্গতির ও অভেদের মূল তত্ত্বকে খুঁজিয়া বাহির করা। নয়ত জগতের বাহ্য প্রতীয়মান অসঙ্গতি ও বিরোধের মাঝে সে যদি আপনাকে

হারাইয়া ফেলে ত তাহার ক্রমবিকাশ ব্যাহত হইবে। কিন্তু সঙ্গতির এই শাশ্বত তত্ত্বকে বাহির করিতে হইলে মানুষকে আগে তাহার অন্তরতম ধ্রুব সত্তার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। তাহার বিকারী অনিত্য জাগতিক ভালমন্দ বুদ্ধিকে ধীরে-ধীরে তুলিয়া লইয়া যাইতে হইবে নিত্য অবিকারী আত্মার জ্যোতিতে। প্রগতির এই দীর্ঘপথে নানাস্থানে নানারকমে তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত ও সমবেত জীবন গড়িয়া লইতে হইবে, কিন্তু সে-সমস্তই হইবে তাহার ক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী, কোনটাই তাহার আত্মোন্নতির চরম অভিব্যক্তি হইতে পারে না।

শুদ্ধ ভাবনার ক্ষেত্রে মতভেদ থাকিলে কিছু আসে যায় না। নানা পরস্পরবিরোধী মতবাদ পাশাপাশি থাকিতে পারে। মানুষের মন অবাধে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ বা সিদ্ধান্তের সমন্বয়, বিশ্লেষণ, পরিবর্তন করিয়া চলে। কিন্তু যখন কোন মতকে সে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়া জীবনে প্রয়োগ করিতে চায় তখনই সে-মত দানা বাঁধিয়া অনড় অটল হইয়া দাঁড়ায়। তখন একটা বিবাদ বিরোধ বিদ্রোহের যুগ আসে, যার ফলে জীবন হইয়া পড়ে একেবারে অনমনীয় ও যান্ত্রিক। তবে উপরে বলাই হইয়াছে যে অটল অটুট অনমনীয়তা জড়জগতের স্বভাব হইতে পারে, কিন্তু চেতন মানবজীবনের স্বরূপ হইতে পারে না, তাহার উচ্চতম শ্রেষ্ঠতম বিধানও নয়। মানুষ তাহার মনোবুদ্ধির সাহায্যে মন্থরগতি আদিম সমাজে প্রগতির বিধিবিধান বাঁধিয়া দিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি কখনও সমাজকে পূর্ণপরিণতির শিখরে লইয়া যাইতে পারিবে না। মানুষের জীবনে যুক্তিবুদ্ধি সর্বোত্তম তত্ত্ব হইতে পারে না।

এখন দেখা যাক নৈরাজ্যবাদের কতটা শক্তি আছে সমাজতন্ত্রের দোষসমূহের নিরাকরণ করিবার। মানবের সামাজিক অভিব্যক্তিতে সমাজবাদ বা সমষ্টিবাদকে একটা প্রয়োজনীয় স্তর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কারণ ব্যক্তিবাদী গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অনুসরণ করিতে গিয়া খুব বেশী জোর দিয়া ফেলে প্রাণময় মনোময় জীবের অহমিকার উপর, ভুলিয়া যায় যে অখণ্ড একত্বের উপরই যথার্থ প্রগতির প্রতিষ্ঠা, সমষ্টিবাদ তখন ব্যক্তিকে সমষ্টিগত অহমিকার কাছে বলি দিয়া অভিন্ন একত্বের উপর জোর দেয়, ব্যক্তির মন-প্রাণকে পূর্ণভাবে সমষ্টির আজ্ঞাধীন করে। এই শৃঙ্খলা সংযমের ফল এই হইবে যে আবার যেদিন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী হইবে, একদিন তাহা হইতে বাধ্য, সেদিন সে-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, উচ্ছৃঙ্খল অহংবোধের উপর ততটা নয় যতটা অখণ্ড একত্ব নীতির উপর। ক্রমবিকাশের পথে সমাজতন্ত্রের এই যথার্থ উপযোগিতা। কিন্তু, সত্য বলিতে সমাজবাদ এই একত্ব আনিতে পারিবে না শুধু যুক্তিবুদ্ধির বলে, শুধু মানবজীবনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিশ্চেতন যন্ত্রবৎ চালিত করিয়া।

নৈরাজ্যবাদের কল্পনা দিন-দিন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, যদিচ এখনও তাহার মূর্তি অস্পষ্ট। সমাজবাদ মানবের ক্রমবিকাশের একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গকে যতই দাবাইতে চেষ্টা করিতেছে ততই তাহার মন ফিরিতেছে স্বাধীন ও সমান মৈত্রীর দিকে। নৈরাজ্যের একটা স্থূল হিংস্রমূর্তি আছে যাহার কোন মহত্ত্ব নাই সামাজিক অভিব্যক্তিতে; সে নৈরাজ্যের কথা আমাদের ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে আর একটা উচ্চতর বুদ্ধি প্রণোদিত আদর্শ আছে যাহা মানুষের সত্য ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপকে বাহিরে আনিয়া জীবনে প্রয়োগ করিতে চায়। আমাদের দেখিতে হইবে যে সেই বুদ্ধিগত আদর্শ মানুষকে কতটা চরম লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতে পারিবে। চরম নৈরাজ্যবাদের মতে মানুষের দ্বারা মানুষের শাসন মাত্রই মন্দ, কেন না সর্বরকমের রাষ্ট্র-শাসন, এমন কি সমাজ-শাসন পর্যন্ত, মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক ভালটাকে নিষ্পেষিত করে। এটা যে ভুল তাহা সহজেই বোঝা যায়। মানুষ স্বভাবত একক প্রাণী নয়, তাহার ক্রমোন্নতি দশজনের একজন হইয়া। আপন স্বাতন্ত্র্যের সহিত অপরের

স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য সাধিয়া সে তাহার ছোট-বড় সমবেত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। কোন-কোন ভাবুক আজও স্বপ্ন দেখেন সেই আদিম বর্বর মানুষের, নির্ভীক অথচ উদার, শূরবীর অথচ শান্তশীল, যাহারা পুরাকালের বনভূমিতে একাকী আনন্দে বিচরণ করিত। এরূপ গুণবান বর্বর কখনও সত্যই ছিল কি না জানি না, তবে এটা নিশ্চিত যে ক্রমশ তাহার অবনতি হইল বিস্তর, কেন না ঐতিহাসিক যুগে আমরা দেখিতে পাই যে কঠোর সমাজ-শাসনের নিগড়ে তাহাকে বাঁধিতে হইল সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য। মানুষের মধ্যে বুদ্ধির জাগরণ হইবার পরে সে বুদ্ধিবলে প্রাক্তন নির্বুদ্ধি মানবজীবনের উন্নতি সাধন করিল। এই নিয়মনের, সমাজ-শাসনের, আবশ্যক হইয়া ছিল সেই আদিম যুগে। ক্রমবিকাশের এই ধারা; একটার পর একটা উচ্চতর বৃত্তি জাগ্রত হইয়া মানুষকে প্রগতির পথে চালিত করিতেছে। নৈরাজ্য আসিতে পারে না যতদিন মানুষের প্রয়োজন থাকে কড়া শাসনের, কঠিন বিধি-বিধানের।

মানুষ যতই অগ্রসর হইবে পূর্ণতার পানে, ততই একটা আন্তর বিধান ধীরে-ধীরে বাহিরের শাসনের স্থান লইবে। পূর্ণ পরিণতিতে পৌছিলে আর রাষ্ট্রশাসনের কোন আবশ্যক থাকিবে না, মানুষে-মানুষে ভাই-ভাই ভাবে বাস করিবে, স্বেচ্ছায় সুসঙ্গত সমবেত জীবন যাপন করিবে। কিন্তু এ অবস্থায় কিরূপে পৌছিতে পারা যায়? অনেকে মনে করেন যে মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর, স্বভাবত পাপপ্রবণ, কোন-না-কোন রকমের শাসন থাকাই চাই, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের অবতরণ স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু একথা বলিলে ত বলা হইল যে জগতে মানুষের অভিব্যক্তি চরমে পৌছিয়াছে, আর উর্ধ্বে সে উঠিবে না। এরূপ মানিয়া লইব কেন? মূল নিশ্চেতনা হইতে ধীরে-ধীরে এই বিশ্ব অবচেতনার মধ্য দিয়ে যুক্তিবুদ্ধির উৎকর্ষে উঠিয়াছে, এখন এইখানে পরাচেতনার প্রবেশদ্বারে সে থামিয়া পড়িবে কেন? যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চতর সূক্ষ্মতর

কোন বৃত্তি যে তাহার নাই, এ একটা কুসংস্কার মাত্র। এই উর্ধ্বতন বৃত্তি জাগিয়া তাহাকে অখণ্ড মানবতার আদর্শে একদিন পৌছাইয়া দিবেই। ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি মানুষের জীবন কিরূপে ধীরে-ধীরে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে আরও বৃহৎ সমষ্টিতে উঠিয়াছে। বৃহত্তম সমষ্টি অখণ্ড মানব জাতি। এই লক্ষ্যের দিকে আমরা অভ্রান্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের আজিকার অবস্থা জাতীয় রাষ্ট্র, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রাষ্ট্র। কিন্তু দেখাই যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ, সম্মিলিত রাষ্ট্র, এইরূপ কত বিরাট সমবায়ের দিকে আমরা চলিয়াছি। গত যুদ্ধের পরে এক আন্তর্জাতিক লীগও স্থাপিত হইয়াছিল জেনিভাতে। সে লীগ কিছু করিতে পারিল না বটে বড় বড় জাতিগুলির স্বার্থপরতার জন্য, তথাপি অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় হইয়া রহিল, ভবিষ্যতে এ কাজ আরও সহজ হইবে।

বুদ্ধিপ্রণোদিত নৈরাজ্যবাদ দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রথম, পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সম্মান; দ্বিতীয় মৈত্রী, মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃভাব। প্রথমটির প্রতিষ্ঠা যুক্তিবুদ্ধির উপর; কিন্তু পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য কবুল করিয়া লইলেই যে সমস্যা মিটিল তাহা ত নয়! বর্তমান মানবজীবন নির্ভর করিতেছে সমবায় ও সহযোগিতার উপর। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিব না, শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে না। এই নৈরাজ্যবাদীরা বলেন যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মৈত্রী চাই, পরস্পরের দরদ থাকা চাই, সবার একটা জাগ্রত একক্রিয় ভাব থাকা চাই। তথাপি ইহার সহিত রুশীয় ব্যবস্থার প্রভেদ বিস্তর, কেন না নৈরাজ্যবাদ ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য স্বাতন্ত্র্য দিতে প্রস্তুত, তবে এই শর্তে যে তাহার বাড়তি রোজগার সার্বজনিক কাজে দিবে। কিন্তু জোর জবরদস্তি ছাড়া এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে কিরূপে? হয় নানা গণ্ডগোলে সমবেত জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, নয় একটা খুব কঠোর সমাজতন্ত্র আসিয়া পড়িবে। মানুষের প্রাণগত অহমিকাকে হিসাবে না আনিলে চলিবে না; এ অহমিকা

যুক্তি মানে না। ইহাকে বেশী দাবাইলে সমাজ কৃত্রিম, মাথাভারী, নির্জীব হইয়া যাইবে, মানুষের বুদ্ধিকেও টিপিয়া মারিবে।

নৈরাজ্যের জন্য যে মৈত্রীর প্রয়োজন, তাহা শুধু মনোবুদ্ধি ঘটিত হইলে চলিবে না। আরও গভীরে তাহার উদ্ভব। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মানবজীবনের সমস্যা মিটাইতে পারে শুধু মানুষের আত্মাপুরুষ, বুদ্ধি তাহাকে বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদই সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে কাছে যায়। তবে এই আদর্শ এখনও অস্পষ্ট, এবং ইহার মধ্যে অনেক রকম বাড়াবাড়ি রহিয়াছে। এই মতবাদীরা সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের উপর খুব জোর দেন, এবং সাংসারিক জীবনকে উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু জীবনের উৎসই যদি শুকাইল, তবে রহিল কি? প্রাণশক্তিকে ত মারিয়া ফেলিতে হইবে না, তাহার শোধন করিতে হইবে, তাহাকে দিব্যরূপ দিতে হইবে। তেমনই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিয়া লাভ কি? আধুনিক সভ্যতা কুরূপ, তাহার গলদ অনেক আছে সত্য, কিন্তু তাহাকে সমূলে নষ্ট করিলে অনেক সুন্দর মূল্যবান বস্তুও সঙ্গে-সঙ্গে নষ্ট হইয়া যাইবে। সত্য কথা এই যে প্রাণশক্তির স্থূল তাড়না-প্রেরণাকে বুদ্ধি আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অনেককাল চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। প্রতিকার করিতে পারে শুধু মানবের আত্মা। মানবের অন্তরের অন্তরে আছে এক নির্মল অমৃতের উৎস। তাহাকে সেই উৎসে ডুব দিয়া অমৃতপান করিতে হইবে। কিন্তু মনোময় পাত্রে সে-সুধা ঢালিলে তাহার সব গুণ চলিয়া যায়। অতীতকালে ধর্মসমূহ এই কারণেই কিছু করিতে পারে নাই; স্বর্গের সুধা বুদ্ধির বাটিতে পরিবেশন করিতে গিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আজ কালপূর্ণ হইয়াছে, আমরা এখন আশা করিতে পারি যে এইবার মানবের অমর আত্মা বাহিরে আসিয়া তাহার জীবনের ভার লইবে, ধীরে-ধীরে, যে-ভাবে ক্রম-বিকাশের কাজ চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। অভিব্যক্তির এই রহস্য; এইখানেই

জীবন-সমস্যার সমাধান চিরদিনের মত। দিব্য অবতরণ ঘটিয়াছে, ভাগবত শক্তি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদ আমাদিগকে একটা আভাস দিতেছে সত্যযুগের পরিপূর্ণ সমুজ্জ্বল জীবনের। স্বর্গের দীপ্তিতে দীপ্ত এই ভাবী যুগেই গণতন্ত্রের যথার্থ সার্থকতা আসিবে; আত্মার প্রেম সত্য ও স্বাতন্ত্র্যে জাগ্রত জনসমাজ অভ্রান্তপদে অগ্রসর হইবে দেবতার সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দিকে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

যথার্থ অতিমানব

মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানত দুইটি বিভিন্ন শক্তির দ্বারা। প্রথমটি এক অন্তর্নিহিত শক্তি বা সংকল্প, অনেকাংশে অব্যক্ত; এবং দ্বিতীয়টি মানুষের মনের ভাঙ্গাগড়া, যাহা এই অব্যক্ত শক্তিকে ইচ্ছানুরূপ কাজে লাগায়। মানবের নিত্য জীবনযাত্রাকে মোটামুটি বলা যায় তাহার দেহপ্রাণের অভাব পূরণ, বাসনার তুষ্টি—সে বাঁচিতে চায়, বাড়িতে চায়, ভোগ করিতে চায়। তবে এসব ব্যাপার বহুধা সংঘটিত হয় সহজ-প্রেরণাবশে, স্বতঃস্ফূর্ত বা যান্ত্রিক ভাবে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে অধস্তন প্রাণিকুলের বেলায়, যেখানে যুক্তিবুদ্ধির বালাই নাই, সেখানে জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয় মানুষের চেয়েও অনেক বেশী সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল ভাবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া নিট্‌শে প্রমুখ প্রাণময় ভাবুকমণ্ডলী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে মানুষকেও যদি পিছু হটাইয়া, বুদ্ধির খর্পর হইতে মুক্ত করিয়া, প্রাণময় সত্তাতে লইয়া যাওয়া যায় ত তাহার জীবনও ঢের বেশী সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী হইতে পারে। কিন্তু এই দার্শনিকেরা ভুলিয়া যান মানুষের স্বভাব, তাহার স্বধর্ম। তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে মানুষ প্রকৃতির মনোময় সন্তান, আর, ক্রমবিকাশের পথে এই মনের মধ্যেই তাহার জাগাইয়া তুলিতে হইবে একটা উচ্চতর সূক্ষ্মতর বৃত্তিকে।

আমাদের বর্তমান মানবত্ব যে অপূর্ণ, এ আমরা সবাই জানি। নিট্‌শে যে বলেন, মানুষকে যথার্থ মানুষ হইতে হইবে, আপনাকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে, ইহাও খুব সত্য। কিন্তু মানুষের আপন স্বভাব যে কি, সেইখানেই গোলযোগ। একটা সূক্ষ্মতত্ত্ব যে তাহার অন্তরে ধীরে-ধীরে জাগিতেছে, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না, নহিলে ক্রমপরিণতির কোন অর্থ হয় না। গুরুবর বলিতেছেন যে যাহা আমাদের মধ্যে এইরূপে অঙ্কুরিত হইতেছে

তাহা ভাগবত বস্তু, যে-বস্তু বীজ রূপে আমাদের অধস্তন সত্তার মধ্যে সুপ্ত নিগূঢ় অবস্থায় চিরদিনই আছে। সমস্যা এই যে তাহাকে জাগাইবে কে, এবং কিরূপে! এবং একবার জাগিলে যে আবার সে অধস্তন তত্ত্বসমূহের মাঝে মিলাইয়া যাইবে না তাহারই বা স্থিরতা কি? একথার উত্তরও শ্রীঅরবিন্দ অভ্রান্ত ভাষায় দিয়াছেন। মানুষের অপরিণত অপূর্ণ অর্দ্ধদীপ্ত মনোবুদ্ধি তাহাকে এ বস্তু দিতে পারিবে না; পারিবে শুধু বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর উজ্জ্বলতর যে-তত্ত্ব তাহার মনোবৃত্তির পশ্চাতে আজও লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে। একবার মানুষের অন্তরে অতিমানস জাগ্রত হইলে সে তাহার যথার্থ আত্মনের সন্ধান পাইবে, আর নীচে খসিয়া পড়িবার ভয় থাকিবে না। সেই বিজ্ঞানভূমির উপর সে নিরাপদে নির্বিবাদে চিরদিনের জন্য ভাগবত জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। যে-মানুষ ইহা পারিবে সেই হইবে দেবমানব, যথার্থ অতিমানব; নিট্‌শের কল্পিত যে প্রাণময় অতিমানব, সে ত পশুরই একটা বিরাট সংস্করণ মাত্র। তাহাকে দানব বলা যাইতে পারে, দেব নয়।

সাধারণত মানুষ অতিমানবত্বকে ভয় করে, ভাবে একটা অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু। মনে করে, বেশ ত আছি আমরা আমাদের স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনযাত্রা লইয়া, কাজ কি ওসব বিরাট অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ডাকাডাকি করিয়া! সে ভুলিয়া যায় যে নিজেই সে একটা অতিপ্রাকৃত সৃষ্টি, তার মত যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন জীব ত কই জগতে আর একটি নাই। তবে একটা কথা আছে। উদ্ভিদ পশুপক্ষীর চেয়ে সে অনেক বড় বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত অধস্তন জীব তাহাদের আপন-আপন প্রকৃতিতে যেরূপ পূর্ণ, সে ত তাহা নয়! সহজ-প্রেরণা বুদ্ধিহীনের জীবনযাত্রায় যে পূর্ণতা দিতে পারে, যুক্তিবুদ্ধি মানব-জীবনকে তাহা দিতে পারে নাই। তবে না পারিলেও তাহাতে দুঃখের কথা কিছু নাই। এই তাহার নিয়তি-নির্দিষ্ট প্রগতির পথ। এই অর্ধদীপ্ত বুদ্ধি,

অর্ধদেবত্বের মধ্যে দিয়াই সে উঠিবে বিজ্ঞানে, পরিপূর্ণ দেবত্বে। এ কাজ তাহাকে জানিয়া বুঝিয়া নিজেই করিতে হইবে; এই জন্যই প্রকৃতি তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন। তবে এই উত্তরণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, ইহার জন্য বহু যত্ন, বহু আয়াসের প্রয়োজন। অবশ্য পুরস্কারও তদানুরূপ; নিজের তথা জাতির মস্তকে বিজয়ী রাজার মহিমময় মুকুট!

মানব-প্রকৃতি জটিল ব্যাপার। তাহার দুইটি বিভিন্ন বিরোধী দিক আমরা দেখিতে পাই। একটি প্রায় পশু-ভাব, অপরটি প্রায় দেব-ভাব। একদিকে সহজ-প্রেরণা বশে কলের পুতুলের মত সে তাহার প্রাণময় জীবন যাপন করে। অন্যদিকে বুদ্ধিবলে সে তাহার মানব সত্তার বিধিবিধান জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করে, এবং সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শে আপন মনোময় জীবনকে গড়িয়া তোলে। তাহার মধ্যের পশু ইতর-পশুর মতই বাঁচিতে চায়, প্রাধান্য চায়, ভোগ চায়। তাহার মধ্যের শ্রেষ্ঠ অংশও এ-সমস্ত চায়; তবে বাহিরে ততটা নয়, যতটা অন্তরে। তাহার মানস আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য যতটা অধিকার, যতটা নিরাপত্তার প্রয়োজন, প্রধানত সে ততটাই চায়। জীব-জগতের অভিব্যক্তিতে মানবের মধ্যে এক নূতন শক্তি জাগিয়াছে। ইহারই বলে সে জড়জগৎ ও জীবজগতকে আপন আয়ত্তাধীন করিয়াছে। কিন্তু যেমন তাহার দেহপ্রাণের বল, তেমনই তাহার এই বুদ্ধিবলও বস্তুত তাহার আত্মার শক্তি। তাহারই নির্দেশ অনুসারে মানুষের গড়িয়া লইতে হইবে আপন জীবনকে, তাহারই আলোকে দেখিতে হইবে আপন আবেষ্টনকে। এই তাহার স্বধর্ম, এই দিক দিয়াই সে পাইবে একদিন পূর্ণতা ও স্বার্থকতা ও যথার্থ তুষ্টি। যদি সে পিছু হটিয়া যায় প্রাণভূমিতে, ত তাহাকে আবার অগ্রসর হইতে হইবে এই পথ ধরিয়াই। মনোভূমিতে বিচরণ করিতে-করিতে মানুষ একদিন পৌঁছিবে রূপান্তরের চৌমাথায়। কিন্তু সে-চৌমাথা এখনও বহুদূরে। এ-পর্যন্ত বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সে অনেক কিছু করিতে পারিয়াছে; আর সে বুদ্ধিহীন

পাশব জীবনে নামিয়া যাইবে না, ইহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু দেবত্বের মোড় ফিরিবার এখনও বহু বিলম্ব।

ইহার আসল কারণ এই যে মানুষের অব্যক্ত অন্তর্নিহিত সংকল্প এখনও অবস্থিত তাহার দেহপ্রাণময় সত্তাতে, তাহার গতি দেহপ্রাণের ভোগস্পৃহা মিটাইবার দিকে। মন তাহাকে কতকটা সংযত করিয়াছে বটে, কিন্তু রূপান্তরিত করিতে পারে নাই। তাহার উর্ধ্বতন জীবন অধস্তন জীবনের উপর ভাসিতেছে, যেমন জলের উপর তেল ভাসে। সে উর্ধ্বতনকে বকে ধমকায়, বিপথ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেই বোঝে না এই সংঘর্ষ বিরোধের মর্ম কি, পরিণাম কি। কখনও ভাবে ইহার সমাধান হইতে পারে শুধু সন্ন্যাস বৈরাগ্যের দ্বারা, অথবা মৃত্যুর দ্বারা। মোটকথা, পরস্পর-বিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের অহরহ কলহ বিবাদের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা হইয়া উঠে দুর্বিষহ। এই সাধারণ নিয়মের অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। এখানে-সেখানে আমরা এমন মানুষ দেখিতে পাই যাহার দেহপ্রাণ ও নিম্নতর বৃত্তিচয় উচ্চতর সংকল্পের সংস্পর্শে কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সে-রূপান্তরের মূল্য কি? হয় তাহার দেহপ্রাণ শক্তি-সামর্থ্য হারাইয়াছে, নয়ত তাহারা মনো-বুদ্ধিকে উর্ধ্বতন ভূমি ছাড়িয়া দিয়া আপন অধস্তন ক্ষেত্রে পূর্ববৎ কাজ করিতেছে, তাহাদের প্রেরণা দাবিদাওয়া যেমনকার তেমনই আছে।

প্রাণশক্তি কখন পূর্ণভাবে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতে পারে না, পূর্ণ-ভাবে কখন সুনীতি-সুষমা দর্শন-বিজ্ঞানের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে পারে না। বাহির হইতে এরূপ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বিভ্রম মাত্র। ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের জীবন কিছুকালের জন্য বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতে পারে সত্য; তবে শেষ পর্যন্ত জীবনীশক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী। আর, প্রাণ যদি নিতান্তই না পারে বুদ্ধিকে কাবু করিতে, তখন সে প্রতিশোধ লয় নিজেকে তথা সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া গিয়া। ইহা এত দূর

সত্য যে কখন-কখন দেখা যায় মানুষ বিপদ আসন্ন বুঝিতে পারিয়া মনোবুদ্ধিকে একেবারে ছাড়িয়া দেয় প্রাণশক্তির সেবা পরিচর্যা করিতে। উনিশ শতকের ঘোর জড়বাদের যুগে পাশ্চাত্যে এই ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। মানুষ তাহার সমগ্র বুদ্ধিকে চালিত করিয়াছিল জড়তত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের অনুশীলনে, তাহার সমগ্র জ্ঞানকে নিযুক্ত করিয়াছিল জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ভোগবিলাস, শিল্প-বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ সাধনে। সত্য শিব সুন্দরের অনুধাবন যেটুকু ছিল তাহা দেহপ্রাণ-চর্চার অনুচররূপে। জীবন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল গর্বিত বলদৃপ্ত অসুরের জীবন। প্রথম মহাযুদ্ধের মদোন্মাদে সেই অসুরের চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। জগতের কার্যক্ষম ও সুসভ্য জাতিসমূহ পৃথিবীর আধিপত্য, পৃথিবীর ধনরত্ন ও পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জীবন পণ করিয়া যুদ্ধে মাতিয়াছিল পরস্পরের ধ্বংসসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া। সে মহাযুদ্ধের এই ছিল যথার্থ কারণ ; রাজনীতি ক্ষেত্রে ত কত বড় বড় কথাই শোনা গিয়াছিল ! আবার যুদ্ধ বাধিয়াছে সামান্য কয়েক বৎসর বিশ্রামের পরেই। এবারকার যুদ্ধ আরও ভয়ানক, আরও ব্যাপক, আরও প্রলয়ঙ্কর। এবারও নানা রকম লম্বা-লম্বা কথা শোনা যাইতেছে চারিদিক, কিন্তু সংঘর্ষের মূলে সেই একই কারণ—আসুরিক মনোভাব, প্রচণ্ড অহমিকা। তবে হয়ত এইরূপ সর্বস্ব ধ্বংসের ভীতি হইতে মানুষের মনে জাগিবে পরম সত্যের একটা ক্ষীণ আভাস। তাহার সূচনা গতযুদ্ধের পরেই দেখা দিয়াছিল। হয়ত এবারকার ভীষণ ধ্বংসলীলার পরে তাহা আর একটু জোর পাইবে।

যদি এরূপ হয় ত তাহার প্রথম ফল হইবে একটা প্রাচীন আদর্শে পুনরাবর্তন। মানুষ তাহার ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সুযুক্তি ও সুনীতির অধিকতর প্রয়োগ করিবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে যুক্তি ও নীতির দ্বারা জীবন-সমস্যার চরম সমাধান হইবে না। সে-সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে শুধু মানুষের যথার্থ আত্মন তাহার অন্তরে জাগিলে। এই

আত্মন নিট্‌শের কল্পিত বুদ্ধিদীপ্ত শক্তিমান প্রাণময় মানবের সংকল্প নয় ; ইহা মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা, যাহা ধীরে-ধীরে তাহার শুধু মনকে নয়, দেহ-প্রাণকেও দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিবে। রূপান্তরের এই উচ্চতম শিখরে পৌছিলে তবেই মানবজীবনের সকল সঙ্কট কাটিয়া যাইবে। অর্ধপথে বিশ্রাম সহজ ও আরামদায়ক, হয়ত বা যুক্তিসঙ্গতও মনে হইতে পারে, কিন্তু সর্বক্ষণ ভয় থাকে পা হড়কাইয়া গভীর খাদে পড়িয়া যাওয়ার। আমাদের যথার্থ পথ, স্বাভাবিক পথ, শিখরের পানে।

মানুষকে ফিরিতেই হইবে সেই অতি পুরাতন আদর্শে—দেহপ্রাণ মনের উপর আত্মার পূর্ণ প্রভাব, ধরাতলে স্বর্গরাজ্য। প্রাচ্য দেশের প্রাচীন জাতি-সমূহ এই গূঢ় রহস্যকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে নাই কোনদিন, তাই তাহারা আজও বাঁচিয়া আছে। ইহজীবনে তাহারা বড় একটা কিছু করিতে পারিতেছে না বটে, দেহ-প্রাণ-বুদ্ধির উপাসক পশ্চাত্যবাসী তাহাদিগকে সর্বত্র হটাইয়া দিতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহারা মরে নাই, ঘুমাইতেছে মাত্র। কিন্তু আর ভূলুণ্ঠিত পরপদ-দলিত থাকিলে চলিবে না। ধূলিতে পড়িয়া থাকা মানবের স্বধর্ম নয়। তবে আশিয়াবাসীর এই দুর্দশার যথার্থ কারণ আমাদের বোঝা চাই। আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুসরণ তাহার সর্বনাশ সাধিয়াছে, এ ত সত্য হইতে পারে না! বরং সত্য এই যে আধ্যাত্মিক সাধনাকে সে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, আত্মনকে জীবনে ধ্রুবসত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। যখন পারিত, তখন সে জাগ্রত জীবন্ত ছিল। যখন আর পারিল না, তখন সে তমোনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। অধোগতির দিনে সে ঐহিক ও পারত্রিক বলিয়া দুইটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে, এবং দুইয়ের মাঝে গোঁজামিল দিয়া বিধি-বিধান আচার-অনুষ্ঠান সমন্বিত নব-নব ধর্মপথের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন ঋষি মানুষকে যে ডাক দিয়াছিলেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত, এসব

নূতন পন্থা ত সে ডাকের সাড়া নয়! কিন্তু আর মাঝ-রাস্তায় থামিলে চলিবে না; আত্মার বাণী শুনিতে-শুনিতে পথ-শেষ অবধি ধীর স্থির পদে অগ্রসর হইতে হইবে। গম্য স্থানে পৌঁছিলে মানুষ দেখিবে যে ইহলোক ও পরলোকে, মর্ত্যলোক ও স্বর্গলোকে কোন ভেদ নাই। সেখানে গোঁজামিল বা আপোষ নিষ্পত্তির প্রয়োজন হইবে না। আত্মাই সব-কিছুকে আপন রাজচ্ছত্রের নীচে টানিয়া আনিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ দীপ্ত করিয়া লইবে। হিন্দুর শেষ অবতার কল্কীর এই গূঢ় মর্ম।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে সুপথে চলিতে-চলিতেও ভুলভ্রান্তি অনেক ঘটিতে পারে। স্থূল দেহপ্রাণের উপর সুবুদ্ধি বা সুনীতি বা সৌন্দর্যবোধের আংশিক প্রভাব বিস্তার করিয়া একটা চলনসই ভাল মনোময় জীবন গড়িয়া তোলা যায়, একথা বোঝা কঠিন নয়। তেমনই আত্মা বা আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিতও মনপ্রাণদেহের এরূপ আপোষ নিষ্পত্তি করা যায় যাহাতে এই তিন স্থূলতত্ত্ব নিস্তেজ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মুখে আত্মার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আপন-আপন ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার অধিকার পায়। এ-পর্যন্ত মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা এই প্রকারেরই গোঁজামিল। হয়ত মধ্যপথে নানা আপোষ নিষ্পত্তি করিতেই হয়। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত জোড়াতালি দেওয়া ছাড়িতে হইবে। দেহপ্রাণ-মনকে নিস্তেজ দুর্বল বা পঙ্গু করিবার ত কথা নয়, তাহাদিগকে দিব্যরূপ দিতে হইবে। অর্থাৎ মানুষের সাধনার লক্ষ্য এ নয় যে আধ্যাত্মিক প্রভাবকে সে কতকটা মানিয়া লইয়া তাহার সাধারণ জীবন পূর্ববৎ যাপন করিবে; তাহার সমগ্র জীবনধারা, ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অবধি, হইয়া উঠা চাই ভাগবত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

এই রূপান্তর ঘটিতে পারে যদি আমাদের অন্তরের অব্যক্ত সংকল্প অধস্তন প্রাণভূমি ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। সেই উর্ধ্বতন ক্ষেত্রে মানবের সংকল্প হইয়া উঠিবে অতিমানস জ্যোতিতে দীপ্ত, অতিমানস শক্তিতে শক্তিমান।

আমাদের বর্তমান জীবনধারা ত শুধু অহমিকার কেন্দ্রকে ঘিরিয়া প্রকৃতির প্রাণশক্তির খেলা। সেই জীবনকে করিয়া তুলিতে হইবে আমাদেরই অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির খেলা। এই শক্তি জাগিয়া উঠিবে যখন আমরা আমাদের সংকীর্ণ অহংবোধকে ছাড়াইয়া আপন অন্তঃপুরুষের মধ্যে দেখিব সর্বভূতের সাথে অখণ্ড অভেদ। এই চিরন্তন রহস্যের সন্ধান নিয়ত অজ্ঞানে করিতেছে আমাদের প্রকৃতি। মনোভূমিতে মনের ভাঙ্গাগড়ার মাঝে আমরা আটকাইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এখানে থামিয়া থাকা যায় না, হয় উর্ধ্বে উঠিতে হইবে, নয় নীচে নামিতে হইবে।

এইজন্যই আমরা ব্যবহারে ভাবনায় শিল্পকলায় আদর্শ ও বাস্তবের মাঝে সর্বদা দুলিতেছি। মানস আদর্শকে মনে হয় যেন কতকটা অলীক ও কাল্পনিক, মনে হয় যেন কথা ও ভাবনাতেই তাহার বাস। বাস্তবকে ধরা ছোঁয়া যায়, মনে হয় যেন এ একটা সত্য ধ্রুব তত্ত্ব। কথাটা একেবারে ভ্রান্তও নয়। আদর্শ একটা ছায়ার মতই ত, যতক্ষণ না সে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কতকটা মিটমাট করিয়াছে এবং জীবনকে তাহার নিজের পথে কতকটা ফিরাইয়াছে। স্থূলের সাথে, বাস্তবের সাথে আপোষ করা, তাহার কাছে হার মানিয়া চলা সহজ ; কিন্তু আন্তর সত্যের উপলব্ধির দ্বারা বাস্তব জীবনের গতি ফেরান কঠিন কাজ। তথাপি এই কঠিন কাজই আমাদের সাধিতে হইবে, যদি আমরা আমাদের স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠা চাই। মানস আদর্শকে তুলিতে হইবে আধ্যাত্মিক বাস্তবে, তবেই আমাদের অধস্তন বৃত্তিচয় দিব্যরূপ ধরিবে।

মানুষ মনোময় জীব। তাহাকে জানিয়া বুঝিয়া স্থির করিতে হইবে যে তাহার শক্তি ও সংকল্পকে সে আপন প্রাণময় সত্তার অধীন করিয়া দিবে, না তাহার অন্তরে অধিষ্ঠিত দিব্য পুরুষের। উদ্ভিদ ও নিম্ন প্রাণীর প্রত্যেকের জীবনে তাহার আপন স্বভাব অনুযায়ী পূর্ণতা প্রকৃতিই সংঘটিত করিয়াছেন, মনোময় মানুষকে এরূপ পূর্ণতা দিতে কিন্তু প্রকৃতি পারেন না, কারণ

সে মনোভূমিতে উঠিয়া গিয়াছে। দেহপ্রাণ আর তাহার চরম কাম্য নয়, যন্ত্র মাত্র হইয়াছে। তবে মানুষ তাহার চরম উৎকর্ষ প্রাণভূমিতেও পাইবে না মনোভূমিতেও পাইবে না, কারণ মনও তাহার যন্ত্র বই কিছু নয়। এই মনের মাঝে লুকাইয়া কাজ করিতেছে যে সূক্ষ্ম বৃত্তি, মন তাহাকে আজও জানে না, চেনে না; তথাপি মন নিরন্তর অজ্ঞাতে তাহারই ভূমিতে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। মানুষের পূর্ণ উৎকর্ষ লাভের একমাত্র পথ তাহার চিরপূর্ণ অন্তরাত্মার উপলব্ধি। উদ্ভিদ বা ইতর পশু অবচেতন সত্তা, তাহার পূর্ণতা আসে সে স্বভাববশে প্রাণশক্তির অনুধাবন করে বলিয়া। মানুষের পূর্ণতা আসিবে তাহার চেতনা পরাচেতনাতে উঠিলে, যখন তাহার সকল প্রেরণা আসিবে উর্ধ্ব হইতে, যখন তাহার মধ্যে সমতা বোধ জাগিবে, যখন সে সর্বত্র দেখিবে অখণ্ড অভেদ, যখন তাহার ভোগ ও অধিকার হইবে সম্যক আধ্যাত্মিক, দেহপ্রাণমনের উপর আর কোন নির্ভর থাকিবে না। সে চারিদিকে দেখিবে অসংখ্য মূর্তিতে প্রকট অদ্বিতীয় এক শাশ্বত অনন্ত পুরুষ। এই উর্ধ্বগমনের পথে মনের সহিত বোঝাপড়া মিটমাট চলিবে না। আত্মনকে বুদ্ধির জালে ধরিতে গেলে জাল ছিঁড়িয়া যাইবে, আত্মন ধরা পড়িবে না। আশিয়াখণ্ডে এই ভুলই মানুষ করিয়াছিল। তাই সে ত্রিশঙ্কুর দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষ চরম উৎকর্ষে উঠিবে এবং পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে তখনই যখন তাহার অন্তঃপুরুষ মনপ্রাণের শক্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিবে, এবং মনপ্রাণদেহকে পর্যন্ত ধীরে-ধীরে তাহার আপন দিব্য উজ্জ্বল রূপ দান করিবে।

তাহা হইলে বোঝা গেল যে প্রাণ বা মন মানুষের উদ্ধার সাধিতে পারিবে না, তাহাকে অহমিকার কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না। মন চিরদিন ঘুরিবে, ফিরিবে, অনিশ্চিত ও অর্ধসত্যের মাঝে। তথাপি এও সত্য যে আধ-আলো আধ-আঁধারের মাঝে মানব-মনের মানব-প্রাণের সকল কাজ সকল ভাবনা সকল আবেগ সকল অনুভূতির পশ্চাতে নিগূঢ় রহিয়াছে তাহার চিরদীপ্ত

অতিমানস তত্ত্ব। সেই তত্ত্বই মনপ্রাণদেহের মধ্য দিয়া সনাতন সত্যকে যথাসম্ভব প্রকট করিতেছে। ক্রমবিকাশের এই রহস্য মানুষ যেন একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু শুধু বুঝিলে ত চলিবে না। দৃঢ় অবিচলিত সংকল্প লইয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে আপন অন্তরাত্মনের সন্ধানে। যে এই সন্ধান পাইবে, সেই হইবে যথার্থ অতিমানব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দিব্য মানব সমাজ

জীবনের এই প্রকার পরিবর্তন, প্রাণ-মনোময় হইতে আধ্যাত্মিক ধারাতে, প্রথমে ঘটিতে বাধ্য ব্যক্তির মধ্যে। তারপর ব্যক্তিজীবনের রূপান্তর সাধিত হইলে ক্রমশ তাহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবে সমাজে। জাগ্রত আত্মাপুরুষ ব্যক্তিসত্তাতে মূর্ত হইলে পর সমষ্টিগত মন তাহার সন্ধান পাইবে, এবং তাহার নির্দেশমত নবজীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। কেন না সমাজের মন কতকটা অবচেতন হওয়ার দরুন এলোমেলো ভাবে কাজ করে। মনোময় মানবের ব্যক্তিত্ব ত পশু বা উদ্ভিদের সহজ-প্রেরণা চালিত ব্যক্তিত্ব নয়। প্রকৃতির ক্রমপরিণতির পথে তাহার একটা বিশেষ মহত্ত্ব আছে। অবশ্য একথা সত্য যে ব্যক্তিতে যাহা প্রকট হয় তাহা পূর্বেই সমষ্টিতে মগ্ন অবস্থায় ছিল। তথাপি সে অভিব্যক্তির একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্র—শুধু অবচেতন প্রকৃতির নয়, প্রকৃতির যিনি নিয়ন্তা প্রভু তাঁহারও যন্ত্র সে। তাই সকল মহান রূপান্তরই পরিস্ফুট ও শক্তিমান হইয়া উঠে প্রথমে ব্যক্তি আধারের মধ্যে—একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে। জনসমাজ ক্রমশ তাহা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু গোলযোগও ঘটায় অনেক। নহিলে মানবের প্রগতি এতকাল সংশয়-সঙ্কোচের দ্বারা ব্যাহত হইত না, সরল পথে দ্রুতপদে চলিত।

অতএব আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে দুই বস্তুর সমাবেশের প্রয়োজন। প্রথমত ব্যক্তি, যাহার মধ্যে আত্মা-পুরুষ বিকশিত হইয়া জীবন নিয়মনের সকল ভার গ্রহণ করিবেন। তারপর জনসমাজ, যাহা ব্যক্তির অন্তরে জাগ্রত আত্মনের নির্দেশ মানিয়া লইবে, মানিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ কোনদিন ঘটে নাই, কতকাল কতবার চেষ্টার পরে যে ঘটিবে তাহাও বলা যায় না। কখন ব্যক্তি নিজেই অপূর্ণ, যাহা সে দেখিয়াছে

তাহা সে হইতে পারে নাই—আত্মা-পুরুষের যে-রূপ সে সমাজকে দিয়াছে তাহা অস্পষ্ট। কখনও বা সমাজ প্রস্তুত নয়, চরিত্রে বুদ্ধিতে নীতিতে অক্ষম, আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়া সে যাহা গ্রহণ করে তাহার পরিণাম আদর্শের বিকৃতি ও অধোগতি। এইরূপ যে-কোন দোষ থাকিলে জীবনধারার যথার্থ রূপান্তর অসম্ভব। কতকটা উন্নতি হয়ত হয়, কিন্তু তার বেশী নয়। পূর্বে এরূপ বহুবার ঘটিয়াছে।

তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে জনসাধারণের মনের অবস্থা কিরূপ হওয়া চাই যাহাতে জীবনধারার পুরাপুরি রূপান্তর একেবারে না ঘটিতে পারিলেও বোঝা যাইবে যে এইবার মানুষ নিঃসংশয়ে স্থিরপদে দিব্য রূপান্তরের পথে যাত্রা করিল। সমাজের সমষ্টিগত মনের অবস্থাই মুখ্য বস্তু। হয়ত তাহার নীতি, তাহার বিধান, তাহার সাধারণ ধারা আধ্যাত্মিকতার প্রতিকূল—হয়ত তাহার লক্ষ্য প্রধানত প্রাণের তুষ্টি, অর্থের স্বচ্ছলতা, বাহ্য স্বাচ্ছন্দ্যসাধন—তথাপি যদি মানুষের মনে ঊর্ধ্বতন জীবনের কল্পনা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, যদি সেই কল্পনা তাহার মনে একটা অভীপ্সা জাগাইয়া থাকে, ত আশা হয় যে অদূর ভবিষ্যতে জীবনধারা ঐ দিকে ফিরিবে। ইহার প্রথম লক্ষণ হইবে জীবনের অন্তর্মুখী ভাব, অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধারা, তাহার জীবনধারা, সব ফিরিবে অন্তরের পানে। তাহার কাব্য শিল্প দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষাবিধি দণ্ডবিধি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সমস্তই তাহার অন্তর্মুখী ভাবনার অনুযায়ী হইবে। তাহার বিজ্ঞান-দর্শনের গবেষণা আর সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহকে বাদ দিয়া চলিবে না। তাহার ধর্ম বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান হইতে মুক্ত হইয়া আন্তর বস্তুর অনুশীলনে নবজীবন লাভ করিবে। এইগুলিই যে মানুষের পরম চরম লক্ষ্য তাহা নহে, তবে যখন ইহারা দেখা দিয়াছে, তখন বোঝা যাইবে যে এইবার আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর জীবন প্রতিষ্ঠার একটা পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক উদ্যোগ হইতেছে। মানুষের মধ্যে এই অন্তর্মুখী ভাব ভাসা-ভাসা রকমে আসিয়াছে

বটে, তবে এখনও তাহা অস্ফুট অস্পষ্ট। যখন এই ভাব আরও গভীরে নামিবে, যখন প্রকৃত আত্মোপলব্ধি আসিবে, তখনই সমাজের দিব্য রূপান্তর ঘটিতে পারিবে, তৎপূর্বে নয়।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে অন্তর্মুখী চিন্তা আত্মোপলব্ধি অবধি নাও নামিতে পারে, মধ্যবর্তী যে-কোন স্তরে আটকাইয়া পড়িতে পারে। আত্মসন্ধানীকে ক্রমান্বয়ে অন্নভূমি প্রাণভূমি ও মনোভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক ভূমিতেই অন্তর্মুখী ভাবনার এক একটি বিভিন্ন রূপায়ণ আছে। সেই রূপগুলিকে, একটির পর একটিকে, অপসারিত করিলে তবে আত্মদর্শন ঘটে। অধস্তন ভূমিগুলির এই রূপায়ণেরও বিবর্তনের পথে আবশ্যক আছে। তবে বিপদ ঘটে যখন মানুষ কোন একটি স্তরে পৌঁছিয়া ভাবে যে সেইটিই তাহার চরম গন্তব্য। অন্তর্দৃষ্টি এইরূপে প্রাণভূমিতে আটক পড়িলে মানুষ হইয়া উঠিতে পারে প্রাণময় শক্তিশালী অসুর কি অপদেবতা। কোন অবস্থাতেই ভুলিলে চলিবে না যে সে তাহার আত্মনের সন্ধানী, সে খুঁজিতেছে পরম সত্যকে। উনিশ শতকে মানুষ তাহার অন্তর্দৃষ্টিবলে জড়-পদার্থ ও জড়-শক্তির উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু তার উপর আসিয়া পড়িল প্রাণময় অতিমানবের আদর্শ। দুই আদর্শের সংঘর্ষ ও মিশ্রণের ফলে জগতে বাধিল প্রথম মহাযুদ্ধের তাণ্ডব লীলা। সে-যুদ্ধ একদিন শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহা হইতে মানব-জাতির বড় একটা শিক্ষালাভ ঘটিল না। উদ্দাম প্রাণশক্তির আরাধনা চলিল; বিরাট বিশাল সংঘটন, সমবেত কামনার তুষ্টির আয়োজন, প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য সর্বস্ব পণ, এই হইল নবযুগের লক্ষণ। ফলে আবার বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রাম, আরও বিরাট ব্যাপক ভাবে ধ্বংসলীলা। প্রাণভূমি-গত অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে বলিয়া দিয়াছে যে রাষ্ট্রের জন্য তুমি যাহা করিবে তাহাই ন্যায়, তাহাই ধর্ম!

প্রাণভূমিকে ছাড়াইয়া মনোভূমিতে এবং সূক্ষ্মতর চৈত্য-ভূমিতেও অন্তর্দৃষ্টি

থামিয়া পড়িতে পারে। সেখানে হয়ত আরম্ভে দেখা যাইবে শুধু একটা সঙ্কীর্ণ মনোগত উপযোগবাদ mentalised pragmatism, প্রাণশক্তির তাড়নাকে মানুষ আত্মার প্রেরণা বলিয়া ভ্রম করিবে; কিন্তু ক্রমশ সে আপনাকে চিনিবে আপন মানস ক্রিয়ার মাঝে ধীরে-ধীরে বিকাশমান আত্মশক্তি বলিয়া। সে বুঝিবে যে শুধু আপন দেহপ্রাণকে আয়ত্তে আনিয়া, প্রাণের তাড়নাবশে বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে জয় করিয়া, তাহার মানব সত্তার চরম উৎকর্ষ আসিবে না। আসিবে তাহার মনোময় ও চৈত্যপুরুষের পূর্ণ পরিণতি হইলে। এই পরিণতির ফলে জীবনকে সে দেখিতে শিখিবে জ্ঞান সুষমা ও আনন্দের ক্ষেত্র বলিয়া,—আর সে আপন সংকল্পের দ্বারা শুধু জড়-প্রকৃতিকে জয় করিতে চাহিবে না, প্রবৃত্ত হইবে প্রাণময় তথা মনোময় প্রকৃতির উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করিতে—প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া মানবজীবনকে মুক্ত করিবে তাহার সসীমতার বন্ধন হইতে। এ পরিবেশ এখনও বহুদূরে, কিন্তু অনেক ভাবুকের মনে যে ইহার সূচনা আসিয়াছে, এইটিই আশার কথা। সাধারণ মানব-মনের ভাবনা ধারণা প্রেরণা এই দিকে ফিরিলে সমগ্র জীবনধারাতে একটা বিপ্লব আসিয়া পড়িবে। একটা নবীন ভাব, নূতন লক্ষ্য, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবে। বিজ্ঞান হয়ত নব রূপ ধরিয়া মানুষকে জড়জগতের যথার্থ নিয়ন্তা করিবে, শিল্পকলা তাহাকে যথার্থ সৌন্দর্যবোধ দিয়া জীবনকে সরস সুন্দর করিয়া তুলিবে, দর্শন তাহাকে পরস্পরের অন্তরের সন্ধান আনিয়া দিবে। প্রাণশক্তির তাণ্ডবকে ছাড়াইয়া সে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিবে। কিন্তু এই উচ্চতর ভূমিতে আটকাইয়া পড়িলেও বিপদ আছে—হয়ত সে-বিপদ প্রাণভূমির বিপদ অপেক্ষা বেশী মারাত্মক—তবে সঙ্কটের অনুপাতে শক্তি-দীপ্তিও ত জাগিবে অন্তরে! তাহার বলে মানুষ বিপদ-আপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে।

অভিব্যক্তির পথে এই সমস্ত স্তরেরই আবশ্যক আছে। মানুষ যে অতীত কালে আধ্যাত্মিক ভূমিতে উঠিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণই এই যে

জড়ভূমি হইতে এক লম্ফে সে আধ্যাত্মিক লোকে চড়িতে চাহিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে ইহা যে সাধিত হইতে না পারে, তাহা নয়। তবে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ইহা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। জড়দেহ ব্যক্তিসত্তার আধার, প্রাণ তাহার মুখ্য কর্মেন্দ্রিয়, ইহাদিগকে বাদ দিয়া মানব উপরে উঠিবে কেমন করিয়া! অতিদ্রুত উত্তরণে পদস্খলন ও পতনের সম্ভাবনা খুব বেশী। প্রত্যেক ধাপে পা রাখিয়া সেখানে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধীরে-ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। তবেই আমরা জড় প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত এড়াইতে পারিব। এই দিক দিয়া দেখিলে আমাদের সভ্যতা ক্রমপরিণতির যে পথ ধরিয়াছে তাহাই নির্ভুল নিরাপদ বলিয়া মনে হয়। ক্রমান্বয়ে অন্নভূমি প্রাণভূমি ও মনোভূমিকে জয় করিয়া মানুষ না জানিয়াও অগ্রসর হইতেছে অতিমানস ভূমির পানে।

তবে তৃতীয় ভূমিতে উঠিলে, অর্থাৎ মনোময়ের অন্তর্দৃষ্টিতেই, এই ধারণা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে যে মানুষের অন্তরাত্মাই মহান শাশ্বত কর্তা, ধ্রুব সত্য, মন তাহার ছায়ামাত্র। এই প্রতীতি আসিলে তবে মানুষ জীবনকে ও জগৎকে দেখিতে আরম্ভ করিবে এক অদ্বিতীয় অনাদি অনন্তের আত্মপ্রকাশ বলিয়া; তখন মানবজাতির আধ্যাত্মিক জীবন সম্ভবপর হইবে। আত্মপ্রতিষ্ঠ মানবসমাজের ভিত্তি হইবে তিনটি মূল তত্ত্ব—ঈশ্বর, স্বাধীনতা ও অভেদ। তিন তত্ত্বই এক, কেন না ঈশ্বরোপলব্ধি না আসিলে যথার্থ স্বাতন্ত্র্য বা অভেদ বোধ আসিতে পারে না। আমাদের মন যাহাকে স্বাতন্ত্র্য বলিয়া জানে তাহা ছায়া বই কিছু না। আর অভেদ, তাহা অহংগত মনে আসিবে কিরূপে? ঈশ্বর ধরা দিতে সদাই প্রস্তুত, মানুষ তাহা জানে না তাই তাঁহাকে খুঁজিয়া মরে সর্বত্র, আর তাঁহার রূপ গড়িতে গিয়া গড়ে শুধু আপন অহমিকারই নানা মূর্তি। এই অহমিকাকে বর্জন করিতে না পারিলে যথার্থ ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভবপর নয়।

যে-সমাজ আত্মোপলব্ধিতে জাগিয়াছে তাহার আবাস আর সঙ্কীর্ণ

অহমিকাতে নাই, সে বাস করে তাহার সমষ্টিগত অন্তরাত্মার মধ্যে। অহমিকা-পাশ হইতে মুক্তিই জাগরণের লক্ষণ। কিন্তু এ-মুক্তি আসে না একের ইচ্ছা-সংকল্প-লক্ষ্যকে দশের ইচ্ছা-সংকল্প-লক্ষ্যের কাছে বলি দিয়া। কেন না তাহার অর্থ ত হইল বৃহত্তর অহমিকার পায়ে ক্ষুদ্রতর অহমিকার উৎসর্গ। বৃহত্তর ত বটে, কিন্তু মহত্তর উদারতর নয়; বরং অনেক সময়ে বেশী কঠোর ও কুৎসিত। জাগ্রত মানব তাহার ভেদগত অহমিকাকে বর্জন করিয়া সন্ধান করিতে চায় সেই অভিন্ন এক তত্ত্বের যাহা সবার মধ্যে সমানভাবে, পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত, সবার সাথে সে বাস করিতে চায় সেই সর্বময়ের অখণ্ড সত্তার মধ্যে। অন্তরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে আমাদের ইহজীবন হইয়া উঠিবে ভাগবত জীবন, সারা জগৎ হইবে আমাদের চক্ষে একই পরম সত্যের বাহ্য রূপায়ণ। ভাগবত সমাজের লক্ষ্যই হইবে মানুষের অন্তরে নিগূঢ় ভগবানকে প্রকট করা তাহার সকল কর্মে, সকল বিদ্যানুশীলনে, সকল শিল্পচর্চাতে। তাহার অর্থনীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, সবের মূলে থাকিবে সেই একই ধ্রুব লক্ষ্য। বৈদিক যুগে উচ্চ স্তরের লোকে যে উদার শিক্ষা কতকটা পাইত, তাহাই হইবে সর্বজনের কাছে সুলভ। মানুষ জ্ঞান আহরণ করিবে সুমগ্রভাবে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য আর থাকিবে না পার্থিব কর্মকুশলতা, উদ্দেশ্য হইবে আপন ক্রমবিকাশ, আপন যথার্থ সত্তার সন্ধান। জড়বিজ্ঞান জগতের বিধিবিধান খুঁজিয়া বাহির করিবে মানুষের ঐহিক অর্থসাধনের সুবিধার জন্য নয়, বরং জড়প্রকৃতির পশ্চাতে যে ভাগবত শক্তি কাজ করিতেছে তাহার রহস্য বুঝিবার জন্য। নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে কার্যত ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ নয়, বরং মানুষের অন্তরস্থ ভাগবত প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তোলা। ললিতকলা শুধু বাহিরের রূপ প্রতিফলিত করিয়া তুষ্ট হইবে না, সে চাহিবে বাস্তবের পশ্চাতে যে সত্য সুন্দর আছে তাহাকে সম্মুখে আনিতে। দণ্ডনীতির দৃষ্টিও অন্যরূপ হইয়া যাইবে। অপরাধীকে শাসন করা, পেষণ করা, আর তাহার উদ্দেশ্য থাকিবে না, বরং তাহাকে সত্যে

উদ্বুদ্ধ করা, তাহার অন্তঃপুরুষকে জাগান হইবে সমাজবিধানের লক্ষ্য। অর্থনীতি চাহিবে না কেবল যন্ত্রসাহায্যে অজস্র দ্রব্য তৈয়ারী, বরং তাহার লক্ষ্য হইবে প্রত্যেক মানুষকে শেখান যথাশক্তি কর্ম করিয়া আনন্দ পাইতে, যাহাতে সবার জীবন সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। রাষ্ট্রনীতি চাহিবে না যে বড় বড় রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লোপসাধন করুক এবং পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানিতে-হানিতে বিশাল বাহিনী ও আসুরিক মারণযন্ত্রসমূহ রচনা করুক। ভাগবত মানব প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক রাষ্ট্রকে দেখিবে এক অদ্বিতীয় ভগবানের সমষ্টিগত প্রকাশ বলিয়া।

সমাজের অভিব্যক্তির অর্থ বাহ্য বিধিবিধানের দ্বারা মানুষের শাসন নয়, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মাঝে এক সমম্ ব্রহ্মের দর্শনই মানুষের পরিণতির লক্ষ্য। এই ভাবে জাগ্রত মানবই যথার্থ স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি পাইয়াছে। তবে যতদিন না মানুষ আত্মজ্ঞানের দিকে ফিরিতেছে, আত্মজ্ঞানের সন্নিকটস্থ হইতেছে, ততদিন সে বাহ্য বিধিবিধানের বন্ধন এড়াইতে পারিবে না। ততদিন সে ছোটবড় সমষ্টির দাস থাকিবে, কেন না ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই-ই ততদিন পর্যন্ত অহমিকার কবলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অহমিকা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আমাদের অধস্তন সত্তাকে পূর্ণভাবে অন্তরস্থ দিব্যসত্তার আজ্ঞাধীন করিয়া লইতে হইবে। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের অধস্তন তত্ত্বগুলিকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেন এবং তাহাদের আপন-আপন স্বভাব অনুসারে পূর্ণতার পানে উঠিবার সুযোগ দেন, যাহাতে তাহারাও সময়ে আপনার অন্তরস্থ ভগবানকে দেখিয়া প্রেমে ভক্তিতে তাঁহার পদানত হয়। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ভেদের ও অহমিকার বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া মানেই স্বাতন্ত্র্য লাভ।

আধ্যাত্মিক সমাজ এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করিবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের পেষণে, আমলাতন্ত্রের শাসনে, পুলিশ-প্রহরীর ভয় প্রদর্শনে সে মানুষকে ভাল করিতে

চাহিবে না। সে ধীরে-ধীরে বাহ্য অনুশাসনের বহর কমাইবে এবং তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে আন্তর দেবতার নির্দেশ। ক্রমশ মানুষের অন্তরে জাগিবে ইচ্ছা ও শক্তি তাহার আপন সত্তাকে দিব্য সত্তার সাথে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলিবার। তখন, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 'Each man will be not a law unto himself, but the law, the divine Law.... because he will be a soul living in the Divine." আধ্যাত্মিক নৈরাজ্য-বাদীরও এই স্বপ্ন। কিন্তু এরূপ হইলে কি সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, প্রত্যেক ব্যক্তি কি উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন নিরালা পথে চলিবে? তাহা ত হইতে পারে না, কারণ আধ্যাত্মিকতার যে তিনটি মূল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার একটি ঐক্য, অভিন্ন অভেদ। স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক, কেন না প্রত্যেককে তাহার আপন স্বভাব অনুসারে দেবত্বে উঠিতে হইবে। কিন্তু জাগ্রত মানবসমাজে ক্রমবর্ধমান অখণ্ড ঐক্যেরও একান্ত প্রয়োজন আছে। ব্যক্তি ভগবানকে দেখিবে শুধু আপনার মধ্যে নয়, সবার মধ্যে। সে যে-স্বাতন্ত্র্য, যে-পূর্ণতা চাহিবে তাহাও সবার জন্য। যদি একার জন্য ভগবানকে চায় ত সে হয় সংসারে অহমিকারই একটা বিরাট প্রকাশ হইয়া দাঁড়াইবে, নয় ত আপন মুক্তির জন্য একান্তে বসিয়া ভাগবত সাধনা করিবে, অপর লোকের যাহা হউক না কেন। আমরা যে পূর্ণ পরিণত দেবমানবের কথা বলিতেছি সে নিজের জন্য বা আপন সমাজের জন্য বা আপন রাষ্ট্রের জন্য বাঁচিবে না, বাঁচিবে শুধু তাহার অন্তরস্থ, বিশ্বমানবের অন্তরস্থ, ভগবানের জন্য।

এই সমস্ত সত্য বুঝিলে তখন আধ্যাত্মিক যুগের গোড়াপত্তন হইবে। প্রতীকের মধ্য দিয়া, আদর্শের মধ্য দিয়া, আচারের মধ্য দিয়া, যুক্তিবুদ্ধির মধ্য দিয়া যে অভিব্যক্তি এত কাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সার্থক হইবে চরম সত্যে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

এই শেষ পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ করিতেছেন যে জগতে দিব্যযুগ প্রবর্তিত করিতে হইলে কোন্ বস্তু অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কেবল কতিপয় অনুকূল আধ্যাত্মিক ভাব সাধারণ মানব-মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার ভাবনা ও কর্মপ্রেরণার মধ্যে অনুস্যূত হইয়াছে, ইহা যথেষ্ট নয়। এমন কি, মানুষ ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠাকে আদর্শ ও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিলেও তাহার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। এ-সমস্ত তাহার গম্য পথে যাত্রারম্ভ মাত্র। এখানে থামিলে তাহার জীবনধারার পূর্ণ রূপান্তর ঘটিবে না, আর যেটুকু ঘটিবে তাহাও টিকিবে না। আজ পর্যন্ত মানবজাতি ব্যাপকভাবে ইহার অধিক কিছু চেষ্টাও করে নাই।

মানুষের স্বভাবই এই যে তাহার মনোমধ্যে কোন উন্নত আদর্শ উদিত হইলে সে সেই আদর্শাভিমুখী আস্পৃহাটুকুকে পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। হয়ত তাহার বহির্জীবনকে একটু-আধটু সেই রঙে রঞ্জিত করে; কিন্তু যাহা একান্ত আবশ্যক, আপন জীবনকে তদনুযায়ী সর্বথা নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা, তাহা ঘটিয়া উঠে না। এমন কি হয়ত মানুষ মনের মধ্যে নানা তর্কবিচার উত্থাপিত করিয়া সেই আদর্শের বিপরীত পথেও চলে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা স্বভাবত একেবারে অন্তরের জিনিস, তাহার ভিতরে যান্ত্রিক ভাব কিছুই নাই। আধ্যাত্মিক আচার, বিচার, আদর্শ, প্রতীক, এ সবই অর্থহীন হয় যদি তাহা মানুষের জীবনযাত্রাতে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ না করে। তাই দিব্য যুগের আবাহন করিতে হইলে সমগ্র মানবসমাজকে দিব্য আস্পৃহাতে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। জাতির এই জাগরণ আসিতে পারে শুধু প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগাইলে। ভাগবত পূর্ণতা উর্ধ্বে সর্বদাই

রহিয়াছে, আমরা বুঝি বা না বুঝি। মানুষের আধ্যাত্মিকতার অর্থ তাহার দিব্যস্বরূপ ও দিব্যজীবন লাভ।

অন্তর্মুখী ধর্মমাত্রেই স্বীকার করিয়াছে যে জগতে ভাগবত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে শুধু ব্যষ্টি-জীবনের দিব্য রূপান্তরের দ্বারা। কেন না জনসমষ্টি একটা অবচেতন সত্তা, তাহার আত্মা বলিতে সমবেত ব্যষ্টি আত্মাকেই বোঝায়। যে-সমাজ বাঁচিয়া থাকে শুধু তাহার প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা, ব্যক্তির দ্বারা নয়, তাহা যন্ত্রমাত্র, তাহার একটা সমষ্টিগত আত্মা নাই। তাই সমাজে বা জাতিতে আধ্যাত্মিক যুগের প্রবর্তন তখনই সম্ভবপর হইবে, যখন তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ, ক্রমশ অধিক সংখ্যায়, দেহ-প্রাণ-মনকে অতিক্রম করিয়া বিবর্তনের পথে উর্ধ্বতন ভূমিতে আরোহণ করিবে। সমগ্র জাতির অভিব্যক্তি নির্ভর করিবে ব্যক্তির এই আরোহণের উপর।

একটা নূতন ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের উদ্ভবের দ্বারা প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সেদিক দিয়া চেষ্টা জগতে ত বহুবার হইয়াছে! প্রতিবারই দেখা গিয়াছে একজন মহাপুরুষের প্রভাবে কিছুকালের জন্য একটা জাগরণ, তারপর ক্রমশ অবসাদ ও অবনতি। সাম্প্রদায়িক ধর্ম যে-সব বস্তুর উপর নির্ভর করিয়াছে তাহা ক্ষণিক, তাই অতি সহজেই উহা আচার-বিচার ও গতানুগতিকে পর্যবসিত হইয়াছে। মূল আধ্যাত্মিক প্রেরণার স্রোত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সামাজিক বিধিবিধান ও ক্রিয়াকর্মের বালুকারাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। তারপর, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন ধর্মমতকে একমাত্র অভ্রান্ত মত মনে করিয়া তাহাকে সমগ্র মানবজাতির স্কন্ধে চাপাইতে চাহিয়াছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে মানবাত্মা চিরমুক্ত, বাঁধন সে মানিবে না, বৈচিত্র্যই মানবপ্রকৃতির প্রাণস্বরূপ। তাই একটার পর একটা ধর্মমত জগতে আসা সত্ত্বেও মানবজাতির উর্ধ্বভূমিতে উত্থান ঘটিয়া উঠে নাই। বরং সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব কলহ ও সংঘর্ষের ফলে মানুষ

বারবার নীচের দিকে খসিয়া পড়িয়াছে। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ধর্মমত সমূহের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে প্রধানত পারত্রিক জীবনে, ইহজীবনকে তাহারা দেখিয়াছে একটা গৌণ ব্যাপার বলিয়া। তাই তাহারা মানুষের সমস্ত জীবনটাকে তুলিয়া দিতে পারে নাই তাহার আত্মার হাতে, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই যে মানুষের চরম লক্ষ্য মরণান্তে স্বর্গে উত্থান নয়, ইহজীবনকেই স্বর্গের জ্যোতিতে দীপ্ত করা।

তাই নবযুগের আবাহনে যথার্থ সহায়তা করিতে পারিবে শুধু সেইজন যে আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিকেই মানবের নিয়তি বলিয়া জানিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে মনোভূমি হইতে বুদ্ধিজীবি মানুষকে উঠিয়া যাইতে হইবে ঊর্ধ্বতন ভূমিতে, যেমন অতীতকালে পশু-মানব ধীরে-ধীরে উন্নীত হইয়াছিল প্রাণময় হইতে মনোময় জীবে। তখন মানুষের বুদ্ধিবিচার দীপ্ত হইয়া উঠিবে ঊর্ধ্ব হইতে অবতীর্ণ বোধির কিরণে। সে তখন আচার-অনুষ্ঠান বিধি-বিধানকে আর বড় বলিয়া দেখিবে না, সে বুঝিবে যে সকল-মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করার প্রয়োজন নাই, কেন না বৈচিত্র্যই জাতির প্রাণ।

তবে দুই চারিজন এইরূপে ঊর্ধ্ব ভূমিতে আরোহণ করিলে ত চলিবে না! সমগ্র মানবজাতিকে ক্রমশ তুলিতে হইবে বিজ্ঞান ভূমিতে, তবেই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে ভাগবত জীবন। এই রূপান্তর সময়সাপেক্ষ, পথে বাধা-বিপত্তি বিস্তর, পথ ভাঙিতে ভুল-ভ্রান্তিও ঘটিবে অনেক, কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না।

যাহারা এই কাজে অগ্রণী হইবে তাহারা সমগ্র মানবজীবনকে লইবে আপন ক্ষেত্র বলিয়া। মানুষের সমস্ত কার্য, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত আবেগ অনুভূতিকে দীপ্ত করিতে হইবে ভাগবত জ্যোতিতে। যে দিক দিয়া সুবিধা, সেই দিক দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, একমাত্র প্রয়োজন যে কোনদিন সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। আরম্ভে সে স্বভাবত মনোবুদ্ধির দ্বারা চালিত

হইবে, কিন্তু শেষ অবধি বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া বোধির আশ্রয় তাহাকে লইতেই হইবে। এইরূপে আধ-আঁধার মানব মন ধীরে-ধীরে রূপান্তরিত হইবে সদা-দীপ্ত অতিমানস বিজ্ঞানে। সকল সমস্যার সমাধান হইবে।

তবে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ ব্যক্তির পক্ষেই বহু আয়াস সাধ্য, জাতির পক্ষে ত অতীব দুরূহ! ধাপে-ধাপে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হইবে। আধ্যাত্মিক জীবন মানেই অবিরাম ঊর্ধ্বগমন। দিন যত যাইবে, যত বেশী লোক এই জীবনকে বরণ করিয়া লইবে এবং ধ্রুব পথে অগ্রসর হইবে, ততই নিকটে আসিবে সেই দিন যখন মানুষের হৃদ্দেশে নিগূঢ় ঈশ্বর তাহার জীবনের সকল ভার আপন হস্তে তুলিয়া লইবেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "there will be fulfilled the change which will prepare the transition of human life from its present limits into those larger and purer horizons".